মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য

পুস্তক বিপণি ॥ ২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

সূচী

প্রথম অধ্যায়
পটভূমি

এক
কাল পরিচয়

বাংলা সাহিত্যে তুর্ক বিজয়ের পর থেকে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত সময়টাকে মধ্যযুগ বলে চিহ্নিত করা হয়। তুর্ক বিজয়ের পূর্ববর্তী অধ্যায় হল আদিযুগ। একালের সাহিত্যের ইতিহাস লেখকেরা প্রায়ই এরকম নামকরণ পছন্দ করেন না। তাঁরা সুনির্দিষ্ট যুগ পরিচয় দিতে চান এবং রাজনৈতিক শাসন কালকে সামনে রেখে পরিচ্ছন্নভাবে যুগের বিভাগ করেন। তাঁদের বিবেচনায় তুর্ক বিজয় অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজাদের রাজত্ব কাল। তুর্ক বিজয় থেকে শুরু করে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত অর্থাৎ ১২০০ থেকে ১৮০০ — এই কালপর্ব মুসলমান শাসন যুগ। এখানে বলে রাখা ভাল ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধ হলেও ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা ঘটতে আরো ২৫/৩০ বছর লেগে গেছে এবং ইংরেজী সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাবের সূচনা ১৮০০ সালের আগে হয়নি। ১৮০০ সাল থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বৃটিশ যুগ এবং ১৯৪৭ - এর পর থেকে চলেছে স্বাধীনতার যুগ। হিন্দু, বৌদ্ধ মুসলমান এ জাতীয় ধর্মীয় পরিচয় দেবার একমাত্র কারণ এই যে পাল, সেন, বর্মণ বা আরো পূর্ববর্তী বঙ্গীয় শাসক বংশগুলিকে একটা সাধারণ পরিচয়ে চিহ্নিত করতে গেলে হিন্দু-বৌদ্ধ বলাই সুবিধাজনক। আর মুসলমান আমলে বিভিন্ন পাঠান ও আফগান বংশ এবং শেষভাগে মোঘলেরা এবং মোঘলদের অধীনেও নানা পাঠান নবাব এদেশ শাসন করেছেন। সুতরাং পুরো সময়টাকে মুসলমান শাসন যুগ পরিচয় দিলেই বোঝার সুবিধা হয়। তবুও সাধারণভাবে বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ছাত্রেরা ১২০০-১৮০০ সালকে মধ্যযুগ বলেই পরিচয় দিয়ে থাকেন।

আমরা যদিও মধ্যযুগের সাহিত্য নিয়েই আলোচনায় ব্রতী হয়েছি তবুও আদিযুগ-হিন্দুবৌদ্ধ যুগ পর্যন্ত এই আলোচনাকে প্রসারিত করতেই হবে। কারণ এক দিকে 'চর্যাপদ' অন্যদিকে 'গীতগোবিন্দ' অর্থাৎ বৌদ্ধ-তান্ত্রিক এবং কৃষ্ণ-ধর্ম গোষ্ঠীর (কৃষ্ণ-কাল্ট) প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে এদের কথা বাদ দিয়ে আলোচনা শুরু করাই যাবে না। সে কারণে মূলত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালীর

ধর্ম বিশ্বাস আমাদের আলোচ্য বিষয় হলেও আদি যুগের সাহিত্য ও ধর্মভাবনাকেও আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত আরেকটি কথা। আমরা আদি ও মধ্যযুগের সাহিত্য এই পরিচয়কে লেখার সুবিধার জন্য প্রায়ই পুরনো সাহিত্য বলে উল্লেখ করব।

দুই
ধর্মাশ্রয়ী সাহিত্য ঃ একটি বিশেষ বাঙালী প্রবণতা

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন ধর্মকে আশ্রয় করে নানা জাতীয় গ্রন্থাদি রচিত হয়েছে, তেমনি প্রচুর কাব্য, নাটক, আখ্যান, ধর্ম অসম্পৃক্ত রচনাও রয়েছে। বেদ উপনিষদ পুরাণ ইত্যাদিকে সাধারণ ভাবে ধর্ম সম্পৃক্ত বলে মনে করা হলেও রামায়ণ মহাভারত ধর্ম ইতিহাস কাব্য প্রভৃতির সংমিশ্রণ এবং কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতির রচনাগুলি ধর্ম-বিবিক্ত সাহিত্য। অর্থাৎ উচ্চমার্গের এমন রচনার সংখ্যা সুপ্রচুর যা ধর্ম সম্পৃক্ত নয়। কিন্তু আদি ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ব্যাপারটা অন্য রকম। সেখানে ধর্ম ছাড়া সাহিত্য নেই। অনেক খুঁজে দু-চারটি রচনা পাওয়া যেতে পারে যাকে বলা যাবে সেকুলার। অবশ্য শিষ্ট বা লিখিত সাহিত্যের বাইরে লোকসাহিত্যের যে বিরাট ভাণ্ডার প্রতিদিন তৈরী হয়েছে এবং বদলে গেছে, তার মধ্যে ধর্ম জড়িত এবং ধর্মমুক্ত দু-ধরনের রচনাই আছে।

তুলনা করলে দেখা যাবে প্রতিবেশী হিন্দী সাহিত্যে মধ্যযুগে ধর্ম অসম্পৃক্ত রচনার পরিমাণ নগণ্য নয়। সেখানে ধর্মীয় এবং সেকুলার দুটি ধারা পাশাপাশি চলেছে। বাংলায় তেমন হয় নি। এমনকি মহাভারতের ধর্ম নিরপেক্ষ অংশগুলিও বাঙালী কবিদের হাতে অনুবাদে ধর্ম কাব্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে। কেন এমন ঘটল তা বিশেষ ভাবে খতিয়ে দেখা দরকার।

বাঙালী যে প্রতিবেশী অন্যান্য জাতিগুলির তুলনায় বেশী ধর্মপ্রাণ একথা তো প্রমাণ করা যাবে না। মধ্যযুগ জুড়ে সারা ভারতে, উত্তর-দক্ষিণ নির্বিশেষে বিভিন্ন ধর্মান্দোলন দেখা গিয়েছে এবং নানাবিধ কারণে ধর্মীয় আচার-আচারণ লোকের মনে গভীর ভাবে গ্রথিত হয়েছে। এটা বাঙালী, মৈথিলী, ওড়িয়া প্রভৃতি জাতিসত্তা নিরপেক্ষ ভাবেই সত্য। চৈতন্য আন্দোলন বাঙালী জাতিকে প্রায় দুশো বছর প্রবল ভাবে আন্দোলিত করেছে, পরেও তার রেশ চলেছে। এটাই কি বাংলা সাহিত্যের ধর্মমুখীতার প্রধান কারণ? অন্যতম প্রধান কারণ সন্দেহ নেই, কিন্তু একমাত্র নয়। পাশাপাশি এ কথাও তো মনে রাখবার যে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে নানক, কবির, দাদু, তুকারাম, মীরাবাই, রামানন্দ প্রভৃতি

অজস্র সাধক সাধিকা ধর্মে এবং সাহিত্যেও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছেন। তবুও ভারতের অনত্র মধ্যযুগের সাহিত্য ধর্মসর্বস্ব হল না, শুধু বাঙালীর সাহিত্যই হল, তার কারণ কি?

পুরনো বাংলা সাহিত্যে ধর্মের ভূমিকা কি এবং সেকালে বাঙালীর ধর্মাচরণের আদর্শ ও রীতিনীতি কিরূপ ছিল এবং বাঙালীর ধর্মের বহুমুখী বৈচিত্র্য ও অন্তর্লীন জাতীয় স্বভাবগত ঐক্য আলোচনা করলে এই জাতির একটা প্রধান পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হবে। একালের বাঙালী স্বভাবে কর্মে এবং ধর্মে অবশ্যই নতুন নতুন নানা দিগন্তকে স্পর্শ করেছে। কিন্তু তার শিকড় যেখান থেকে আপন অস্তিত্বের মূল রস সংগ্রহ করছে তা দেশের ও কালের গভীরে নিহিত। পুরনো যুগ থেকে বয়ে আসা ধর্ম-সত্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নবনব রূপে পুষ্পিত হয়ে উঠেছে। এই পরিবর্তন যতই কেন ব্যাপক হোক না, যতই আপত দৃষ্টিতে বিপরীত ধর্মী হোক, সেকালের ধর্মীয় উপলব্ধি-বৈচিত্র্যের ভিত্তিতেই মধ্যযুগের ধর্মীয় উপলব্ধি তথা জীবন-চেতনা বিকশিত হয়ে উঠেছে।

সেকালের বাঙালীর ধর্ম নিয়ে দার্শনিক ও ঐতিহাসিক পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে। বিচ্ছিন্ন ভাবে বিভিন্ন ধর্মসাধনা এবং তার দার্শনিকতা নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচিতও হয়েছে। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে ধর্ম গোষ্ঠীর বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা বহু মূল্যবান রচনা যেমন রয়েছে তেমনি পণ্ডিতের বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে রচিত গ্রন্থের সংখ্যাও কম নয়। এই সব পণ্ডিতেরা অনেকেই হয়তো কোন বিশেষ ধর্মগোষ্ঠীর বিশ্বাসের অনুবর্তী হয়ে গ্রন্থাদি লেখেন নি। দার্শনিক ও ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণে তত্ত্বানুসন্ধানই তাঁদের লক্ষ্য ছিল। এই উভয়বিধ গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে প্রাচীন শাস্ত্র, পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন, প্রাসঙ্গিক সাহিত্য যেমন ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি কখনো কখনো ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ বা ফিল্ড স্টাডির প্রয়োজনও ঘটেছে। এমন বিস্ময়কর ব্যাপারও দেখা দিয়েছে যে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী পণ্ডিত ধর্মসাধনা নিয়ে মহাগ্রন্থ রচনা করেছেন যা এখনো গবেষকদের পথ প্রদর্শন করে। আমরা অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে'র কথা বলছি। সংস্কৃতি বিজ্ঞানীরাও অনেকে এদেশের ধর্মসাধনার বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করেছেন। সেক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ক্রমানুবর্তিতার সঙ্গে ধর্মান্দোলনের বিকাশকে সমন্বিত করে দেখানো হয়েছে। তবে একটি অভাবের কথা গোড়াতেই মনে পড়ছে যে বাংলা ভাষায় ভারতের ধর্মসাধনার সামগ্রিক ইতিহাস নিয়ে কোন গ্রন্থ রচিত হয় নি। হয়তো সে সব গ্রন্থ বহু খণ্ডে বিস্তৃত হত, তবুও এরূপ চেষ্টা একটি অবশ্যকৃত্য বলে মনে হয়।

পুরনো স্থাপত্য, ভাস্কর্য-শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির আলোচনা করতে গেলে ধর্মের কথা না এসে পারে না। কারণ এদের সঙ্গে ধর্মের কম বেশী যোগ সর্বদাই ছিল। কিন্তু বিশেষ ভাবে ধর্মচেতনা তথা ধর্মীয় দার্শনিকতা, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে

উপলব্ধ ঈশ্বরতত্ত্ব এবং সাধনতত্ত্ব সম্পর্কে নানা ধরনের সাহিত্যে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে সে বিষয়ে নানা বিচ্ছিন্ন আলোচনা দৃষ্ট হলেও, একটি সুসংবদ্ধ, সংক্ষিপ্ত হলেও সামগ্রিক গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনের তাগিদ আমাদের বর্তমান গ্রন্থ রচনার প্রেরণা স্বরূপ।

তিন
নন্দনতাত্ত্বিক প্রশ্ন

ধর্মের সঙ্গে সাহিত্যের এস্‌থেটিক আবেদনের সম্পর্ক কি তা নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। সাহিত্যের লক্ষ্য যদি বিশেষ কোন ধর্ম প্রচার হয় তাতে শিল্প-ঘটিত সৌন্দর্য ব্যাহত হতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। সর্বদাই যে এরূপ ঘটে তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। শুধু ধর্ম কেন কোন রাজনৈতিক সামাজিক মতবাদ প্রচারই যদি লেখকের উদ্দেশ্য হয় তা হলে রচনা হিসেবে সাহিত্য দুর্বল হয়ে পড়তেই পারে। আবার এরকম নিদর্শনেরও অভাব নেই যেখানে লেখক ধর্ম ও রাজনৈতিক মতবাদকে শিল্প সমৃদ্ধ রূপের মধ্যেই ধরে রাখতে পেরেছেন।

সাহিত্যের লক্ষ্য যদি জীবনকে প্রকাশ করা হয় এবং ধর্ম যদি জীবনেরই অংশ হয় সেক্ষেত্রে সাহিত্যে ধর্ম আপনার উপস্থিতি অনিবার্য করে তুলবেই। তবে সেকালের বাংলা সাহিত্যে এ ব্যাপারে একটু বাড়াবাড়ি ঘটেছে — এরূপ মনে করা অসংগত নয়। কিন্তু তারও যথেষ্ট ঐতিহাসিক এবং যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে। আমরা সে কারণ পরে বিশ্লেষণ করব।

আপাতত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধর্ম ও শিল্পগত মূল্যের সম্পর্ক নিয়ে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। সেকালের সাহিত্য যে ধর্ম প্রচারের জন্যই রচিত হত একথা ঠিক নয়। কিছু রচনা ছিল যার লক্ষ্য ধর্মতত্ত্ব ও সাধনরীতি প্রকাশ ও প্রচার করা। যেমন 'যোগী কাচ'—নাথপন্থীদের সাধন সংক্রান্ত ব্যাখান। বৈষ্ণবদের কড়চা নিবন্ধগুলি প্রায় সবই বৈষ্ণব সাধন-রীতি নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা। সাধন সঙ্গীত জাতীয় সর্ববিধ রচনা যেমন চর্যাপদ, বৈষ্ণব সহজিয়াদের গান, বাউল গান, শাক্ত পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত শ্যামাসঙ্গীতের অধিকাংশ লেখা প্রভৃতি সাধ্য ও সাধন তত্ত্বের ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যেই রচিত। অনেক সময়ে এগুলি সাধকের সাধনার সহযোগী। প্রায়ই কবি নিজেই সাধক এবং যাঁরা কবি নন তাঁরাও সাধনের অঙ্গ হিসেবে এই গানগুলি গেয়ে থাকতেন। কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে দার্শনিক প্রতীতি নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন তা উচ্চ-শিক্ষিত বৈষ্ণব মহান্তদের চর্চার বস্তু। এই স্তরের গ্রন্থগুলি শুধু ধর্মপ্রচার পুস্তক নয়, ধর্ম তত্ত্বের প্রজ্ঞাদীপ্ত আলোচনা রূপে আধুনিক

দার্শনিক উচ্চমার্গীয় রচনাগুলির সমগোত্রীয়। বেদান্ত ভাষ্য রচয়িতা বা সাংখ্যকার যেমন ধর্মবেত্তা নন, তত্ত্ববিদ দার্শনিক, কৃষ্ণদাস কবিরাজও সেইরূপ।

আবার অনেক সময়ে দেখা যাবে মানবিক ভাবাবেগ, নরনারীর জীবন-কাহিনী ও চরিত্র-বৈচিত্র্য ভাষায় প্রকাশ করাই কবির লক্ষ্য। তার সঙ্গে ধর্মীয় ভাব পরিমণ্ডল ওতপ্রোত জড়িত হয়ে পড়েছে। সেক্ষেত্রে কবির লক্ষ্য কিন্তু যতটা সাহিত্যিক ততটা ধর্মীয় নয়, অবশ্য ধর্ম বিমুখও নয়।

অনেক কবি ধর্মভাবুক বলেই কবি নন। কবি বলেই তাঁরা বিশিষ্ট-যদিও তাঁরা ধর্মভাবুকও। গোবিন্দদাস জ্ঞানদাস ধর্মসাধক এবং কবি। তাঁদের আশেপাশে অনেক বড় মহান্ত ছিলেন যাঁরা কেউ কবি নন। কবি বলেই না জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস বলরামদাস পদ রচনা করেছেন। সেই সব পদে ধর্মীয় উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে, কারণ তাঁরা মনে প্রাণে ধর্ম বিশ্বাসী ছিলেন, ধর্ম ও জীবনকে এক করে দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতা সম্পর্কে যে মন্তব্যটি করেছিলেন প্রায় সর্বদাই আমরা তার একপেশে ব্যাখ্যাই দেখতে পাই। বৈষ্ণবদের গান বৈকুণ্ঠের তরে নয় এটাই যেন কবির বক্তব্য। আসলে রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছিলেন বৈষ্ণবের গান 'শুধু' বৈকুণ্ঠের তরে নয়।

চার

সেকালের বাঙালীর ধর্ম ঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ

সে কালের বঙ্গদেশের ধর্মাচরণের সঙ্গেই আমাদের বর্তমান আলোচনার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। অষ্টম থেকে অষ্টাদশ — এই হাজার বছরের সাহিত্যকে সামনে রেখে আমরা এ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। শুরুতেই কতকগুলো বিশেষ দিকে সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। যেমন—

১. সর্বভারতীয় ধর্মসাধনা এক অর্থে বাঙালীরও ধর্মসাধনা। প্রাচীনকাল-বাহিত সনাতন হিন্দুধর্মের বিশ্বাস, শাস্ত্র, দেবমণ্ডলী, ঈশ্বর-তত্ত্ব, সৃষ্টি-তত্ত্ব, পৌরাণিক আবেষ্টনী, হোম ও পূজা রীতি, মন্ত্রাদি বাঙালীর ধর্ম-সাধনার অচ্ছেদ্য অঙ্গ। বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত আদি দার্শনিক বোধগুলি উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত অষ্টাদশ পুরাণ ও বহু সংখ্যক উপ-পুরাণ হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্য রূপে বাঙালী হিন্দুর রক্ত-মজ্জায় সঞ্চারিত।

২. অতি প্রাচীন কাল থেকে বৌদ্ধধর্ম বঙ্গদেশ এবং পূর্বাঞ্চলের আরো দূরবর্তী অংশে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বৌদ্ধ ধর্মের আদি প্রত্যয়গুলি এবং পরবর্তী কালের মহাযান বৌদ্ধদের বিভিন্ন মতবাদ

মগধ পাটলীপুত্র হয়ে প্রাগজ্যোতিষ চট্টল পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষত ব্রাহ্মণ্য সংস্কার সংস্কৃতির প্রান্তেবাসী অন্ত্যজ শ্রেণী এবং পশ্চাদবর্গের জনসাধারণের মধ্যে মহাযানী বৌদ্ধদের তন্ত্রাশ্রয়ী গোষ্ঠীগুলি বিশেষ ভূমিকায় অবস্থান করে।

৩. বঙ্গদেশ, অসম, ওড়িষা এবং বিহারের পূর্বাঞ্চলে অতি প্রাচীনকাল থেকে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম ও শাস্ত্র নিরপেক্ষ ভাবে লৌকিক ধর্মসাধনা রূপে তন্ত্রাচারের প্রধান্য ছিল। পরবর্তী কালে হিন্দু ধর্মের নানা শাখার সঙ্গে এবং মহাযানী বৌদ্ধদের কয়েকটি গোষ্ঠীর সঙ্গে তা সংপৃক্ত হয়ে পড়ে এবং এই দুই প্রধান ধর্ম বিশ্বাস নিরপেক্ষ ভাবে তন্ত্র লৌকিক ধর্মসাধনা রূপে প্রবল প্রতিপত্তি সহ অব্যাহত থাকে।

৪. তুর্ক বিজয়ের পূর্বেই বাংলায় ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় প্রধান প্রবণতাগুলির পাশাপাশি—কখনো স্বতন্ত্র ভাবে কখনো যৌথ ভাবে দেশজ নিজস্ব ধর্মীয় আচরণ ও ভক্তিবাদ দেখা দেয়।

মোটকথা তুর্ক বিজয়ের পূর্বে বাংলার ধর্ম —

১. সর্বভারতীয় হিন্দু ধর্ম,
২. সর্বভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মের অংশ,
৩. বঙ্গীয় আদিম তন্ত্রাচার,
৪. বঙ্গীয় লৌকিক ধর্ম ও দেববিশ্বাস

— এই চার ধারার মিশ্রণজাত বা পাশাপাশি অবস্থানে সমৃদ্ধ। তুর্ক বিজয়ের পরে এই পরিস্থিতির অনেকটাই যেমন বহাল রইল তেমনি অনেকখানি পরিবর্তিতও হল। যেমন—

১. সর্বভারতীয় হিন্দু ধর্ম নিজেকে একদিকে সংহত করল, অন্যদিকে নিম্নবর্ণ পর্যন্ত আপনাকে প্রসারিত করতে চাইল। স্মৃতির শাসন হিন্দুদের উচ্চবর্ণগুলির মধ্যে দৃঢ় হল। অন্যদিকে তথাকথিত নিম্নবর্ণগুলিকে, অনার্য অব্রাহ্মণ্য সংস্কারের মানুষদের পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের চৌহদ্দিতে নিয়ে আসবার অবিরাম চেষ্টা চলতে লাগল একটি বহির্ভারতীয় ধর্মের মুখে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে হিন্দুধর্মের এই নতুন প্রয়াস।

২. বাংলাদেশের একটি নিজস্ব দেবপরিমণ্ডল গঠিত হল। কৃষ্ণ-কাল্ট এবং শিব-কাল্ট সর্বভারতীয় ধর্মগোষ্ঠী হলেও বাংলার কৃষ্ণ এবং শিব দুটি নতুন দেবতায় পরিণত হল। মনসা, চণ্ডী, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি বহু সংখ্যাক নারী দেবতার উদ্ভব ঘটল। ধর্ম ঠাকুর থেকে দক্ষিণরায় পর্যন্ত নব্য পুরুষ দেবতার সংখ্যাও কম হল না। আসলে লৌকিক দেবতা, গ্রাম

দেবতার যে সব পুজো নানা অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত ছিল তাদের কেউ কেউ দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ শতকে, বঙ্গীয় হিন্দুদের পৌরাণিক দেব-ভাবনার মধ্যে স্থান পেল। বর্তমানে মঙ্গলকাব্য নামে যাদের পরিচয় দিই সেই বাংলার নিজস্ব পুরাণের এই ভাবেই সৃষ্টি হল।

৩. তুর্ক বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় যেমন মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা ঘটল তেমনি ইসলাম ধর্মের প্রচারও ব্যাপক ভাবে শুরু হল। অনেকে মনে করেন ইসলামী সূফী সাধকেরা কেউ কেউ তুর্ক বিজয়ের আগেই বাংলায় এসেছিলেন এবং সূফী আদর্শ প্রচারে রত হয়েছিলেন। হয়তো কিছু কিছু শরিয়তী ইসলাম ধর্মের প্রচারকও বঙ্গে এসে থাকবেন। সূফীদের কথা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার যোগ্য। কিন্তু এটা সত্য শারিয়াত-মান্য প্রতিষ্ঠানিক ইসলাম তুর্ক বিজয়ের আগে বঙ্গভুমিতে কোন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরী করতে পারে নি। ১২০০ সাল থেকে পরবর্তী ৬০০ বছর (১৮০০ পরবর্তী সময় বর্তমানে আমাদের আলোচ্য নয়) এদেশে ইসলামের প্রভাব ক্রমেই বেড়েছে। বহিরাগত মুসলমানেরা সমাজে একটি উচ্চস্তর তৈরী করেছে । দেশীয় অভিজাতদের মধ্যে লোভে, ভয়ে, রাজনৈতিক কারণে কিছু কিছু ধর্মান্তর ঘটেছে; তবে ইসলামীকরণ বেশী হয়েছে তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যে, সমাজে অন্তে-বাসী শ্রেণীগুলির মধ্যে এবং নিম্মবর্গীয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটা অংশের ইসলাম ধর্ম-সম্পৃক্ত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। মুসলমান কবিরা মুসলমানী বিষয় নিয়ে মুসলমান পাঠক শ্রোতার কথা মনে রেখে কাব্যাদি লিখেছেন। বাংলা সাহিত্যের একটা বিশেষ সম্পদ রূপে সেগুলো অবশ্যগণ্য।

৪. সোজাসুজি ইসলাম ধর্মাশ্রয়ে গড়ে ওঠা সাহিত্য ছাড়াও ইসলাম ধর্মের সঙ্গে দেশের প্রাচীন ধর্মগুলির সংঘাত সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে আরো কতকগুলি সাহিত্যধারা গড়ে উঠেছিল।

৪.ক. ইসলামী সূফীবাদ সর্বভারতীয় বৈষ্ণবাচার ও ভক্তিবাদের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে খুব প্রত্যক্ষ ভাবে না হলেও ভিতর থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের উৎসে কিছুটা সক্রিয় থেকেছে।

৪.খ. সূফী ভক্তিবাদ এবং সাধনতত্ত্ব এদেশে প্রচলিত সহজিয়া সাধন তত্ত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে নানা ধরনের ক্ষুদ্র বৃহৎ গুহ্য সাধনপন্থী হিন্দু মুসলিম নিরপেক্ষ অনেকগুলি উপাসক সম্প্রদায়ের জন্ম দিয়েছে, এদের ভক্তিগীতি সেকালের সাহিত্যের সম্পদ বিশেষ; এই ধারারই চূড়ান্ত রূপ বাংলা বাউল গানে।

৪.গ. হিন্দু নাথপন্থা এবং ইসলামী নাথপন্থা অনেকটা মিশ্রণের মধ্য দিয়ে

কতকটা সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত হয়েছে। উভয় সম্প্রদায়ের কবিরা নাথপন্থী সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।

৪.ঘ. অনেকগুলো লৌকিক দেবদেবী হিন্দু মুসলমান ধর্মভাবনার দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের ফল। সত্যপীর সত্যনারায়ণ, বনবিবি, বড়গাজী, দক্ষিণরায়-কালুরায় প্রভৃতি দেবতাকে নিয়ে লেখা কাব্যাদিতে (যার কিছু কিছু বেশ অর্বাচীন লৌকিক সাহিত্য থেকে লেখায় ধরা পড়েছে অনেক পরে) -এর প্রতিফলন রয়েছে।

৫. চৈতন্য ধর্মান্দোলন বাংলার সমাজে ও সাহিত্যে একটা প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। দুশো বছর সদর্পে বাংলা সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করার পরে অনেকটা পরোক্ষ ভাবে এর প্রভাব চলতে থাকে এবং নানারূপ মিশ্রণের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত, এমনকি বর্তমান কালেও এই ধারা আপনার প্রতিপত্তি বজায় রেখেছে। বৈষ্ণব ধর্মাশ্রয়ী বাংলা সাহিত্যের বহু শাখায়িত বিস্তার পুরনো বাংলা সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৬. আমরা পূর্বেই বাংলার একান্ত নিজস্ব দেব পরিমণ্ডলের কথা বলেছি। সর্বভারতীয় পৌরাণিক দেবমণ্ডলীটি বঙ্গদেশে অনুবাদ ধর্মী সাহিত্যের মধ্য দিয়ে নিজের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তৃত রাখে। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতির অনুবাদ সারা দেশ জুড়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। যদিও বাঙালীর ধর্মসাধনায় রামায়ণ-কেন্দ্রিক রামায়েত সম্প্রদায় কখনো গুরুত্ব লাভ করে নি। তবে মহাভারত ও ভাগবতাশ্রয়ী কৃষ্ণ-উপাসনার রীতি চৈতন্য পূর্ববর্তী বাংলায় বিশেষ প্রচলিত ছিল। কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত চৈতন্য পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কালে সর্বদা বাঙালীর ধর্ম ও ভক্তি ভাবনাকে পুষ্ট করেছে।

৭. বাঙালী তন্ত্রসাধক জাতি। চৈতন্য কেন্দ্রিক প্রবল বৈষ্ণব ভাবান্দোলনও তার তান্ত্রিকতার প্রতি আকর্ষণকে সঙ্কুচিত করতে পারে নি। তবে তান্ত্রিকতা মঙ্গলকাব্যগুলির নারী দেবতার সাধনায় একটু পরোক্ষ ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কখনো কখনো রামায়ণের মত বৈষ্ণবী কাব্যের অনুবাদেও চণ্ডী-কালীর প্রবেশ ঘটানো হয়েছে। মধ্যযুগের শেষ দিকে অন্নদামঙ্গল কালিকামঙ্গলে তান্ত্রিকতার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি এবং এই শতকেই শাক্তগীতিকবিতায় উমা ও কালীর ভক্তি বিগলিত ধ্যান স্থান পেয়েছে। তবে তান্ত্রিকতা তুর্ক বিজয়ের আগে থেকে কখনো বৌদ্ধ সহজিয়া, কখনো সূফী পন্থা, কখনো নাথসাধনা কিংবা বৈষ্ণবী আরোপ সাধনার মধ্যে আপনার প্রভাব সঞ্চারিত করে রেখেছে।

পূর্বোক্ত সূত্রগুলির মধ্যে পুরনো বাঙালী জীবনের ধর্ম ও ধর্মাশ্রয়ী সাহিত্যের ধারাগুলির যে পরিচয় সংক্ষেপে উল্লিখিত হল তার বিস্তৃত বিশ্লেষণ আমাদের বর্তমান রচনার অভিপ্রায়।

১৮০০ সালের মধ্যে মধ্যযুগের শেষ প্রান্তে খৃষ্টধর্মের সঙ্গে খুব স্বল্পত হলেও বাঙালীর পরিচয় ঘটে, বিশেষ করে পর্তুগীজ মিশনারীরা কোথাও কিছু বাঙালীকে খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করে। নবদীক্ষিত খৃষ্টান বাঙালীর লেখা খৃষ্টধর্ম বিষয়ক গদ্য বইও পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু বাঙালী জীবনে প্রভাবের দিক থেকে তাদের অকিঞ্চিৎকরতার বিবেচনায় আমরা সেগুলিকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিনি। বৌদ্ধ হিন্দু এবং ইসলাম — এই তিনটি ধর্ম সংশ্লিষ্ট সমাজ, তাদের দ্বন্দ্ব সমন্বয়, তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ইতিহাস এবং অপরাপর ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কের ফলে সে ইতিহাসের পালাবদল—এগুলির দিকে লক্ষ্য রেখেই সাহিত্যে ধর্মের প্রতিফলন বিশ্লেষণ করা সঙ্গত। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট চিন্তা জাগ্রত থাকা প্রয়োজন, তা হল নিম্নবর্গ মানুষের লোকায়ত ধর্মাচরণ প্রতিমুহূর্তে পূর্বোক্ত তিন প্রধান ধর্মের শাস্ত্রানুমোদিত পন্থার সঙ্গে নানা মাত্রায় যুক্ত হয়েছে, তাকে প্রভাবিত করেছে, বিকৃত করেছে, স্বতন্ত্র করেছে। এই লোকায়ত ধর্মবোধ ও ধর্মসাধনা অনেক সময়ে পূর্বোক্ত তিনটি প্রধান ধর্মের মধ্যকার দূরত্ব দূর করে তাদের কাছাকাছি এনেছে। উপর থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম প্রধানদের চাপ না থাকলে হয়তো লোকায়ত ধর্মসাধনা ও সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রটি আরো ব্যাপক হতে পারত এবং হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অনেক সহজ গভীর আত্মীয়তা তৈরী হয়ে উঠত, যেমন এক সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে ঘটেছিল।

পাঁচ

ধর্ম ও সমাজ ঃ হিন্দু ও মুসলমান

যে কোন জাতির ধর্মের ইতিহাস তার সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত। বাঙালীর ধর্মসাধনার যে রূপ মধ্যযুগে বিকশিত হয়ে উঠল তা কখনোই সম্ভব হত না যদি না তুর্ক বিজয়ের প্রবল অভিঘাত তাকে ভিতর থেকে তাড়িত করত। তুর্ক বিজয়ের ফলে সমাজে বৌদ্ধধর্ম সংস্থানগুলির প্রত্যক্ষ ভূমিকা প্রায় লুপ্ত হল, অথবা অতি সংকীর্ণ হয়ে বাংলার প্রত্যন্তে কয়েকটি স্থানে সীমাবদ্ধ হল। তবে তার নিগূঢ় প্রভাব সমাজের অন্ত্যজ স্তরে নানা গুপ্তভাবে সক্রিয় রইল। মুসলমান শাসকদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় এদেশে তরোয়ালের মুখে

ইসলাম ধর্ম প্রসার লাভ করেছে একথা বলা যায় না। স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের যুগে যেমন হয়, কোন কোন মুসলমান নবাব বা সামন্ত উগ্র ধর্মোৎসাহী ছিলেন, অনেকে আবার সদাশয় ছিলেন। অনেকে প্রজা পীড়ক ছিলেন— তার সঙ্গে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে এক করে দেখার কোন কারণ নেই। অনেক মুসলমান নবাব রাজকীয় স্বার্থে ও অর্থনৈতিক কারণে হিন্দু ভূস্বামীদের উপরে অত্যাচার করেছেন, এতে হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিভেদ প্রমাণিত হয় না। সাধারণ ভাবে অপদার্থ নবাব ও সামন্তদের সংখ্যা ছিল অনেক, শাসন যন্ত্র ছিল অত্যন্ত শিথিল। এই সুযোগে দেশে দস্যু তস্করের উপদ্রব যেমন ছিল, ভূস্বামী সামন্তদের অত্যাচার যেমন বাধাহীন হয়ে পড়েছিল, তেমনি অত্যুৎসাহী উগ্র ধর্ম প্রচারকরা মুসলমান শাসনের অজুহাতে ধর্মপ্রচারে কিছু জোরজবরদস্তি করে থাকবে। যোগ্য শাসকেরা হিন্দু প্রধান এই ভূখণ্ডের মানুষের সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হতে চাননি বরং তাদের রাজকীয় ও অর্থ সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্বে হিন্দুদের বহু সংখ্যায় নিয়োগ করার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। হিসাব রক্ষায়, রাজনৈতিক মন্ত্রণায়, এমন কি যুদ্ধ বিষয়ক নীতি নিয়ন্ত্রণেও গুণী হিন্দুরা নিযুক্ত হয়েছেন এমন অনেক উদাহরণ আছে। কোন কোন মুসলমান নবাব ও সামন্ত হিন্দু কবিদের কাব্য রচনায় উৎসাহিত করেছেন।

কিন্তু কখনো কোথাও ধর্মীয় উৎপীড়ন হয়নি এমন নয়। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে তার যে নিদর্শন আছে তাকে অস্বীকার করা যায় না। শূন্যপুরাণে বর্ণিত 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' শীর্ষক অংশে সাম্প্রদায়িক পীড়নের জ্বলন্ত ছবি আছে। অন্যদিকে পরালী মহাভারত বা ছুটি খাঁর নির্দেশে লেখা শ্রীকর নন্দীর 'অশ্বমেধ পর্ব' শাসক শাসিতের আত্মীয়তার নিদর্শন এবং মুকুন্দ চক্রবর্তীর আদর্শনগর গুজরাটে হিন্দু মুসলমানের পাশাপাশি নিজস্ব রীতিতে সহাবস্থান, দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মিলনের পরিচয় বহন করে।

ঐতিহাসিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ হল তুর্ক বিজয়ের ফলে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া। বাঙালী জাতির নিজস্ব ধর্মীয় পরিমণ্ডল সুস্পষ্ট করে তুলতে তুর্ক বিজয়ের ভূমিকা খুবই বেশী। প্রথমত হিন্দুদের পাশাপাশি অন্য প্রধান বাঙালী সম্প্রদায় মুসলমানেরা সামনে এল। অন্যদিকে উচ্চবর্ণের হিন্দু নেতৃত্বে, যারা আর্য-বৈদিক-পৌরাণিক-স্মার্ত ধর্ম ও বিশ্বাসের বশবর্তী ছিলেন, তাঁরা জনসাধারণের বৃহত্তর অংশ-যারা বিশ্বাসে আচরণে অনার্য-অবৈদিক-অপৌরাণিক-অস্মার্ত, তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে চাইলেন। সর্ব ভারতীয় হিন্দু ধর্মের সীমার মধ্যে এই লৌকিক ধর্মাশ্রয়ী বাঙালীদের নিয়ে আসার চেষ্টা শুরু হল, তাদের মনসা, ধর্ম, চণ্ডী প্রভৃতি দেবতাকে হিন্দু পৌরাণিক দেবমণ্ডলীর মধ্যে আসন দেওয়া হল, কৃষির দেবতা হয়ে উঠল দেবাদিদেব শিব। গ্রাম্য প্রশ্রয়ের

দেবতা এবং মথুরা কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণের কোন পার্থক্য রইল না। সর্বভারতীয় হিন্দুর পৌরাণিক ধর্ম বিশ্বাসকে রামায়ণ, মহাভারত,ভাগবত অনুবাদের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের কাছাকাছি নিয়ে আসার চেষ্টা হল। ডঃ সুকুমার সেন যথার্থ বলেছেন. উচ্চ ও নিম্নবর্গ সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল। তুর্ক বিজয়ের বৈদ্যুতি তাকে একাকার করে বাঙালী জাতি তৈবী করল; এবং কিছু কালের মধ্যে চৈতন্য আবির্ভাবের ফলে চণ্ডালহোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণ অথবা যেইজন কৃষ্ণভজে সে মোর ঠাকুর — এরূপ মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে একটি সমুন্নীত হিন্দু বাঙালী জাতি গড়ে উঠল। মধ্যযুগেব বাংলা সাহিত্যেব যে বিপুল আয়োজন তার ইসলামী অংশটুকু বাদে বাকি সবটাই উক্ত বাঙালী হিন্দুর নিজস্ব সমন্বিত ধর্মের প্রতিফলন।

ছয়
বাঙালী হিন্দুর দুটি মুখ্য প্রবণতা

বাঙালীর ধর্মের দুটি আভ্যন্তর প্রবল শক্তির কথা পণ্ডিতেরা বলেছেন। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীব ইতিহাস' নামক গ্রন্থে বলেছেন—

> প্রাচীন বাঙালীর হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতার ইঙ্গিত তাহার প্রতিমা শিল্পে এবং দেবদেবীর রূপ কল্পনায় ধরা পড়িয়াছে।
>
> ....
> ....
>
> মধ্যযুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে , সহজিয়া সাধনায় , বাউলদের সাধনায় যে বিশুদ্ধ ভক্তিরস ও হৃদয়াবেগের প্রসার . তাহার সূচনা দেখা গিয়াছিল আদি পর্বেই , এবং তাহা শুধু বৌদ্ধ বজ্রযানী সহযানীদের মধ্যেই নয়, তান্ত্রিক শক্তিসাধনার মধ্যেই নয়, বৈষ্ণব সাধনায় বটে । এই হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতা যে বহুলাংশে আদিম নরগোষ্ঠীর দান তাহা আজিকার সাঁওতাল, শবর প্রভৃতিদের জীবনযাত্রা, পূজানুষ্ঠান, সামাজিক আচার, স্বপ্ন কল্পনা, ভয়-ভাবনার দিকে তাকাইলে আর সন্দেহ থাকে না। আর্য ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ ও জৈন সাধনাদর্শে কিন্তু এই ঐকান্তিক হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিযালুতার এতটা স্থান নাই। সেখানে ইন্দ্রিয়-ভাবনা বস্তুসম্পর্ক বিচ্যুত, ভক্তি জ্ঞানানুগ , হৃদয়াবেগ বুদ্ধির অধীন । বস্তুত বাংলার অধ্যাত্ম সাধনার তীব্র আবেগ ও প্রাণবন্ত গতি সনাতন আর্যধর্মে অনুপস্থিত।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটিও আমরা অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষাতেই প্রকাশ

করছি—

প্রাচীন বাংলার ধর্মকর্মে, শিল্পে ও সাহিত্যে এই মানবিক আবেদন যতটা বিস্তৃত ও সুস্পষ্ট, সেখানে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট সুখদুঃখের প্রতিও গভীর অনুরাগ যেভাবে ধরা পড়িয়াছে, এমন আর কোথাও নয়। বস্তুত, বাংলার সাধনায় দেবতারা ধরা দিয়েছেন, মানুষের বেশে মানুষের মত হইয়া; মানুষের মাপেই যেন দেবতার পরিমাপ।

....

....

মানবিকতার প্রতি বাঙালী চিত্তের এই আকর্ষণের আভাস প্রাচীনকালেই নানা দিকে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। ....
এই উদার মানবতার অন্যতম দিক হইতেছে প্রাচীন বাঙালীর ঐহিক বস্তুনিষ্ঠা, মানব দেহের প্রতি এবং দেহাশ্রয়ী কায়াসাধনার প্রতি অপরিমেয় অনুরাগ, সাংসারিক জীবনের দৈনন্দিন মুহূর্তের ও পরিবার বন্ধনের প্রতি সুনিবিড় আকর্ষণ, রূপ ও রসের প্রতি তাহার গভীর আসক্তি।

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনও তাঁর 'বাংলার সাধনা' নামক বইয়ে একই কথা একটু ভিন্নভাবে বলেছেন—

বাংলাদেশে এই মানবের মধ্যেই সাধনা। প্রেমই হল ধর্মের প্রাণ। এইসব কথাই বাংলার যোগমতে, বাংলার তান্ত্রিক সাধনায়, বাংলার প্রাকৃত গানে চলে আসছে। বাংলাদেশের সাধনার এটাই প্রাণবস্তু। পরবর্তী সব উপনিষদে যে যুক্তিবিচারের এত স্বাধীনতা তা খুব সম্ভব এইসব মতেরই প্রভাবে। এই স্বাধীনতার জন্য বাংলাদেশকে অন্য প্রদেশের সনাতনপন্থীরা কোনদিনই দু চক্ষে দেখতে পারেননি। অথচ বাংলার বাউলদের এইসব হল সাধনার মূল তত্ত্ব।

পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিগুলির মধ্যেই সেকালের বাঙালীর ধর্মের, বিশেষত হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের আভ্যন্তর বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য শুধুই ধর্মের সাধনা করেছে। স্বতন্ত্রভাবে ধর্মনিরপেক্ষ মানবতার কথা বলেনি—এর কারণটিও স্পষ্ট হয়ে আছে ঐ উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে। সেকালের বাঙালীর ধর্মসাধনা ছিল একান্তভাবে মানবমুখী। জীবন বিযুক্ত সন্ন্যাসের পথে এই ধর্ম তাকে পরিচালনা করেনি। ফলে বাঙালী লেখক ধর্মচর্চা ও জীবনচর্চা একই সঙ্গে করতে পেরেছেন। এ বিষয়ে ডঃ ক্ষেত্র গুপ্তের 'প্রাচীন কাব্য ঃ সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন'-গ্রন্থটির নিম্নে ধৃত মন্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ—

ধর্মকে আশ্রয় করে সে যুগের বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠলেও সে ধর্ম এমনই ধর্ম যা মানবতার প্রকাশে বাধা দেয়নি। .... বৌদ্ধগানগুলির পেছনে

জীবনবিরোধী অদ্বয়-বোধের যে দর্শনই থাক না কেন, যখন সেই দর্শনকে কাব্যরূপ দিতে এগিয়েছেন চর্যাকারেরা, তখন যে রূপকে অবলম্বন করেছেন তারা, সে এই মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, বিরহ-মিলনের রূপক। নাথ সাহিত্যের সংসার বিমুখ সাধনায় নৈরাজ্যিক শুষ্কতার যতই বালুকা চিহ্ন থাক না কেন গোপীরাজার সন্ন্যাস গমনের মুখে দাঁড়িয়ে অদুনা-পদুনা থেকে আরম্ভ করে সাবা রাজ্য জুড়ে যে ক্রন্দনের রোল উঠেছিল তার মানবিক মূল্য অস্বীকার করব কেমন করে? বৈষ্ণব সাহিত্য তো মানবীয় সম্পর্ককে দেবত্বের কোঠায় উঠিয়ে তাকে অপরূপ মহিমামণ্ডিত করেছে। তার পেছনে অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্বের যে কোন নিগূঢ় বক্তব্যই চাপা থাক না কেন, কাব্য রূপে তার মানবিক পরিবেশনই চূড়ান্ত কথা। আর বৈষ্ণব সহজিয়ারা জগতের প্রত্যেকটি পুরুষ ও স্ত্রীকে রাধা ও কৃষ্ণের প্রকাশ বলেই ঘোষণা করে বলেছেন---

সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

মঙ্গলকাব্যগুলিতেও কেবল মানুষের কথা- তার জীবনচর্চার খুঁটিনাটি থেকে আরম্ভ করে চরিত্র মাহাত্ম্য পর্যন্ত সবই ধরে রাখা হয়েছে। দেবতা সেখানে উপলক্ষ্য মাত্র. মানুষই লক্ষ্য। কেবল তাই নয়, দেবতাটিকে পর্যন্ত ক্রোধ হিংসা কলুষিত করে পৃথিবীর সাধারণ মানুষ হিসেবেই চিত্রিত করা হয়েছে।

সাত

ধর্ম ও সাহিত্য ঃ তিন শ্রেণী

ধর্ম সম্পর্কের দৃষ্টিকোণে দেখলে সেকালের বাংলা সাহিত্যকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—

১. ধর্মের তত্ত্ব এবং সাধন পদ্ধতি সরাসরি প্রচার করার বা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে লেখা কবিতা। যেমন চর্যাপদ, শাক্ত পদাবলী বা শ্যামাসঙ্গীত প্রভৃতি।

২. কাব্যরচনার পটভূমি বা বিষয় হিসেবে ধর্ম সাধনা বা ভক্তিবাদের অবস্থান। এঁরা কিছু ধর্মসাধনের কথা প্রচার করার জন্যই কাব্য লিখতেন না। কিন্তু ধর্মসাধনের সঙ্গে এঁদের কাব্য কথা জড়িত বলে ধর্মের ও সাধনার নানা বিষয় এর মধ্যে এসে যেত। নিদর্শন হিসেবে রামায়ণাদির অনুবাদ এবং মঙ্গলকাব্যগুলির কথা বলা যেতে পারে।

৩. নিজেদের সাধনভজনের অঙ্গ হিসেবে কবিতা লেখা হত, অন্যের কাছে

প্রচার করার জন্য নয়। বৈষ্ণবভক্তের অনেক পদাবলী কবির ব্যক্তিগতভাবে আত্মনিবেদনের অথবা ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে ভক্তি-উপলব্ধির উদ্দেশ্যে রচিত ও গীত হত।

এই তিন ধরনের মধ্যে কোন অনতিক্রম্য সীমারেখা ছিল না। এক ধরনের রচনার সঙ্গে অন্য ধরনের মিশ্রণ প্রায়ই দেখা যেত। যেমন বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলী অন্তরঙ্গ রস আস্বাদন করত আশ্রমের আঙ্গিনায়। নগর কীর্তনে বা পদাবলী কীর্তনের আসরে সেই কবিতাই সর্বসাধারণের কাছে ভক্তিধর্ম প্রচারের বিষয় হিসেবে অবলম্বিত হত। আবার মঙ্গলকাব্যের গল্পগুলির মানব রস অর্থাৎ ঘটনা এবং চরিত্রের বুনট নিজের রীতিতেই চলে। আখ্যানের স্বাদ, নানা রসের আয়োজন, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কবির শক্তি অনুযায়ী প্রকাশিত হয়। কিন্তু ঘটনার এমন একটা প্যাটার্ন থাকে যাতে উদ্দিষ্ট দেবতাটির মহিমা কীর্তিত হয়। আজকালকার পাঠক সাহিত্য শিল্প হিসেবে বিচারের সময়ে সেই ধর্মীয় পরিমণ্ডল সরিয়ে রেখে মানবিক দৃষ্টিকোণে এর সাফল্য ব্যর্থতার বিচার করতেই পারেন। আমরা পূর্ববর্তী দুটি গ্রন্থ 'মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে পুরুষ চরিত্র' এবং 'মধ্যযুগের বাংলাকাব্যে নারী চরিত্র' লেখবার সময়ে সেইভাবেই বিচার করেছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও মনে রাখবার যে সেকালের কোন কবিই বিশুদ্ধ সাহিত্যিব প্রেরণার বশবর্তী হয়ে কাব্য রচনা করতেন না। এমনকি ভারতচন্দ্রের মত অতি সচেতন এবং নিপুণ কলাবিদ পর্যন্ত শুধু কাব্য রচনার জন্যই 'অন্নদামঙ্গল' লেখেননি। প্রথার চাপে হলেও সে প্রথা কবির অন্তর পর্যন্ত অধিকার বিস্তার কবেছিল; সে কালের সব কবিরই। ফলে এঁরা সাহিত্য সৃষ্টি এবং ধর্মসাধনা এই দুটি কৃত্য একই সঙ্গে করতে চেয়েছেন।

সেকালের কাব্য কবিতা লোকের কাছে পরিবেশিত হত নানাবিধ পারফর্মিং আর্টের মাধ্যমে। জনসংযোগ সেকালের সাহিত্যকে, সাক্ষরতাহীন সাধারণ মানুষের কাছেও সহজেই পৌঁছে দিত। এ বিষয়ে ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত 'বাংলা সংস্কৃতি ও সংযোগ সমস্যা' এবং তাঁরই রচিত 'সংযোগের সন্ধানে লোক সংস্কৃতি' গ্রন্থ দুটির উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি দেখিয়েছেন সেকালের শিষ্ট সাহিত্য অর্থাৎ লিখিত সাহিত্য জনসংযোগের প্রয়োজনে বিচিত্র লোকায়ত পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করত। মঙ্গলকাব্যগুলি রয়ানি বা ভাসান গান এবং অষ্টমঙ্গলা গানের আকারে গায়েন ও দোহারদের সহযোগে পরিবেশিত হত। সাধারণত মনসা বা চণ্ডী পুজোর সময়ে বা ধর্মঠাকুরের থানে সংশ্লিষ্ট মঙ্গলকাব্যগুলি পরিবেশিত হত এবং নিজ নিজ দেবতার মহিমা কীর্তনের সঙ্গে এই বিশেষ পরিবেশন রীতিরও সম্পর্ক দেখা যেত। রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত প্রভৃতির কথক ঠাকুরেরা পয়ার লাচারি আবৃত্তি ও গান সহযোগে উপস্থিত

করতেন। তখন ধর্মীয় ব্যাখ্যা, যা এমন কি কাব্য কাহিনীতে নেই তাও যুক্ত করে দিতেন। পদাবলী কীর্তনের গাইয়েরা ধর্মব্যাখ্যামূলক প্রচুর পরিমাণে আখর দিয়ে গান গাইতেন। ফলে কবির বর্ণনায় যেখানে সাধারণ মানবিক প্রেমের রূপ ফুটে উঠেছে তাও কীর্তনীয়ার গানে ভগবৎ লীলা রূপে ব্যাখ্যাত হত।

শারদ দুর্গোৎসবের আগে ভিক্ষাজীবী গায়কেরা আগমনী বিজয়ার গান গেয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াত। বাঙালীর প্রধান জাতীয়-ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে উমা-মেনকার এই বাৎসল্য রসের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক স্থাপিত হত। এইভাবে সেকালের বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিতে ও পরিবেশনে ধর্মের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে যেত।

আট

ধর্মজ্ঞান ও সেকালের লেখককুল

মধ্যযুগের বাঙালী কবিরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত, শাস্ত্রজ্ঞ, দর্শন ও ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন এরূপ মনে করার কারণ নেই। তবে লেখকদের মধ্যে একটা বড় অংশ যে নিজ নিজ ধর্মীয় সাধ্য ও সাধনবস্তু সম্পর্কে অবহিত ছিলেন তাতে সন্দেহ করা চলে না। বিশেষত বৈষ্ণব পদাবলীর লেখকেরা অনেকেই ছিলেন গৃহী বা আশ্রমিক বৈষ্ণব সাধক। বৈষ্ণব দর্শনের চর্চা এঁদের মধ্যে যথেষ্ট বিস্তার লাভ করেছিল। সবাই গোবিন্দদাসের মত পণ্ডিত হয়ত ছিলেন না, কিন্তু অনেকেই বৈষ্ণব সাধনার প্রধান প্রধান তত্ত্বগুলি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। প্রাচীন বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরা সহজ রূপকে কবিতা লিখে সাধারণশ্রোতাকে উদ্বুদ্ধ করতে চাইতেন। তাঁরা নিজেরা কিন্তু ছিলেন অতি উচ্চমার্গের পণ্ডিত। বৌদ্ধ মহাযানী তন্ত্রযানী তত্ত্ববস্তুই শুধু জানতেন না সে বিষয়ে ভাষ্যাদিও তাঁরা অনেকেই রচনা করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর গুরু বৃন্দাবনের গোস্বামীদের মতই দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। সমপর্যায়ের না হলেও বৃন্দাবনদাস প্রাক বৃন্দাবনী ভাগবত ধর্ম সম্পর্কে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেছিলেন। মঙ্গলকাব্যের কবিরা লোকধর্ম লোকায়ত সাহিত্যের নিকটবর্তী হলেও সর্বভারতীয় পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের মূল গ্রন্থাদির সঙ্গে তাঁদেরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কাব্য কাহিনীর মাঝে মাঝে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের মূল বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত উল্লেখে বেদান্ত উপনিষদের ক্বচিৎ ইঙ্গিত সে বিষয়ে প্রমাণ রেখে গিয়েছে। বিশেষত মঙ্গলকাব্যের কবিরা কাব্যারম্ভে বিভিন্ন দেবতার বন্দনা স্তব লেখবার সময়ে প্রাচীন ভারতীয় মূর্তিশাস্ত্র, স্মৃতি এবং পুরাণ বিষয়ে সম্যক জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। কখনো কখনো লোক প্রচলিত কিংবদন্তীর সঙ্গে হিন্দুর প্রাচীন শাস্ত্রকে মিলিয়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু

তার পরিমাণ খুব বেশী নয়। ভারতচন্দ্র তো কাব্যারম্ভে বলেই ছিলেন—

পড়িয়াছি যেইমত লিখিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোক বুঝিবারে ভারি।।

ব্যাকরণ সঙ্গীতশাস্ত্র তন্ত্র উপনিষদ প্রভৃতির অধ্যাপকদের সমতুল্য ছিল তাঁর জ্ঞান। মুকুন্দ চক্রবর্তী, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, ঘনরাম প্রভৃতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যাক্তি ছিলেন।

মধ্যযুগের অনেক কবিই বড় বড় নবাব সামন্ত ও ভূস্বামীদের সভাকবি ছিলেন। এঁরা সকলেই যুগপৎ সভাকবি এবং সভাপণ্ডিত। এঁদের পাণ্ডিত্য অবশ্যই ধর্মশাস্ত্র বর্জ্জিত ছিল না। আলাওল, দৌলত কাজী, সাবিরিদ খাঁ, মহম্মদ খাঁ প্রভৃতি বিশিষ্ট মুসলমান কবিবা ইসলামী ধর্মশাস্ত্র, সূফীতত্ত্ব এবং সাধনা ভালভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন। অনেকেই সংস্কৃত, হিন্দি, ফার্সী এবং আরবী ভাবায় সাহিত্য ও শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁদের রচনায় সে অধ্যয়নের প্রমাণ ভুরি ভুরি রয়েছে।

এই তথ্যাদির উল্লেখ করলাম একটি কারণে। তা হল সেকালের কবিরা শুধুই প্রথার বশে অশিক্ষিত পটুত্ব নিয়ে কিংবা জনসাধারণের সহজ ধর্ম ও ভক্তিভাব নিয়ে কাব্যে ধর্মকে আশ্রয় করেননি। কাব্য ও ধর্মকে মিলিয়ে দিতে এবং কাব্যের মধ্য দিয়ে ধর্ম প্রচার করতে তারা যে চেষ্টা করেছিলেন সে বিষয়ে তাঁদের যোগ্যতার অভাব ছিল না। মধ্যযুগের বিশিষ্ট কবিদের অনেকেই যে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, অন্তত পড়িয়ে লোক ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তবে একথাও পাশাপাশি মনে রাখার যে লোকায়ত মৌখিক সাহিত্য এবং লিখিত শিষ্ট সাহিত্য যেখানে কাছাকাছি অবস্থান করেছে সেখানে উচ্চাঙ্গের শাস্ত্রজ্ঞতা পাওয়া যাবে না। বাউলদের গান কিংবা নাথপন্থী কাহিনী দুটি অথবা যোগীকাচ প্রভৃতিকে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এদের লেখকেরা খুব উচ্চস্তরের তাত্ত্বিক পণ্ডিত ছিলেন না। কিন্তু সাধন ভজনের কিছু নিগূঢ় বোধ সম্ভবত গুরু পরম্পরায় এঁরা লাভ করেছিলেন। এঁদের রচনাদির মধ্যে সেই সূক্ষ্ম ধর্মীয় বোধগুলি সহজ ভাষায় ও বাচনভঙ্গিতে ছড়িয়ে আছে।

ভারতের মানুষেরা, তারই অন্তর্ভুক্ত বঙ্গদেশের লোকেরা ধর্মতত্ত্ব ঘটিত নানা সূক্ষ্ম জটিল ধারণা সহজেই আপনাদের অন্তরে আত্মস্থ করে নিতে পারতেন। আধুনিক শিক্ষার ফলে তার কিছু ব্যত্যয় একালে ঘটেছে। এদেশের মানুষের কাছে বেদান্ত উপনিষদের নানা বোধ এত সহজাত, কর্মফল, নিয়তিবাদ, মূর্তিপূজা ও একেশ্বরবাদ সম্পর্কিত ভাবনাগুলি এত দৈনন্দিন যে বিদেশী ভাবুকেরা অশিক্ষিত সাধারণ ভারতবাসীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বারবার চমকে উঠেছেন। সেকালের বাংলা সাহিত্য এই ধর্মবোধের পরিমণ্ডলে গড়ে

উঠেছে। ধর্ম তার কাছে বাইরে থেকে কিছু আরোপিত ব্যাপাব হয়ে আসেনি, ভিতর থেকে উদ্ভূত কতগুলি সহজ প্রত্যয়রূপে দেখা দিয়েছে।

নয়
'ধর্ম' প্রচলিত অর্থেই

ধর্ম কি? তা নিয়ে কোনরূপ তত্ত্বগত বিতর্কে আমরা প্রবেশ করব না। ধর্ম 'রিলিজিয়ান' অথবা সামগ্রিক জীবনাচার— এই বিতর্ক বর্তমান প্রসঙ্গে অর্থহীন। সাধারণ মানুষ ধর্মকে রিলিজিয়ান বলেই মনে করে। অবশ্যই জীবনাচারের একটা অংশ রিলিজিয়ানের সঙ্গে সম্পৃক্ত, কিন্তু সবটা নয়। আমরা যখন বলি 'সেকালের বাঙালীর জীবনযাত্রা, বিশ্বাস, সাহিত্য সবই ছিল থিয়োসেন্ট্রিক বা ধর্মকেন্দ্রিক' তখন আমরা ধর্ম বলতে মোটামুটি রিলিজিয়ানকেই বুঝি ।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধর্মের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা ধর্মকেন্দ্রিক দার্শনিকতা, ঈশ্বর সম্পৃক্ত চিন্তাধারা, সাধনপদ্ধতি, সাধ্যবস্তু, দেবপরিমণ্ডল প্রভৃতি বিষয়গুলোকে মূলত গুরুত্ব দেব। হিন্দু বৌদ্ধ ইসলাম ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে বাংলা সাহিত্য কি রূপ পরিগ্রহ করেছিল তা অনুধাবন করব। তান্ত্রিকতা, সহজসাধনা, রসায়নবাদ প্রভৃতি গুহ্যতত্ত্বের কাল্ট ও তার ইতিহাস অর্থাৎ ক্রমবিকাশ বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কতটা তাৎপর্যপূর্ণ তার দিকেও দৃষ্টিপাত করব।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বৌদ্ধ সহজযান এবং চর্যাপদ

এক
সাধারণ পরিচয়

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ' বা 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মাচরণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এই সঙ্কলন গ্রন্থে যে পদগুলি ধৃত হয়েছে তার রচনা কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে তর্ক আছে। তবে এবিষয়ে মোটামুটি ঐকমতে পৌঁছন গিয়েছে যে ৮ম থেকে ১২শ শতকের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে এগুলি বচিত হয়েছিল।

বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের যে শাখাটি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল তাকে 'মহাযানী তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম' বলে উল্লেখ কবা যায়। তারই অন্তর্ভুক্ত বিশেষ গোষ্ঠী, 'সহজযান' নামে যার পরিচিতি, চর্যাপদের রচয়িতাদের ধর্মবোধে তার প্রকাশ ঘটেছে।

চর্যাপদ বৌদ্ধ সহজিয়াদের—যারা মহাযানী তান্ত্রিক বৌদ্ধদের অন্যতম গোষ্ঠী তাদের ধর্মভাবনার প্রতিফলিত রূপ লক্ষ্য করা যায়। তবে অন্যান্য বৌদ্ধ বিশ্বাস ও আচার আচরণের কিছু কিছু উপাদান যে এদের মধ্যে প্রবেশ করেনি এমন নয়। এই বৌদ্ধ সাধকেরা সাধারণত সিদ্ধাচার্য নামে পরিচিত ছিলেন। এঁদের দার্শনিক প্রতীতির মধ্যে একদিকে যেমন বৈদান্তিকসুলভ অতি গভীর বস্তুবিমুখ ভাববাদ প্রাধান্য পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি যোগ ও তন্ত্রের মানবদেহকে সাধন ক্ষেত্রে অনন্য গুরুত্ব দেওযাব প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। বস্তুবিশ্বকে সিদ্ধাচার্যেরা বৈদান্তিকদের মতই সম্পূর্ণ মোহগ্রস্ত মনের সৃষ্টি বলে মনে করেছেন। যে মুহূর্তে মন মোহমুক্ত হয় সে মুহূর্তে এই বস্তুময় পৃথিবীর ইন্দ্রিয়ানুভূতি—সব কিছুই শূন্যে বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু এই পরম সত্যের সাধনা করতে গিয়ে জপ-তপ, পূজা-অর্চনা প্রভৃতির মধ্যে প্রবেশ করে কোন লাভ নেই, এগুলি সবই ভ্রান্তি সংস্কার মাত্র। এই সত্য আছে নিজের মধ্যে, প্রতিটি মানুষের মধ্যে, সাধকের মধ্যে। সেই পরম সত্যের উপলব্ধি করতে গেলে দেহাভ্যন্তরের শক্তিকে জাগ্রত করতে হবে। এইভাবে এঁরা একটি পরিপূর্ণ বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্র উদ্ভাবিত করেছেন এবং যোগমতে কায়াসাধনের সঙ্গে তাকে সংযুক্ত করেছেন।

বাঙালীর আদিযুগের ধর্মোপলব্ধির এটাই পরম বৈশিষ্ট্য যে আদি বৌদ্ধদের নির্বানের তত্ত্ব এবং বৈদান্তিকের মায়াবাদ এখানে তন্ত্রের কায়াসাধনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। অধ্যাপক নীহার রঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস' নামক গ্রন্থে এবিষয়ে যে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন একটু দীর্ঘ হলেও এখানে তা উল্লেখ করছি—

> সহজযানে দেবদেবীর স্বীকৃতি যেমন নাই, তেমনি নাই, মন্ত্র-মুদ্রা-পূজা-আচার-অনুষ্ঠানের স্বীকৃতি, সহজযানীরা বলেন কাঠ মাটি বা পাথরের তৈরী দেবদেবীর কাছে প্রণত হওয়া বৃথা। বাহ্যানুষ্ঠানেব কোন মূল্য তাঁহাদের কাছে ছিল না। ব্রাহ্মণদের নিন্দা তো তাঁহারা করতেনই; যে সব বৌদ্ধ মন্ত্র জপ, পূজার্চনা, কৃচছ্রসাধন, প্রব্রজ্যা ইত্যাদি করিতেন তাঁহাদেরও নিন্দা করতেন। সহজযানী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের গূঢ় সাধন পদ্ধতি ও ধ্যান ধারণার সূক্ষ্ম গভীর পরিচয় দোহাকোষের দোহা এবং চর্যাগীতির গীতগুলিতে বিধৃত হইয়া আছে। সহজযানীরা বলেন, বোধি বা পবমজ্ঞান লাভের খবর অন্য সাধারণ লোকের তো দূরের কথা বুদ্ধদেবও জানিতেন না—বুদ্ধোহপি ন তথা বেত্তি যথায় মিতরো নরঃ। ঐতিহাসিক বা লৌকিক বুদ্ধের স্থানই বা কোথায়? সকলেই তো বুদ্ধত্ব লাভের অধিকারী এবং এই বুদ্ধত্বের অধিষ্ঠান দেহের মধ্যে—দেহস্থিতং বুদ্ধত্বং, দেহহি বুদ্ধ বসন্ত ণ জানই। কোথায় কতদূরে গেল শূন্যবাদ, কতদূরে সরিয়া গেল বিজ্ঞানবাদ। জাগিয়া রহিল শুধু দেহবাদ, শুধু কায়াসাধন।

বৌদ্ধধর্মের বজ্রযান-মন্ত্রযানে নানা বৌদ্ধ দেবদেবীর উদ্ভব ঘটে, তাঁদের পূজাপাঠের বিচিত্ররীতি প্রবর্তিত হয়। সহজযানী বৌদ্ধেরা ছিলেন এর বিরুদ্ধে। প্রথাবদ্ধ যে কোন ধরনের ধর্মাচরণের বিরুদ্ধে বাঙালী সহজিয়া সম্প্রদায়গুলির যে বিরূপতা পরবর্তীকালে বারবার দেখা দিয়েছে, বৌদ্ধ সহজযানে তার আদি রূপটি দেখতে পাই।

চর্যাপদের ধর্মীয় পটভূমি বিশ্লেষণ করতে গেলে যে কয়টি দিকের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে তা হল—

১. মূল দার্শনিক প্রত্যয়।

২. সহজের স্বরূপ এবং সমকালীন অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি।

৩. সাধ্যবস্তু—মহাসুখ।

৪. সাধনপদ্ধতি—বৌদ্ধতন্ত্র ও যোগতত্ত্ব।

দুই
মূল দার্শনিক প্রত্যয়

সহজিয়ারা আদি বৌদ্ধদের আদর্শের অনুসরণে যে চূড়ান্ত ভাববাদী দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন সেকথা আমরা আগেই বলেছি। ভাববাদীরা বলেন 'আইডিয়া' বা ভাবই সত্যবস্তু জগৎ মায়ামাত্র। প্রাচীন হিন্দু দর্শনে এঁদের অদ্বৈতবাদীও বলা হয়েছে। বৌদ্ধেরা স্বতন্ত্র দর্শনের প্রবক্তা হলেও বৈদান্তিকের মত তাঁদেরও অদ্বৈতবাদী বলা যায়। কারণ অস্তিত্বের চরম সত্য নির্বাণে—এই হল তাঁদের অভিমত। ভারতের বিভিন্ন ধর্মপন্থা তা হিন্দু বা বৌদ্ধ যাই হোক না কেন, মূলত বিশ্বকে মায়া প্রপঞ্চ বলেই মনে করেছে। মূলত হলেও, সর্বত্র নয়। গোঁড়া অদ্বৈতবাদীরা যেমন বস্তুবিশ্বকে উড়িয়ে দেন, তেমনি একে প্রাতিভাসিক সত্য বলে অনেকে কিঞ্চিৎ মূল্যও দিয়ে থাকেন। মেটেরিয়ালিস্ট বা বস্তুবাদী ছাড়া অন্যসব মতাবলম্বীরাই পূর্ণত বা অংশত ভাববাদে বিশ্বাসী।

বাংলার বৌদ্ধ সহজিয়ারা তাঁদের ভাববাদী ধ্যানধারণা নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এঁদের সব ভাবনাচিন্তাই রূপকের আশ্রয়ে প্রকাশ পেয়েছে। লুইপাদ ১ নং চর্যায় লিখেছেন—

চঞ্চল চী এ পইঠা কাল

অর্থাৎ, চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবিষ্ট। সময়ের যে বোধ তা চঞ্চল চিত্ত দ্বারাই সৃষ্ট। স্থান এবং সময় বস্তুবোধের দিক থেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। এখানে সেই সময়ের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে। কাল বা তার গতি মানুষের সৃষ্টি—সেই মনের সৃষ্টি যা চঞ্চল অর্থাৎ বিবিধ বাসনার দ্বারা আবেগাপ্লুত। সেই মন যদি সংযত হত তবে দেখা যেত সময় বলে কিছু নেই। ২৯ নং চর্যায় লুইপাদ আবার লিখেছেন—

ভাব ন হোই অভাব ণ জাই।
অইস সংবোহেঁ কো পতিআই।।

....

কাহেরে কিস ভণি মই দিবি পিরিচ্ছা।
উদকচান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা।।

অর্থাৎ ভাব বা অস্তিত্ব বলে কিছু নেই। অভাব বা অনস্তিত্ব বলেও কিছু নেই। অস্তিত্ব অর্থে থাকা এবং অনস্তিত্ব অর্থে চলে যাওয়া—এই দুই বোধই ভ্রান্ত। এতে বিশ্বাস স্থাপন কে করবে? জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়েছে। সেই প্রতিবিম্ব সত্য না মিথ্যা? সে সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়। কাজেই ঐ প্রশ্নেরই কোন উত্তর হয় না।

কাহ্নপাদ একাধিক পদে এই চূড়ান্ত ভাববাদী চেতনা প্রকাশ করেছেন। ৭নং চর্যায় লিখেছেন—

জে জে আইলা তে তে গেলা।
অবণাগবণে কাহ্ন বিমণ ভইলা।।

অর্থাৎ যাহা এল তাহা চলে গেল। এই যাতায়াতের স্রোত দেখে কাহ্ন বিগতমন হলেন। অর্থাৎ সাধক কাহ্নপাদ অনুভব করলেন অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব, জন্মমৃত্যুর স্রোতে ভাসা এই বিশ্বব্যাপার আসলে মনের সৃষ্টি। তাই তিনি চঞ্চল চিত্তকে সম্পূর্ণ সংযমিত ও শুদ্ধ করলেন। তাকেই বলা হয়েছে বিমন অথবা বিগতমন বা মনঃশূন্য হওয়া। ১৩ নং চর্যায় কাহ্ন আরো লিখেছেন—

গন্ধ পরস রস জইসো তইসো।
নিংদ বিহুনে সুইনা জইসো।।

অর্থাৎ গন্ধ স্পর্শ বা স্বাদুতা এইসব ইন্দ্রিয় উপভোগ কিরূপ না নিদ্রা বিহনে স্বপ্ন যেমন। কবি একটি অসাধারণ উপমা সংযোগে ভাববাদী বোধটি প্রকাশ করেছেন। গন্ধ স্পর্শ প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়াত্মক যে বস্তুবোধ (বস্তুবিশ্বকে তো আমরা ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমেই সত্য বলে জানি) তাও স্বপ্নের মত অলীক। কবি এই উপমাতেই থামলেন না। মানুষ স্বপ্ন দেখে নিদ্রিত অবস্থায়, কিন্তু যেখানে নিদ্রাই নেই সেখানে স্বপ্ন শুধু অলীক, অসম্ভব ব্যাপার। ঐ সব ইন্দ্রিয়জ্ঞানজাত বিশ্ববোধ সেইরূপই অসম্ভব।

সরহপাদ ২২নং চর্যায় লিখছেন—

অপণে রচি রচি ভব নিব্বাণা।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপণা।।
অম্হে ন জাণহুঁ অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই।।
জইসো জাম মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মইলেঁ ণাহি বিশেসো।।

অর্থাৎ আমরা নিজেরা বসে বসে এই বিশ্বকে রচনা করছি, আমরাই নির্বাণকে রচনা করছি। এই মিথ্যা সৃষ্টির জালে আমরা নিজেকে বেঁধে ফেলছি। আমরা অচিন্ত্যযোগীরা জানি না জন্মমৃত্যু, ভববন্ধন, এসব কি? কেমন করে হয়? বাঁচায় মরায় পার্থক্য কোথায়? সরহ একেবারে সোজা ভাষায় কোনরকম রূপকের আশ্রয় না নিয়ে অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের ধারণাকেই অস্বীকার করেছেন। শুধু সংসারী মানুষের ভববন্ধনকেই নয়, সাধকদের নির্বাণ ও মোক্ষের বোধকেও অসিদ্ধ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।—

আর্যদেব ৩ নং চর্যায় লিখেছেন—

চান্দরে চান্দকান্তি জিম পড়িভাসঅ।
চিঅ বিকরণে তহিঁ টলি পইসঅ।।

অর্থাৎ আকাশে যদি চাঁদ না থাকে জ্যোৎস্নাও থাকবে না। তেমনি চিত্তে চাঞ্চল্য না থাকলে বিশ্বও থাকবে না। অর্থাৎ চঞ্চল চিত্তই মায়া প্রপঞ্চময় বিশ্বের স্রষ্টা।

ভাদেপাদ ৩৫ নং চর্যায় লিখছেন—

পেখমি দহদিহ সব্বই শূন।
চিঅ বিহুন্নে পাপ ন পুন্ন।।

অর্থাৎ চিত্ত না থাকলে দশদিক শূন্য। কোথাও থাকে না পাপ বা পুণ্যের বোধ। অর্থাৎ পাপপুণ্যের বোধ বিশ্ব অস্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। যেখানে সবকিছুই শূন্য, সেখানে পাপ বা কি পুণ্যই বা কি?

তারকপাদ ৩৭নং চর্যায় লিখছেন—

আপণে নাহিঁ সো কাহেরি সঙ্কা।
তা মহামুদেরি টুটি গেলি কংখা।।

অর্থাৎ আমি নিজেই তো নেই। আমার ব্যক্তিগত অস্তিত্বের বোধও মায়া মাত্র। যখন তার ঊর্ধ্বে উঠি তখন ভয় লোভ সবই চলে যাবে। কোন বিপদেই ভয় থাকবে না, কোন কিছুতেই থাকবে না লোভ—এমন কি সিদ্ধিতেও।

ভুসুকুপাদের ৪১নং চর্যায় এই বিশেষ ভাবনার চরম প্রকাশ ঘটেছে অনেকগুলি চিত্তচমৎকারা রূপক উপমার মধ্যে—

আইএ অণুঅনাএ জগরে ভাংতিএ সো পড়িহাই।
রাজ সাপ দেখি জো চমকিই সাচে কিং তং বোড়ো খাই।
অকট জোই আ রে মা কর হথা লোহ্না।
আইস সহাবে জই জগ বুঝবি তুট বাষনা তোরা।।
মরু-মরীচি গন্ধব-নইরী দাপণ পতিবিম্বু জইসা।
বাতাবত্তেঁ সো দৃঢ় ভইআ অপেঁ পাথর জইসা।।
বাংন্ধি সুআ জিমে কেলি করই খেলই বহুবিহ খেড়া।
বালু আ তেলেঁ সসরসিংগে আকাশে ফুলিলা।।

অর্থাৎ আদিতে অনুৎপন্ন এই জগৎ, ভ্রান্তি বশত সে প্রতিভাত হয়। দড়ি দেখে যে সাপ বলে চমকিত হয়, তাকে কি বোড়ো সাপে খায়। ওহে মূর্খ যোগী ভুল করে হাত লোনা করো না। জগতকে তার এই সত্য স্বভাবে যখন বুঝবে তখনই তোমার বাসনা বন্ধন ছিন্ন হবে। এই বিশ্ব প্রপঞ্চ কেমন? না-মরুভূমির মধ্যে মরীচিকা যেমন, গন্ধর্বদের তৈরি কাল্পনিক নগরী যেমন, দর্পণের প্রতিবিম্ব যেমন সেইরূপ। বাতাসের আবর্ত অর্থাৎ ঘূর্ণিঝড় যখন জলস্তম্ভ তৈরি করে তখন তাকে পাথরের মত দৃঢ় মনে হয়। ঠিক তেমনি এই ভ্রান্তিকর বিশ্বের

বোধ। যদি কেউ বলে বন্ধ্যা নারীর পুত্র খেলা করছে—নানা রকমের খেলা, আবার কেউ যদি এসে বলে বালু থেকে নিস্কাসিত তেলের, শশকের শৃঙ্গের কথা বা আকাশে প্রস্ফুটিত ফুলের কথা তা যেমন ভ্রান্ত, এ বিশ্বও তাই।

তিন

অন্যবিধ সাধনার প্রতি কটাক্ষ

প্রথাবদ্ধ এবং প্রসিদ্ধ ধর্মাচরণ পদ্ধতি এবং বিভিন্ন মতবাদ ও বিশ্বাসের প্রতি সহজিয়া বৌদ্ধেরা অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। সব ধর্মের সহজ সাধকেরা তন্ত্রমন্ত্র পূজাপার্বণ ধ্যান, সামাজিক ধর্মাশ্রয়ী রীতিনীতি—এসবের দিকে ভ্রুক্ষেপ মাত্র করতেন না। চর্যাপদের বিভিন্ন কবিতায় এই সমালোচনামূলক মনোভাব মাঝে মাঝেই তীক্ষ্ণ ও তীব্র ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সরহপাদ চর্যাগানের সঙ্গে সঙ্গে অবহট্টভাষায় একটি দোহাকোষও রচনা করেছিলেন। দোহাকোষও চর্যার মত সহজসাধনার কাব্য সঙ্কলন। সরহের দোহায় এই সমালোচনার সুর মাঝে মাঝেই তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। তার একটি মাত্র নিদর্শন এখানে উল্লেখ করছি। —সরহ লিখেছেন—জৈন ক্ষপণকেরা নগ্ন হয়ে থাকে, ভাবে এতেই বুঝি মুক্তি, তাই যদি হত তা হলে শেয়াল কুকুরের মুক্তি হত সবচেয়ে আগে। মুণ্ডিত কেশ ধর্মসাধনার উপায় হলে স্ত্রীলোকের কেশহীন নিতম্ব সর্বাগ্রে সিদ্ধি লাভ করত। ঘাস পাতা খেয়ে থাকলে যদি মুক্তি হত তবে সর্বাগ্রে মুক্তি পেত ঘোড়া আর হাতির দল। তিনি আর একটি পদে লিখেছেন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম যে মানুষকে চার বর্ণে বিভক্ত করে সেসবই চতুর লোকদের বানানো ব্যাপার। ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মের মুখ থেকে সৃষ্টি হয়েছে এরূপ অদ্ভুত কথায় কে বিশ্বাস করবে। জল মাটি কুশ সাজিয়ে আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করলে ধর্মলাভ হয় না,- ধোঁয়ায় চোখ জ্বলে যায়। তিনগাছা সুতোর যজ্ঞোপবিত ধারণ করা একটা লোক ঠকানো ব্যাপার।

এই ধরনের প্রথাসিদ্ধ ধর্মবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর অন্যান্য সহজিয়া গোষ্ঠীর মধ্যেও শোনা যায়। বৈষ্ণব সহজিয়া বাউল প্রভৃতি সাধক গোষ্ঠী অনুরূপ অনুভূতি নানা লেখায় প্রকাশ করেছেন। চর্যাপদ থেকে আমরা দু-একটি নিদর্শন উল্লেখ করছি।—

কাহ্নুপাদের ১০ নং চর্যার শুরুতে মুণ্ডিত মস্তক ব্রাহ্মণ সাধুর চরিত্রদোষ নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।—

নগর বাহিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো ব্রাহ্মণ নাড়িআ।।

অর্থাৎ নগরের বাইরে ডোম নারীর কুঁড়ে ঘর। মুণ্ডিত মস্তক ব্রাহ্মণ তার চারধারে অভীপ্সা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এর মধ্যে গভীরতর তত্ত্বার্থ থাকা সম্ভব কিন্তু আপাত অর্থটি ভণ্ড ব্রাহ্মণত্বের প্রতি আক্রমণ।

সরহপাদের ২২ নং চর্যায় বৌদ্ধ নির্বাণবাদীদের কটাক্ষ করে বলা হয়েছে—

অপনে রচি রচি ভব নির্ব্বাণা।

অর্থাৎ ভববন্ধন এবং তা থেকে মুক্তিস্বরূপ নির্বাণের তত্ত্ব — এতো মানুষ নিজের মন থেকেই তৈরি করে। এর মধ্যে সত্যতা কিছুই নেই। লক্ষ্য করার মত আদি বৌদ্ধদেব নির্বাণ মুক্তির তত্ত্বটি পর্যন্ত সহজিয়া বৌদ্ধেরা বাতিল করে দিচ্ছেন। ঐ পদেই সরহ রসায়নবাদীদের ব্যঙ্গ করে লিখেছেন—

জা এথু জাম মরণে বি সঙ্কা।
সো করউ রস রসাণেরে কংখা।।

অর্থাৎ যার জীবনে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে সে রসায়নের দ্বারা অমর হবার চেষ্টা করুক। রসায়নবাদী নামে প্রাচীনকাল থেকে একশ্রেণীর যোগীসিদ্ধা ভারতীয় সাধক মণ্ডলীতে ছিলেন। তাঁরা এক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কারে ব্রতী ছিলেন যার সাহায্যে অমরত্ব লাভ করা যায়। পুরনো বাংলার নাথপন্থী সিদ্ধাইরা এই রসায়নবাদকে কতকটা পরিবর্তিত করে তাদের সাধন রীতির অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বাংলার নাথপন্থী সিদ্ধাইদের সঙ্গে কোন কোন চর্যাকারের সম্পর্কের কথা কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করে থাকেন, যেমন জালন্ধরি পাদ এবং হাড়িপা একই ব্যক্তি ছিলেন বলে অনুমিত হয়। এখানে সরহপাদ রসায়নবাদীদের সাধনার ভ্রান্তি দেখিয়ে দিয়েছেন।

লুইপাদ আগম শাস্ত্র অর্থাৎ তন্ত্র এবং বেদ এই উভয় শাস্ত্রেরই সমালোচনা করে লিখেছেন---

জাহের বান চিহ্নরূব ণ জাণী।
সো কইসে আগমবেএঁ বখাণী।।

অর্থাৎ যাহার বর্ণরূপ লক্ষণ বা চিহ্ন কিছুই জানা যায় না সেই সত্য স্বরূপকে আগম শাস্ত্র বা বেদ কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?

চার

সহজের স্বরূপ

সাধনায় তান্ত্রিক কিন্তু বোধে সহজিয়া। সহজের স্বরূপ এবং সহজিয়া সাধনা বৌদ্ধতন্ত্রের কায়া সাধন তন্ত্রের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে চর্যাপদে। সহজের তত্ত্বটি একটু বিশেষভাবে বুঝে নেওয়া যাক। সহজ অর্থে স্বভাবজ -- জন্মসূত্রে কোন

চেষ্টা ছাড়া মানুষ যা পায়। সহজিয়াদের ধর্মসাধনা এই সহজকে নিয়ে। পরম সত্য যাকে পাওয়া মানবজীবনের চরম সার্থকতা তা দূরে কোথাও নেই, কোন স্বর্গলোকে মোক্ষধামে নির্বানে দেবকাল্পনায় কোথাও নেই। সে আছে আমাদের মধ্যে। তাকে নিয়েই আমরা জন্মেছি, আর তাকে পাওয়ার উপায়ও আছে আমাদেরই মধ্যে—তাও স্বভাবজ। সহজ সাধনা কোন জটিল বা কাল্পনিক ব্যাপার নয় এবং মানুষের স্বাভাবিক যে প্রবৃত্তি তাকে উৎসাদিত করে নয়, কোন অস্বাভাবিক পন্থায় নয়, স্বাভাবিক দেহধর্মের মধ্য দিয়েই পেতে হয় সেই সত্যস্বরূপকে। সরহপাদ দোহাকোষের একটি পদে বলেছেন—সহজকে কানে শোনা যায় না, চোখে দেখা যায় না, সহজ বাতাসে নড়ে না, আগুনে পোড়ে না, বৃষ্টিতে ভেজে না; এর হ্রাস বৃদ্ধি নেই। যদিও দেহে এর নিবাস, কিন্তু সহজ জন্ম-মৃত্যুর অতীত। এই সহজকে পাবার জন্যই বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধনা এবং তাকে পাবার পথও সহজ, কোন তন্ত্র-মন্ত্র ধ্যান-ব্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে নয়; মানব দেহের মধ্যেই সেই দেহাতীত সহজের অবস্থান। এই সহজই মহাসুখ এবং এই সহজই চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের অতীত পরম সাধ্য।

সাধন বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে সহজ বা মহাসুখপ্রাপ্তি সম্পর্কে আমরা আরো কিছু আলোচনা কবব। চর্যার কবিতা থেকে সহজ বিষয়ে দু একটি উদ্ধৃতি ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। চাটিলপাদ বলেছেন—

ণিয়ড্ডী বোহি দূর ম জাহী।।

অর্থাৎ বোধি নিকটে দূরে যেও না। কাহ্নপাদ লিখছেন—

নিঅড়ী জিনেউর বট্টই।।

অর্থাৎ জিনপুর বা সিদ্ধিক্ষেত্র রয়েছে নিকটেই। কাহ্নর অন্য কবিতায় পাই—

সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা।।

অর্থাৎ সহজ হল পদ্মবন যেখানে প্রবেশ করতে পারলেই সম্পূর্ণ নিবৃত্তি লাভ হয়। শান্তিপাদ ১৫নং চর্যায় বার বার বলেছেন, সোজা পথে চলতে—

জে জে উজুবাটে গেলা অনাবাটা ভইলা সোঈ।।

যে সোজা পথে গেল তার আর পথ রইল না। অর্থাৎ তার চলা শেষ হয়ে গেল। একই কবিতায় আবার বলেছেন—

মহাসিদ্ধি সিঝএ উজুবাট জাতন্তে।।

অর্থাৎ ঋজু বা সহজ পথে গেলেই পাওয়া যাবে চরম সিদ্ধি।

কাহ্নপাদের আর একটি চর্যায় আছে—

খণহ ণ ছাড়অ সহজ উন্মত্তো।।

অর্থাৎ যে সাধক ভাবে ভোলা উন্মত্ত সে কখনোই সহজকে ছাড়ে না।

শবরপাদ লিখছেন—

নিঅ ঘরণী নামে সহজ সুন্দরী।।

অর্থাৎ যে সাধক সহজকে নিজের গৃহিণীর মত একাত্ম করে নিয়েছেন তিনিই সিদ্ধ।

সরহপাদ লিখছেন—

উজ্জুরে উজ্জু ছাড়ি মা লেহুরে বঙ্ক।
নি অড়ডি কেহি মা জাহুরে লাঙ্ক।।
হাথেরে কাঙ্কাণ মা লাউ দাপণ।

অর্থাৎ সহজকে ছেড়ে বাঁকা পথে যেও না। কাছেই আছে বোধি তাকে ছেড়ে সুদূর লঙ্কায় ছুট না। হাতে আছে কঙ্কণ তা দেখবার জন্য দর্পণ নিও না।

পাঁচ
সাধনপদ্ধতি

সহজিয়া বৌদ্ধরা একটি গুহ্য ধর্ম সম্প্রদায়। তাদের ধর্মসাধনার প্রধান অঙ্গই হচ্ছে সাধন তত্ত্ব। এই সাধনপদ্ধতিতে হিন্দু এবং বৌদ্ধ তন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। কিছু পারিভাষিক শব্দে পার্থক্য আছে এবং যোগমত অনুযায়ী দেহ গঠনে কিছু স্বতন্ত্র কল্পনা আছে। চর্যার অধিকাংশ কবিতাই বারংবার সাধনতত্ত্বের কথা বলেছে। বৌদ্ধ সহজিয়াদের ধর্মসাধনাও অন্যান্য বহু গুহ্য ধর্মাচারীদের মত গুরুবাদী কায়াসাধনা।

(১) গুরুবাদ

একজন প্রকৃত বা উপযুক্ত গুরু চাই যিনি সাধককে প্রকৃত সাধনপদ্ধতি সম্পর্কে ঠিক শিক্ষা দিতে পারবেন। গুরুর নির্দেশ ছাড়া এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা অসম্ভব। গুরুকে তাই এই কবিরা স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। গুরুর নির্দেশ বাস্তব সাধনপদ্ধতিতে অপরিহার্য—এই নির্দেশ কোন লিখিত পুঁথিতে বা তত্ত্ব আলোচনার মাধ্যমে পাওয়া সম্ভবপর নয়। প্রতি স্তরে মুহুর্মুহু আবির্ভূত সমস্যার ক্ষেত্রে গুরুকে জিজ্ঞাসা করেই পথ ঠিক করতে হয়।—

১. লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ।

অর্থাৎ লুইপাদ বলছেন গুরুকে জিজ্ঞাসা করে পথের নির্দেশ গ্রহণ কর।

২. সদগুরু বোহেঁ জিতেল ভববল।

কাহ্নপাদ বলেছেন সদ্‌গুরুর বোধের সাহায্যে এই ভব মায়া জয় কর।

৩.সদগুরু পাঅ পত্র জাইব পুণু জিণউরা।

ডোম্বীপাদ এখানে বলেছেন যে সদগুরুর পাদপ্রসাদে জিনপুরে প্রবেশ করা সম্ভব।

৪. এতকাল হাঁউ অচ্ছিলেসু মোহেঁ।
এবেঁ মই বুঝিল সদগুরু বোহেঁ।।

অর্থাৎ এতকাল আমি মোহে আচ্ছন্ন হয়েছিলাম, এখন আমি সত্য পথ জানলাম সদ্‌গুরুর পরামর্শে।

কিন্তু এই গুরু প্রদত্ত শিক্ষার স্বরূপ কি সে সম্পর্কেও খুবই রহস্যজনক কথা চর্যার কবিরা বলেছেন। এ এমনই একটি সাধন-শিক্ষা যেখানে উপদেশদাতা গুরু বোবা এবং উপদেশ-শ্রোতা শিষ্য কালা।

জেতই বোলী তেতবি টাল।
গুরু বো সে সীস কাল।। (কাহ্নপাদ)

অর্থাৎ যতই বলা হবে ততই ভুল বলা হবে। এক্ষেত্রে শিষ্যের প্রতি গুরুর যে উপদেশ তাতে গুরু হলেন বোবা এবং শিষ্য কালা। অর্থাৎ গুরুর শিক্ষা এবং শিষ্যর শিক্ষা গ্রহণ দুটি একটি অলৌকিক পদ্ধতির অংশ। তা বলে ব্যাখ্যা করে শব্দার্থের সাহায্য নিয়ে ঘটানো সম্ভব নয়। যদি সম্ভব হত তাহলে পুঁথিপত্র মন্ত্র তন্ত্র এতেই কাজ হত সরাসরি, গুরুকে লাগত না। কিন্তু সহজিয়া সাধকের গুরু না হলে চলে না।

(২) কায়াসাধন

বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধন কায়াসাধন। তন্ত্র এবং যোগ এখানে মিলেছে। আমরা আগেই দেখেছি তাঁরা বারবার বলেছেন সত্য আছে দেহের মধ্যে, সত্য আছে কাছে। তিনি হলেন সহজ অর্থাৎ সহজাত, জন্মের সঙ্গে তাঁকে পেয়েছি ভিতরে, মিথ্যেই তাঁকে বাইরে খুঁজে বেড়ানো। পূজায়, মন্ত্রে ধ্যানে দেহের সাধনাই সত্যের সাধনা। দেহভাণ্ডেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড।

আমরা আগেই বলেছি একদিকে চূড়ান্ত বস্তুবন্ধনহীন ভাববাদী চেতনা। অন্যদিকে দেহকেই সাধনপীঠ বলে মনে করা।

দারিকপাদ ৩৪নং চর্যায় লিখেছেন—

কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তো রে ঝাণবখানে

অর্থাৎ তন্ত্রে মন্ত্রে ধ্যানে ব্যাখ্যানে কিছুই হবে না, ধর্মসাধনার এইসব পথই পরিত্যাজ্য। একদিকে দেহাভ্যন্তরের সহজ সত্যকে অনুভব করা, অন্যদিবে সহজকে দেহাতীত অস্তিত্ব অনস্তিত্বের ঊর্ধ্বে অবস্থিত সত্য বলে জ্ঞান— এর মধ্যে একটি আপাত অসংগতি আছে বলে মনে হয়। আমাদের আধুনিক যুক্তিবাদে একে অসংগতিপূর্ণ বলে মনে হলেও সেকালের সাধকেরা এই বিপরীত কোটিকে একটি আভ্যন্তর বোধে মিলিয়েছিলেন। আকাশচারী বৈদান্তিক বোধকে দেহের সীমায় বন্দী করেছিলেন। পণ্ডিতেরা একে বলেছেন ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে পূর্বভারতের, বিশেষ করে বাংলার এ এক অসাধারণ অবদান। এখানেই বাঙালীর ধর্ম ও জীবন সাধনার এক বিস্ময়কর ঐক্য।

সহজিয়া বৌদ্ধ সাধক পঞ্চ ইন্দ্রিয়াত্মক দেহকে সত্যের আধার বলে মনে করেন। তাই দেহভাণ্ডটিকে সুস্থ ও শক্তিশালী রাখা সাধকের এক অপরিহার্য কৃত্য বলে বারবার ব্যক্ত করেছেন। লুইপাদ দেহকে একটি তরুবর বলে উল্লেখ করেছেন—

কা আ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।

কৃষ্ণপাদ ১৩ নং চর্যায় লিখছেন —

পঞ্চ তথাগত কিঅ কেডুআল।
বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল।।

অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয়াত্মক দেহটি পাঁচটি দাঁড়ে বাহিত হওয়া নৌকাব মত। এই নৌকায় চড়ে কাহ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন এই বিশ্বরূপ মায়াপ্রপঞ্চকে।
সরহপাদ একটি দোহায় লিখলেন—

এত্থু সে সুরাসরি জমুণা
এত্থু সে গঙ্গা-সাঅরু।
এত্থু পআগ বণারসি
এত্থু সে চন্দ দিবা অরু।।
এত্থু পীঠ উপপীঠ
এত্ থু মঁ ভমই পরিট্ঠাও।
দেহ সরিসঅ তিত্থ
মইমঁ সুহা অণ্ণা ণ দিত্ঠাও।।

অর্থাৎ এখানে এই দেহের মধ্যেই রয়েছে সুরনদী গঙ্গা এবং যমুনা, এখানেই গঙ্গাসাগর, এখানে আছে প্রয়াগ এবং বারাণসী—এখানেই সূর্য এবং চন্দ্র। এখানেই রয়েছে সব পীঠ এবং উপপীঠ। আমি এরূপ কোন তীর্থ দেখিনি, আমার দেহের মত সুখদাত্রী আর কিছু পাইনি।

কায়াসাধন পদ্ধতি চর্যাপদের কবিরা নানা উপমা এবং রূপকের সাহায্যে বারংবার বিবৃত করেছেন। তাঁদের মূল দার্শনিক ধারণাকে এবং ধর্মীয় লক্ষ্যকে তাঁরা দেহের মধ্যে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন। হিন্দু তন্ত্র মানব দেহে ছটি চক্র অথবা পদ্ম এবং ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্না এই তিন নাড়ীর কল্পনা করে থাকে। অপরপক্ষে বৌদ্ধ সহজিয়ারা দেহমধ্যে চারটি 'কায়'-এর কল্পনা করেছেন।

১. নাভিমূলে নির্মাণকায়,
২. হৃদয়ে ধর্মকায়,
৩. কণ্ঠের নিম্নভাগে সম্ভোগকায়,
৪. মস্তিষ্কে সহজকায়।

সহজকায় মহাসুখকমল নামে পরিচিত। এইভাবে সহজের সঙ্গে মহাসুখের উপলব্ধিকে এক করে দেখা হয়েছে। এই সহজকে বা মহাসুখকে লাভ করাই বৌদ্ধ

সহজিয়া সাধকের সাধ্য বা চরম লক্ষ্য। নির্মাণকায় থেকে সহজকায় পর্যন্ত ক্রমিক সাধনমার্গে উন্নতি সূচিত। নির্মাণকায়ে সূচনা মৌল রূপান্তরের। সাধক সেখানে ধর্মপথগামী হচ্ছেন। ধর্মকায়ে আধ্যাত্মিক ঐক্যবোধ সূচিত। সম্ভোগকায়ে আনন্দের আস্বাদ লাভ এবং সহজকায়ে মহাসুখ প্রাপ্তি।

মানবদেহে তিনটি নাড়ীর কল্পনা কবা হয়েছে—নির্মাণকায় থেকে সহজকায় পর্যন্ত। দক্ষিণ দিকের নাড়ী উপায় নামে পরিচিত। হিন্দু তন্ত্রে একে বলা হয়েছে পিঙ্গলা, বৌদ্ধ সহজিয়ারা এই নাড়ীটিকে আরো নানা সাঙ্কেতিক নামে অভিহিত করেছেন—যেমন , রসনা, সূর্য, রবি, প্রাণ, চমন, কালি, বিন্দু, যমুনা, রক্ত, রজঃ, ভাব, পুরুষ, দাহ্য, ব্যঞ্জন। বামদিকেব নাড়ী যাকে হিন্দু তন্ত্রে বলা হয়েচে ঈড়া, বৌদ্ধ সহজিয়া তন্ত্র তার নাম দিয়েছে প্রজ্ঞা, এর অন্যান্য নাম—ললনা, চন্দ্র, শশী, অপান, ধমন, আলি, নাদ, গঙ্গা, শুক্র, তমস, অভাব, প্রকৃতি, গ্রাহক, স্বর। বাম ও দক্ষিণের এই দুই নাড়ী দ্বৈতবোধেব প্রতীক। তৃতীয় নাড়ী যা দেহের মধ্যভাগে অবস্থিত তাকে বৌদ্ধ সহজিয়াবা বলেছেন অবধূতিকা। হিন্দু যোগশাস্ত্রে তাকেই বলা হযেছে সুষুম্না। অবধূতিকা ঐক্যবোধেব প্রতীক।

বৌদ্ধ সহজিয়ারা একটি নারীশক্তির কথা বার বার বলেছেন। পূর্ববর্তী অবধূতিকা সেই নারী শক্তির প্রতীকও বটে। চর্যাপদের কবিতায় বারংবার শবরী, ডোম্বী, চণ্ডালী বলে যে নারীর উল্লেখ কবা হয়েছে, তার মধ্যেও ঐ একই নারী শক্তিব দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। এই নারীকে বাস্তব ডোম বা চণ্ডাল শ্রেণীর রমণী এবং সাধকদের উত্তরসাধিকা রূপে গণ্য না করার কথা কোন কোন পণ্ডিত বলেছেন। কিন্তু চর্যার সহজিয়া সাধনা যৌন সম্পর্ক নিরপেক্ষ একটি ভাবনা সর্বস্ব ব্যাপার মাত্র ছিল - এইরূপ চিন্তা বাস্তবতার পরিপন্থী। মানুষের ক্ষুধা তৃষ্ণার মত যৌনাচারকেও স্বাভাবিক দেহধর্ম জীবধর্ম বলেই বৌদ্ধ সহজিয়ারা মনে করেছেন। উত্তর সাধিকার সঙ্গে যৌনমিলনের মধ্য দিয়ে লৌকিক সুখভোগকে অলৌকিক মহারসের অভিমুখীন কবার কথাই তাঁরা ভেবেছিলেন এবং উত্তরসাধিকা হিসেবে ডোম্বী চণ্ডালী শবরী শ্রেণীর রমণীরা যে সর্বাধিক উপযুক্ত বলে গণ্য হত তন্ত্র শাস্ত্রে তার প্রমাণ আছে। আমাদের মনে হয় ঐ সব রমণীরা যেমন সাধকদের উত্তর সাধিকা তেমনি সাধকদের চৈতন্যের ক্ষেত্রে তারা দেহাভ্যন্তরস্থ অদ্বয়বোধের প্রতীক যে অবধূতিকা তারই প্রাকৃত রূপ।

চর্যাপদে বারংবার সাধক কবির সঙ্গে উত্তরসাধিকাদের মিলনের উজ্জ্বল চিত্র আছে। কখনো কখনো তা যেমন যৌনক্রীড়া, কখনো আবার তা অলংকৃত বর্ণনার সমন্বয়ে প্রণয় চিত্র হয়ে উঠেছে।

যোইনি তঁই বিণু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি।। (গুণ্ডরীপাদ)

অর্থাৎ যোগিনী তোমাকে ছাড়া আমি ক্ষণকাল বাঁচব না। তোমার মুখচুম্বন করে আমি পদ্মমধু পান করব ।

আলো ডোম্বী তোএ সম করিব ম সাঙ্গ। (কাহ্নপাদ)

অর্থাৎ ওহে ডোম্বী তোমার সঙ্গে আমি সঙ্গম করব অথবা তোমাকে আমি সাঙ্গা করব বা বিয়ে করব।

কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলিআ। (কাহ্নপাদ)

অর্থাৎ সাধক কাহ্ন ডোম্বীকে বিয়ে করতে চলল।

সবরো ভুজঙ্গ ণইরামণি দারী পেম্ম রাতি পোহাইলী।। (শবরপাদ)

অর্থাৎ ভুজঙ্গরূপী শবর নৈরাত্মরূপিনী নাগরীকে নিয়ে প্রেমে রাত্রি কাটাল।

কঙ্গুঁচিনা পাকেলা রে শবরা শবরি মাতেলা। (শবরপাদ)

অর্থাৎ কঙ্গুচিনা ধান পেকেছে। শবর শবরী প্রেমানন্দে মত্ত হয়েছে।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, যৌন মিলনের একটি ভূমিকা চর্যার কবিতায় আছে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার্য এর মধ্যে একটি প্রতীকী সাধনঘটিত ইঙ্গিতও আছে। সাধক কবির সঙ্গে ডোম্বীর বা শবরীর মিলন এবং দেহাভ্যন্তরস্থ অবধূতিকা মার্গে সাধকের বোধি চিত্তের সহজকায় পর্যন্ত অভিযান একই সূত্রে বাঁধা পড়েছে।

(৩) যোগসাধনা ঃ নির্মাণকায় থেকে মহাসুখচক্রে

এবারে আমরা প্রকৃত সাধন পদ্ধতির তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব। চর্যার সাধকেরা যোগপদ্ধতির অনুগামী ছিলেন। এবং তান্ত্রিক রীতিতেও বিশ্বাসী ছিলেন। দেহের মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাসের বায়ু নিয়ন্ত্রণ তাঁদের সাধনার অঙ্গ ছিল এবং উত্তর সাধিকাসহ যৌন সম্পর্ককে যৌনোত্তীর্ণ স্তরে নিয়ে যাবার কলাকৌশলও তাঁরা আয়ত্ত করেছিলেন। ঠিক কি ভাবে এই দুটি প্রক্রিয়া সাধিত হত তা সাধক ব্যতীত অন্যের পক্ষে স্পষ্ট করে বোঝা দুরূহ। চর্যার পদগুলির সাহায্যে আমরা তার তত্ত্বগত দিকটি মাত্র বুঝে নিতে পারি।

সর্ববিধ দ্বৈতবোধের অবসান ঘটানোর মধ্য দিয়ে—অর্থাৎ শূন্যতার এবং করুণার মিলন সাধনার ফলে সাধকের মানবসংসার-আশ্রয়ী চিত্ত বা মন বোধিচিত্তে রূপান্তরিত হয়। নির্মাণকায়ে এই রূপান্তর ঘটে। বোধিচিত্ত অদ্বৈতবোধের উপর স্থাপিত হলেও তার মধ্যে বিবিধ প্রকৃতিদোষ থেকে যায়। মর্ত্যের কামনা বাসনার বন্ধন কিছুতেই মোচিত হতে চায় না। প্রতিক্ষণ তারা বোধিচিত্তকে পার্থিব দ্বৈতবোধের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে। কাজেই বোধিচিত্ত

সৃষ্টি হবার পরেও সাধককে খুবই সতর্কভাবে অদ্বৈতবোধের দিকে এগুতে হয়। এই অদ্বয় বোধের পথটি হল অবধূতিকামার্গ। কাজেই সাধক বোধিচিত্তকে অবধূতিকামার্গ পথে দেহের ঊর্ধ্বদিকে নিয়ে যেতে চান। দেহের অভ্যন্তরস্থ দক্ষিণ বা বামদিকের নাড়ীগুলির পথ বোধিচিত্তের পথ নয়, তা দ্বৈতবোধের— ভ্রান্তির পথ। প্রকৃতি-দোষ দূর করতে করতে এবং দ্বৈতবোধজাত ভ্রান্তি অপসারিত করতে করতে বোধিচিত্ত অবধূতিকা মার্গ ধরে ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকে এবং নির্মাণকায় থেকে ধর্মকায় এবং ধর্মকায় থেকে সম্ভোগকায়ের মধ্য দিয়ে সহস্রারে বা মহাসুখচক্রে প্রবেশ করে। তখনই সাধকের সিদ্ধি, বা সহজপ্রাপ্তি অথবা মহাসুখরস পান।

আমরা আগেই বলেছি অবধূতিকা মার্গটিই হল কখনো কখনো নৈরাত্মদেবীর প্রতীক। কখনো ডোম্বী বা চণ্ডালীর প্রতীকে তাকে উপলব্ধি করা হয়েছে। বাস্তব সাধনায় সে আবার সাধকের উত্তরসাধিকাও বটে।

আমরা এবার কয়েকটি চর্যার সাহায্যে সাধনপদ্ধতির এই বিশিষ্টতাকে ব্যাখ্যা করব। চাটিলপাদের চর্যায় দ্বৈতবোধকে ঐক্যবদ্ধ করে মধ্যপন্থা অবধূতিকা মার্গ অনুসরণের উপদেশ দেওয়া হয়েছে—

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দু আন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী।।
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।
পারগামিলোঅ নিভর তরই।।

... ...

সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।
ণিয়ড্ডি বোহি দূর ম জাহী।।

অর্থাৎ একটি নদীর উপরে যাতায়াতের জন্য সাঁকো তৈরী করা হয়েছে। এই সাঁকো তৈরী এবং সাঁকোর উপর দিয়ে যাওয়া— এর রূপকেই সাধন তত্ত্বটি বলা হয়েছে। ভব অর্থাৎ এই প্রপঞ্চময় বিশ্ব গহন নদীর মত গম্ভীর শব্দ করে বেগে বয়ে চলেছে। তার দুপাশে কাদা আর মাঝখানে থৈ পাওয়া যায় না। দুপাশে কাদা বলতে কবি দ্বৈতবোধের ভ্রান্তিকে বুঝিয়েছেন। মধ্যখানের অথৈকে কবি মুক্তির মার্গ অবধূতিকার রূপক হিসেবে নিয়েছেন। যিনি ধর্মসাধনা করেন সেই চাটিলপাদ নদীর দুধারকে মেলালেন একটি সেতু তৈরী করে অর্থাৎ এইভাবে শূন্যতা ও করুণা অথবা প্রজ্ঞা এবং উপায় সমন্বিত হল। এই সাঁকোটি হয়ে দাঁড়ালো বোধিচিত্তের যাত্রাপথ। কিন্তু একবার এই মধ্যপথে চলতে শুরু করলেই যে সব ভয় কেটে গেল তা নয়। সাধক-কবি সতর্ক করে বলেছেন সাঁকোতে চড়ার পরেও কিন্তু সাবধান, ডাইনে কিংবা বাঁয়ে ঝুঁকো না অর্থাৎ

দ্বৈতবোধের মায়া পাশে এখনো জড়িয়ে পড়তে পার। আর যদি সতর্কভাবে সাঁকোর মধ্য দিয়ে চল তো বোধি অর্থাৎ সহজ তো কাছেই আছে।

কাহ্নপাদ একটি চর্যায় বলেছেন—

আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা।
তা দেখি কাহ্ন বিমন ভইলা।।

অর্থাৎ পথ বন্ধ করে রয়েছে আলি ও কালি—এই দ্বৈতবোধ। সাধক কাহ্নপাদ এই সত্য উপলব্ধি করলেন যে অবধূতিকা মার্গটি (বাট) আলিকালির দ্বৈতবোধে আটকে আছে। এই সত্য বুঝে সাধক বিগত মন হলেন। অর্থাৎ তাঁর প্রাকৃত চিত্তকে অপ্রাকৃত বোধিচিত্তে রূপান্তরিত করলেন। দ্বৈতবোধের অবসানেই বোধিচিত্তের উদ্ভব সাধকের নির্মাণকায়ে।

কম্বলাম্বরপাদের চর্যায় দেখা যাচ্ছে—তিনি করুণার নৌকোটি সোনা দিয়ে ভর্তি করলেন। ফলে তাতে রূপা রাখার আর জায়গা হল না।—

সোনে ভরিলী করুণা নাবী।
রূপা থোই নহিক ঠাবী।।

সোনা অর্থে শূন্যতা। সোনা দিয়ে করুণাব নৌকো ভর্তি করার মানেই হল শূন্যতা ও করুণার অদ্বয় সাধন। সেই অদ্বয় সাধন হলে বোধিচিত্তের জন্ম এবং এবং তখন আর রূপা রাখবার জায়গা মেলে না। অর্থাৎ রূপময় এই বিশ্ব বিলীন হয়ে যায়। এখন এই সোনা ভর্তি নৌকোটি অর্থাৎ বোধিচিত্তকে চালাতে হবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। কবির ভাষায়—বাহতু কামলি গঅণ উবেসেঁ,—অর্থাৎ হে সাধক কম্বলাম্ববপাদ, তুমি তোমার বোধিচিত্তরূপ নৌকোটিকে গগনের উদ্দেশ্যে বেয়ে চল—গগন, আকাশ, সহস্রার, মহাসুখচক্র—একই বোধ। কিন্তু এই যাত্রাপথে খুব সতর্কভাবে চলতে হবে। নৌকোর খুঁটি উপড়ে কাছি খুলে গুরুকে জিজ্ঞাসা করে বেয়ে চলতে হবে। গুরুর উপদেশ হল বৈঠার মত। বৈঠা না হলে নৌকো চলবে কিসে? খুঁটি কাছি এগুলি প্রকৃতি দোষের বন্ধনের প্রতীক। এইভাবে বেয়ে চলতে চলতে বাম দক্ষিণ কোন দিক না ঘেঁসে যেতে যেতে অর্থাৎ দ্বৈতবোধের মোহে না পড়ে অগ্রসব হলেই তবে মহাসুখের সঙ্গলাভ করবে সাধক—

বাম দাহির চাপী মিলি মিলি মাগা।
বাটত মিলিল মহাসুহ সঙ্গা।।

কাহ্নপাদের একটি চর্যায় ডোম্বীর সঙ্গে সাধক কবির প্রণয় মিলনের ছবি আঁকা হয়েছে। এটি একটি রূপক। কবি লিখেছেন—

নগর বাহিরে ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো ব্রাহ্মণ নাড়িআ।।

আলো ডোম্বী তোএ সম করিব ম সাঙ্গ।
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাগ।।
এক সো পদমা চৌসট্‌ঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।।

সরল অর্থ-নগরের বাইরে তোমার কুঁড়েঘর হে ডোম্বী। নেড়া ব্রাহ্মণ তা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। ওলো ডোম্বী, তোর সঙ্গে আমি সাঙ্গা করব। আমি নির্ঘৃণ কাপালি উলঙ্গযোগী কাহ্নপাদ। একটি পদ্ম তার চৌষট্টি পাপড়ি। তার উপরে চড়ে ডোম্বী এবং বাপুড়ী অর্থাৎ সাধক কবি নৃত্য করবে। গূঢ় অর্থ-নগর অর্থাৎ স্বীকৃত অভিজাত মান্য ধর্মপথ—তার মধ্যে নৈরাত্মা স্বরূপ ডোম্বীর স্থান নেই। সে থাকে নগরের বাইরে ছোট কুঁড়েতে। ব্রাহ্মণেরা যতই পুজো অর্চনা করুক তাদের ভ্রান্ত সাধনপথে একে দূর থেকে স্পর্শ করার চেষ্টা থাকে, পাবার সম্ভাবনা থাকে না। কাহ্নপাদ যোগী ও কাপালিক। প্রচলিত রীতির সাধক নন। তিনি নগ্ন। এই পরিচিত বিশ্বের বসন ভূষণ অর্থাৎ ভোগবাসনা বিরহিত। তিনি নির্ঘৃণ অর্থাৎ বিশ্বব্যাপারে তাঁর আসক্তি নিরাসক্তি প্রীতি বিরক্তি কিছুই নেই। ফলে কাহ্নপাদের সঙ্গে নৈরাত্মা রূপিণী ডোম্বীর মিলন সম্ভব। এই মিলনটি ঘটেছে নির্মাণকায়ে। (চৌষট্টি পাপড়িযুক্ত একটি পদ্মের রূপকে নির্মাণকায়কে চিত্রিত করা হয়েছে)।
সেই নির্মাণ কায়ের উপরে বা মধ্যে ডোম্বী ও সাধক-কবির যে যুগ্ম নৃত্য তা হল বোধিচিত্তে উত্তরণের সানন্দ মুহূর্ত।

কাহ্নপাদ ১২ নং চর্যায় দাবাখেলার রূপকে প্রকৃতিদোষ জয় করে অদ্বয়বোধে পৌঁছবার কথাটি বলেছেন। ডোম্বীপাদ একটি চর্যায় বলেছেন—গঙ্গা যমুনার মধ্য একটি নৌকো বয়ে যাচ্ছে, তাতে চড়ে মাতঙ্গি যুবতী সকলকে লীলাভরে পারাপার করছে। গঙ্গা যমুনা এখানে দ্বৈতবোধের প্রতীক এবং মাতঙ্গি যুবতী বা প্রমত্ত যুবতী অবধূতিকামার্গ নির্দেশ করছে। এই চর্যায় বারবার দ্বৈতবোধ এড়িয়ে যাবার কথা বলা হয়েছে। চন্দ্র সূর্য বাম দক্ষিণ এই সব শব্দের দ্বারা দ্বৈতবোধ নির্দেশিত হয়েছে। চর্যায় শেষ তিনটি চরণ এইরূপ—

বাম দাহিণ দুই মাগ ন রেবই বাহ তু ছন্দা।।
কবড়ী না লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করেই।
জো রথে চড়িলা বাহবা না জাই কুলে কুল বড়ই।।

অবধূতিকা স্বরূপা পাটনী ডোম্বী বাম দক্ষিণ দুই দিক থেকে সতর্ক দূরত্বে থেকে স্বচ্ছন্দ গতিতে নৌকো অর্থাৎ বোধিচিত্তকে নিয়ে যায় লক্ষ্যের (সহজ সুখের) অভিমুখে। সে নৌকো পারাপার করবার জন্য কড়িবুড়ি কিছুই নেয় না অর্থাৎ অবধূতিকা সম্পূর্ণ নিবৃত্তি ভিত্তিক-সেখানে গ্রাহ্য গ্রাহক এই দ্বৈতভাব থাকতেই

পারে না। যে এই যাত্রার পথিক না হয় সে তীরে তীরে ঘুরে বেড়ায়, চূড়ান্ত সত্যকে পায় না।

মহিধর পাদের একটি কবিতায় বোধিচিত্তকে তুলনা করা হয়েছে বন্ধন মুক্ত হস্তির সঙ্গে। সে সমস্ত শিকল এবং থাম ছিঁড়ে এবং ভেঙে সব দ্বৈতবোধ ঘুলিয়ে দিয়ে পাপপুণ্য বোধকে ছিন্নভিন্ন করে শূন্য মার্গে অর্থাৎ মহাসুখচক্রে গিয়ে পৌঁছয়। এই মহাসুখ চক্রকে তুলনা করা হয়েছে টিলা পাহাড়ের উপরিস্থিত অবস্থানের সঙ্গে, সেখানে মহাসুখরস স্বরূপ উত্তপ্ত সূর্যকিরণে বোধিচিত্ত-গজেন্দ্র স্নান করতে থাকে। বাস্তবত তৎকালীন বঙ্গদেশের একটি ধরা পড়া বন্য হাতির মুক্তির আনন্দ এই চর্যায় রূপক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তাকে থামের সঙ্গে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। উন্মত্তের মত সে সমস্ত ছিন্ন করে ছুটল মুক্তির আনন্দে। সব কিছু এলোমেলো করে দিয়ে সে একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠল। আর উত্তপ্ত সূর্যকিরণে পরমানন্দে স্নান করতে লাগল। এখানে হাতি বোধিচিত্ত, থাম এবং শিকলের বন্ধন হল ভববন্ধন, দ্বৈতবোধের বন্ধন; পাহাড়ের চূড়া হল মহাসুখচক্র, উত্তপ্ত সূর্যকিরণে স্নান হল, মহাসুখরস পান। চর্যাটি এখানে উদ্ধৃত করা হল—

তিনিএঁ পাটে লাগেলি রে অণহ কসন ঘণ গাজই।
তা সুনি মার ভয়ঙ্কর রে বিসআ মণ্ডল স এল ভাজই।।
মাতেল চীঅ গঅন্দা ধাবই।
ণিরন্তর গঅণন্ত তুসেঁ ঘোলই।।
পাপপুণ্য বেণি তোড়িঅ সিকল মোড়িঅ খম্ভাঠাণা।
গঅণটাকলী লাগি রে চিত্তা পৈঠ ণিবাণা।।
মহারসপানে মাতেল রে তিহুঅণ সএল উএখী।
পঞ্চ বিষঅরে নায়ক রে বিপখ কোবী ণা দেখী।।
খররবি কিরণ সন্তাপে রে গঅণাঙ্গণে গই পইঠা।
ভণন্তি মহিত্তা মঁই এথু বুড়ন্তে কিম্পি ন দিঠা।।

তৃতীয় অধ্যায়
বাংলায় বৈষ্ণবধর্মের ক্রমবিকাশ এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের বৈচিত্র্য

এক
মুখবন্ধ

বাংলা সাহিত্যের যে ধারাটি তুর্ক বিজয়ের পূর্ব থেকে সূচিত হয়ে মধ্যযুগের সমাপ্তি পর্যন্ত প্রাধান্য নিয়ে বর্তমান থেকেছে, এমনকি আধুনিক কালেও নানাভাবে আপনার প্রভাব বিস্তার করে চলেছে তা হল বৈষ্ণব সাহিত্য। বাঙালীর বৈষ্ণব ধর্ম ঐতিহাসিকভাবে কতকগুলি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে এবং এর একাধিক শাখা সমান্তরাল ভাবে বঙ্গসমাজে অবস্থান করেছে। প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই সেইসব ধর্মাচরণের বহুমুখিতা এবং ক্রমবিকাশ সাহিত্যের মধ্যে ধরা পড়েছে। সপ্তদশ শতক থেকেই চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণবদের প্রভাবে বিবিধ লোকায়ত সাধকমণ্ডলী সংগঠিত হয়েছে। তাঁরা অনেকেই সহজপন্থী এবং গূঢ়াচারী। এঁদের অনেকেরই ধর্মাচরণের সঙ্গে সঙ্গীত রচনা এবং সঙ্গীত পরিবেশন সম্পৃক্ত। এইভাবে বৈষ্ণবধর্ম এবং বৈষ্ণব সাহিত্য অজস্র শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে বঙ্গদেশে অন্তত আটশ বছর, কিংবা আরো কিছু বেশী কাল ধরে রাজত্ব করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বঙ্গদেশ যেমন কৃষ্ণপূজক তেমনি কালীসাধক। বৈষ্ণব ও শাক্তে বিরোধ যেমন বাংলার ধর্মীয়-সামাজিক ইতিহাসের একটি মুখ্য উপাদান, তেমনি তাদের পারস্পরিক আভ্যন্তর প্রভাব এবং কোন কোন স্তরে সমন্বয়ও ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ। শাক্ত গোষ্ঠীগুলির এবং শাক্ত সাধনার অত্যধিক গুরুত্ব সত্ত্বেও বাংলা বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান্য কিছুমাত্র খর্ব হয়নি এটি একটি রহস্যময় ব্যাপার যা বাঙালীর মনোজগতের গভীরে আলোকসম্পাত করে।

দুই
বিষ্ণু থেকে কৃষ্ণে বিবর্তন

অতি প্রাচীনকাল থেকে আর্য সভ্যতার সঙ্গে যোগ এবং উত্তর ভারতের হিন্দু রাজাদের ও পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রভাবের ফলে বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্মের প্রচলন হয়। সর্বভারতীয় বৈষ্ণবধর্মের সংগঠনে বেদ উপনিষদ মহাভারত এবং অন্যান্য

পুরাণাদির ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর. জি. ভাণ্ডারকর তাঁর Vaisnavism Shaivism and other minor religious cults গ্রন্থে পৌরাণিক বৈষ্ণবধর্মের উৎপত্তি নির্ণয় করেছেন। এবং লৌকিক বৈষ্ণবধর্মের উৎসেরও নির্দেশ দিয়েছেন। সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে পুরাণাশ্রয়ী ধারা এবং লোকাশ্রয়ী ধারায় কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। বৈদিক গুরুড়বাহন বিষ্ণু একজন প্রধান দেবতা হলেও দেবরাজরূপে কিন্তু তখনও ইন্দ্রই পূজিত হতেন। বিষ্ণুর গরুড়বাহন হবার বিষয়টিকে পণ্ডিতেরা প্রাচীন সূর্যদেবতার বিষ্ণুদেবতায় রূপান্তরের ইঙ্গিতরূপে গ্রহণ করে থাকেন। কোন কোন বৈদিক সূক্তে সূর্যকে অগ্নিময় পক্ষী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বৈদিক বিষ্ণুদেবতাকে সূর্য-বিষ্ণুরূপে অভিহিত করা গবেষকদের মধ্যে মোটামুটি স্বীকৃত রীতি। উপনিষদের স্তরে 'নারায়ণ' অর্থাৎ নরের অয়ন বা আশ্রয়রূপে বিষ্ণুদেবতার এক নবরূপ প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। তিনি প্রাণী মাত্রের আশ্রয়স্বরূপ, সমস্ত বিশ্বজন্মের উৎস, প্রলয় পয়োধি জলে ভাসমান, তাঁর নাভিমূল থেকেই নবসৃষ্টির সূচনা। আবার তিনিই বিশ্বের চরম পরিণতি। এইভাবে বৈদিক স্তরের প্রকৃতিশক্তি (সূর্য) উপনিষদের স্তরে সৃষ্টিরহস্যভেদকারী আদি ও অন্তিম শক্তির সঙ্গে একীভূত হয়ে যান।

মহাভারতে এবং পরবর্তীকালে ভাগবত হরিবংশ প্রভৃতি পুরাণে কৃষ্ণ চরিত্রটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। মহাভারতে কৃষ্ণকে নায়ক বলেও কখনো কখনো মনে হয়। পুরাতত্ত্ববিদদের ধারণা অতি প্রাচীন ভারত ইতিহাসের নানা চূর্ণ অধ্যায় মহাভারতে কল্পনা কিংবদন্তীর সঙ্গে মিশে আছে। এরূপ মনে করার কারণ রয়েছে যে বসুদেব নামক ঐতিহাসিক ব্যক্তির পুত্র কৃষ্ণ মথুরায় এবং দ্বারকায়— আর্যাবর্তের দুই প্রান্তে রাজ্য স্থাপনই শুধু করেন নি, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে নিয়ন্ত্রণী ব্যক্তিরূপে অবস্থান করেছেন। এই ঐতিহাসিক কৃষ্ণ, 'বাসুদেব কৃষ্ণ' নামে যাঁর পরিচয় দেওয়া হয়ে থাকে, তিনি মহাভারত রচনাকালেই (ঘটনাকালে সম্ভবত নয়) দেবমহিমা লাভ করতে থাকেন। মহাভারতে দুর্যোধনাদি কৃষ্ণকে বুদ্ধিমান কূটকৌশলী ব্যক্তিরূপেই দেখেছেন, অন্যদিকে পাণ্ডবের মধ্যে কিন্তু কৃষ্ণের প্রতি আস্থার ভাবটা এতই বেশী যা মানবিক সম্পর্ক ছাপিয়ে ভক্তির কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছয়। মহাভারতের এক শ্রেষ্ঠ চরিত্র ভীষ্ম কৃষ্ণকে প্রায় ভগবান মনে করতেন এবং অন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বিদুর তাঁকে পুরোই ভগবান মনে করতেন, তবে নররূপী ভগবান অর্থাৎ ভগবানের অবতার। এখান থেকেই পুরাণগুলির অবতারতত্ত্ব বিকশিত।

এই তিনটি উপাদান যখন মিশ্রিত হতে থাকে তখন বৈদিক 'সূর্য-বিষ্ণু', ঔপনিষদিক 'নারায়ণ' এবং ঐতিহাসিক 'বাসুদেব কৃষ্ণ' বৈষ্ণব ধর্মচেতনার কেন্দ্র স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

মহাভারতের পরবর্তীকালে রচিত অনেকগুলি পুরাণে কৃষ্ণপ্রসঙ্গ আছে, সবগুলিতে নেই। হরিবংশ, শ্রীমদ্‌ভাগবত ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বামনপুরাণ, কূর্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ—এই পুরাণগুলিতে কৃষ্ণকে স্বয়ং বিষ্ণুর নরদেহধারী অবতাররূপে দেখানো হয়েছে এবং নানা কাহিনীর মাধ্যমে কৃষ্ণের মহিমা ও ভগবত্তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছে। বৈষ্ণবধর্ম ও বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসের আদি বীজ এখানে রয়েছে।

কিন্তু এদেশীয় বৈষ্ণবধর্মের পূর্ণ বিকাশে আর একটি বড় উপকরণ আছে। সেটি লোকায়ত কল্পনা ও ধর্মবোধের প্রভাবজাত। আভীর বা গোপজাতি পূজিত এক বনচারী লৌকিক দেবতা এই কৃষ্ণ। গাভীরক্ষণ ও শত্রুবিনাশ প্রভৃতি কার্যের সঙ্গে সঙ্গে তিনি গোপযুবতীদের সাথে প্রণয়লীলায়ও মত্ত হন। সেখানে বিবাহিত গোপরমণীরাও কৃষ্ণ প্রণয়ে বিগলিত। এই কৃষ্ণকল্পনায় তিনটি উপাদান এসে মিলেছে। স্তবকটি কিন্তু লোকায়ত।

১. গোপ সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক দেবতা এই কৃষ্ণ নিজেও একজন গোপালক।
২. লোকায়ত স্তরে তরুণ নবনারীর যে মুক্ত প্রেমের লীলা, যা সমাজবন্ধন অস্বীকার করে আত্মপ্রকাশ করে এবং বিবিধ লৌকিক ছড়ায় ও গানে প্রকাশ পায়, তারই কেন্দ্রস্বরূপ একটি গ্রামীণ তরুণের কল্পনাধৃত মূর্তিই কৃষ্ণ। প্রচলিত প্রাচীন ছড়া গানে কখনো কৃষ্ণ নামটি আছে, কখনো নেই। কিন্তু যে-ই এরূপ প্রণয়ের নায়ক সে-ই কৃষ্ণ। কৃষ্ণ যেন একটি কমন নাউন, প্রপার নাউন নয়।
৩. সামাজিক বিধিনিষেধ লঙ্‌ঘন করে একজনের প্রতি এই যে প্রেম এর মধ্যে লৌকিক স্তরের এক ধরনের ধর্মীয় ব্যাকুলতার রূপ অতি প্রাচীন কাল থেকেই উপলব্ধ হয়েছে। এর সদৃশ ইসলামী সূফীদের এবং প্রাচীন খৃষ্টীয় মিষ্টিকদের ভাবধারা।

আমরা দেখতে পাই বৈষ্ণবধর্মের কেন্দ্রীয় যে দেবতা সেই বিষ্ণু-কৃষ্ণের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে নানা যুগে নানা আনুপাতিক মিশ্রণের ফলে বিবিধ পরিবর্তন ঘটিয়েছে চারটি উপাদান— এক. সূর্য-বিষ্ণু, দুই. নারায়ণ, তিন. বাসুদেব-কৃষ্ণ, চার. গোপদেবতা তরুণ প্রেমিক কৃষ্ণ।

এর পরেও দীর্ঘ কাল একটি সমস্যা থেকে গিয়েছে মানুষের পূজা মন্দিরে স্থান পেয়েছেন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি। দীর্ঘকাল পুরাণে কাব্যে বিষ্ণু-কৃষ্ণের ঐক্য ঘোষিত হলেও, কৃষ্ণকে কেন্দ্রে রেখে বিবিধ কাহিনী কাব্য রচিত হলেও পূজা করা হয়েছে বিষ্ণুকে-মন্দিরে মন্ত্রে তাঁরই অবস্থান। কৃষ্ণপূজার প্রচলন হতে সম্ভবত একাদশ শতক থেকে শুরু করে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত যেসব

ভক্তিবাদী আন্দোলন ভারত জুড়ে দেখা দিয়েছিল তারজন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। কৃষ্ণকেন্দ্রিক যে বৈষ্ণবধর্ম আধুনিক কালে সর্বত্র প্রচারিত তারও নাম কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম, কৃষ্ণধর্ম নয়। মূর্তিকল্পনার দিক থেকে কৃষ্ণ-বিষ্ণুতে পার্থক্য অনেক। এখানো সে পার্থক্য থেকে গিয়েছে। দ্বিভুজ বংশীধারী কৃষ্ণ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণু বা নারায়ণের থেকে রূপে অবশ্যই স্বতন্ত্র। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বর্তমানে বঙ্গদেশীয় পুরোহিতেরা যে শালগ্রাম শিলা বা নারায়ণ শিলাটি সন্তর্পণে নিজগৃহে রক্ষা করেন, প্রয়োজনে যজমানের গৃহে বহন করে নিয়ে যান, সেটি অখণ্ডমণ্ডলাকারং — তাঁর কোন রূপ নেই। গোলাকার কৃষ্ণ প্রস্তরখণ্ডটি রূপহীন অনন্তের ভাব ব্যঞ্জিত করে। এটি ঔপনিষদিক নারায়ণ তত্ত্বের প্রতীকতার দিকে ইঙ্গিত করে।

তিন
তুর্কবিজয় পূর্ববর্তী বৈষ্ণবধর্ম

বঙ্গদেশে প্রাচীনকাল থেকে বৈষ্ণবধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও জীবনাচরণ ছিল। প্রকৃতপক্ষে বৈদিক ধর্ম-সংস্কৃতির তুলনায় পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব ছিল অনেক বেশী। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকেই চক্রস্বামী বিষ্ণুর প্রতি শ্রদ্ধা রাজা চন্দ্রবর্মার লিপিতে পাওয়া গিয়েছে। পরবর্তী শতকে উত্তরবঙ্গে গোবিন্দস্বামী ও শ্বেত বরাহস্বামী বিষ্ণুর মন্দির প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাওযা গিয়াছে। ক্রমে যতই দিন যাচ্ছিল বিষ্ণু মন্দিরের এবং বিষ্ণুপূজার প্রচলন ব্যাপকতর হচ্ছিল। বিভিন্ন প্রাচীন লিপিতে পৌরাণিক বিষ্ণুর রূপ ও ধ্যান যেমন পাওয়া গিয়েছে তেমনিই বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বৈষ্ণব প্রতিমারও নিদর্শন মিলেছে। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগের অনেকগুলি বিষ্ণুমূর্তির উল্লেখ করেছেন। প্রস্তর এবং পোড়ামাটির ফলকে এই মূর্তিগুলি উৎকীর্ণ এবং বঙ্গদেশের প্রায় সব অঞ্চল থেকেই এগুলি সংগৃহীত। তাঁর অভিমত—

> এই প্রতিমাগুলির রূপকল্পনা ও লক্ষণ আলোচনা করলে স্পষ্টই বুঝা যায়, পৌরাণিক বিষ্ণু তাঁহার নিজস্ব মর্যাদায় এবং সপরিবারে, সমস্ত লক্ষণ ও লাঞ্ছন লইয়া বাংলাদেশে আসিয়া আসন লাভ করিয়া গিয়াছেন গুপ্ত পর্বেই।

আমরা পূর্বে চারটি স্বতন্ত্র উৎস থেকে আগত কৃষ্ণ-বিষ্ণু ধারণার সমন্বয়ে জাত যে বৈষ্ণবী বিশ্বাসের কথা বলেছি তাই ভাগবত ধর্মরূপে পরিচিত ছিল। গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বে বাংলাদেশে তা প্রচার লাভ করে এবং পাল পর্বে তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

অধ্যাপক নীহররঞ্জন রায় এই রূপ অনুমানও করেন যে কৃষ্ণ ও রামকেন্দ্রিক

বৈষ্ণব ধর্মাশ্রয়ী নানা কাহিনী যেগুলি পরবর্তীকালে রামায়ণ ও ভাগবতে পাওয়া যায় তার কতকটা প্রচার ও প্রসার গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে বঙ্গদেশেই ঘটেছিল। পাহাড়পুর মন্দিরের পোড়ামাটির ও পাথরের ফলকগুলিতে এর নিদর্শন আছে।

বৈষ্ণবধর্মের প্রসার বঙ্গদেশে ব্যাপকতর হতে থাকে। পাল-চন্দ্র-কম্বোজ রাজাদের শাসনকালে সারা বঙ্গদেশে বহু সংখ্যাক বিষ্ণুমূর্তি নানা রূপ এবং ভঙ্গিতে পাওয়া গিয়েছে। অন্য দেবদেবীর তুলনায় এই মূর্তিগুলির সংখ্যা অনেক বেশী। সর্বভারতীয় রীতির অনুসরণ এইসব মূর্তিতে লক্ষ্য করা যায়।

পরবর্তী সেন-বর্মণ যুগে বিষ্ণু পূজার প্রসার হয়েছে মনে হয়। ক্বচিৎ তার মধ্যে বৌদ্ধ মহাযানী মূর্তিকল্পনার প্রভাব পড়েছিল। সমকালীন কাব্য কবিতায় তাই বিষ্ণুভক্তি বারংবার এসেছে। বিষ্ণুর অবতার বিষয়ক ধারণা নানাভাবে পরিপুষ্ট হয়ে সাহিত্যে এবং মূর্তিতে প্রকাশিত হয়েছে এবং এই সময় থেকে কৃষ্ণ প্রেয়সী রাধাও বৈষ্ণব কল্পনাতে কিছু স্থান করে নিচ্ছে অন্তত কাব্যদির ক্ষেত্রে তো বটেই।

তুর্ক বিজয় পূর্ববর্তী বঙ্গদেশের বৈষ্ণব ধর্মের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে গেলে বলতে হয়—

১. সর্বভারতীয় বিষ্ণু কল্পনা বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্মাচরণের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত।

২. গুপ্ত যুগ থেকে সেনযুগ পর্যন্ত এই বিষ্ণুপূজার ক্রমিক প্রসার ঘটেছে।

৩. খুবই কৌতূহলোদ্দীপক যে মহাযানী বৌদ্ধ মূর্তি কল্পনার প্রভাব বিষ্ণু মূর্তির উপরে ক্বচিৎ পড়েছে।

৪. বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপকতার পাশে অন্যান্য পৌরাণিক ধর্মের যেমন শৈব, সৌর প্রভৃতির গুরুত্বও উপেক্ষণীয় ছিল না। পুরাণ ও তন্ত্রকেন্দ্রিক শাক্তধর্মেরও প্রভাব ছিল। সে কথা অন্যত্র আলোচ্য।

৫. বহু অবতারে অবতীর্ণ বিষ্ণুর ঐশ্বর্যময় রূপ কল্পনার প্রধান্য সত্ত্বেও লক্ষ্মী নারায়ণের প্রতি, কখনো কখনো লক্ষ্মী ও সরস্বতী সহ নারায়ণের প্রতি বাঙালীর ভাবালু আকর্ষণের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে।

৬. কৃষ্ণ অবশ্যই ভাগবত ধর্মের এবং ভাগবত পুরাণের ভগবান। কিন্তু এই পর্ব পর্যন্ত তাঁর পূজার্চনার কোন নিদর্শন নেই। পুরাণ এবং নানা সাহিত্যে তাঁর অবস্থান। কৃষ্ণের প্রণয়ী রূপের কথাও কাব্য কবিতায় বেশ পাওয়া যাচ্ছে। কোথাও কোথাও কৃষ্ণ রাধার উল্লেখও রয়েছে। সেই কৃষ্ণ যে ভগবান এমন বিশ্বাসও ব্যক্ত হচ্ছে। কিন্তু কৃষ্ণরূপে বিষ্ণু পূজকের পুজো পাচ্ছেন এ রকম নিদর্শন নেই। রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী বটে কিন্তু দেবমণ্ডলীতে তাঁর স্থান নিয়ে কোন ভাবনা প্রকাশ পায় নি।

চার
তুর্কবিজয়-পূর্ব

আমরা তুর্ক বিজয় পূর্বে বাঙালীর লেখা সাহিত্যের বিচার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সেখানে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিফলন কতটা কি ভাবে ঘটেছিল এবারে তা লক্ষ্য করব। এই সময়ে অবশ্য বাংলা ভাষায় কোন বৈষ্ণব সাহিত্য রচিত হয়নি। কিন্তু জয়দেব প্রমুখ কবিদের রচনায় এবং 'সদুক্তিকর্ণামৃত' ও 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' শীর্ষক সঙ্কলন গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষায় বাঙালী কবিরা যেসব কবিতা লিখেছেন তার পরিচয় খুবই প্রাসঙ্গিক। পণ্ডিতদের মতে কৃষ্ণ-রাধিকার কাহিনী কোন না কোন সাহিত্যরূপ আশ্রয় করে প্রাগজ্যোতিষ, কামরূপ বা বঙ্গদেশে তুর্ক বিজয়ের পূর্বেই প্রসার লাভ করেছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়' 'সদুক্তিকর্ণামৃতের' কথা।

'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়' আদি বঙ্গাক্ষরে লেখা একটি কবিতা সঙ্কলন গ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে নেপালে। অক্ষর দেখে পণ্ডিতেরা এর সময় নির্ণয় করেছেন দশম শতক। সঙ্কলন কে করেছিলেন তাঁর নাম জানা যায় নি। বইটিতে ১১১ জন কবির লেখা মোট ৫২৫ টি শ্লোক আছে। এই ১১১ জন কবির মধ্যে সর্বভারতীয় কালিদাস, অমরু, ভবভূতি যেমন আছেন তেমনি এমন অনেকে আছেন যাঁদের নাম দেখে বাঙালী বলে মনে হয়। যেমন গৌড়-অভিনন্দ, ধর্মকর, বুদ্ধাকর গুপ্ত, মধুশীল, বিনয়দেব, বীর্যমিত্র, শুভঙ্কর, শ্রীধরনন্দী, রতি পাল প্রভৃতি কবিরা বাঙালী ছিলেন বলেই মনে হয়। এই বিকীর্ণ শ্লোকগুলির মধ্যে বহু সংখ্যাক পদ ব্রজলীলা মূলক। ব্রজলীলার এ জাতীয় চিত্র 'গীত গোবিন্দের' আগে কোথাও দেখা যায় না। সমালোচকদের অভিমত এই যে, এই জাতীয় ছোট ছোট সরস কবিতার দিকে বাঙালী কবি এবং পাঠকদের একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। মহাকাব্য বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ তাদের ততটা বশীভূত করতে পারেনি। নিদর্শন হিসেবে 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়' থেকে দুটি শ্লোক উদ্ধার করা হচ্ছে—

১. ময়ান্বিষ্টো ধূর্তঃ স সখি নিখিলামেব রজনীম্
ইহ স্যাদত্র স্যাদিতি নিপুণমন্যাভিসৃতঃ।
ন দৃষ্টো ভাণ্ডীরে তটভুবি ন গোবর্ধনগিরে
র্ন কালিন্দ্যাঃ (কূলে) ন চ নিচুলকুঞ্জে মুররিপুঃ।।

অর্থাৎ সখি, আমি সারারাত ধরে সেই ধূর্তের অন্বেষণ করেছি — এখানে থাকতে পারে ওখানে থাকতে পারে এইভাবে। নিশ্চয় সে অন্য গোপীর কাছে অভিসার করেছে। মুররিপুকে (কৃষ্ণকে) আমি ভাণ্ডিরতলে দেখিনি, গোবর্ধনগিরি তটভূমিতে দেখিনি, কালিন্দী কুলে দেখিনি, বেতসকুঞ্জেও দেখিনি।

২. ধেনুদুগ্ধকলশানাদায় গোপ্যো গৃহং
দুগ্ধে বষ্কয়িণীকুলে পুনরিয়ং রাধা শনৈর্যাস্যতি।
ইত্যন্যব্যপদেশগুপ্তহৃদয়ং কুর্বন বিবিক্তং ব্রজং
দেবঃ কারণনন্দসূনুর শিবং কৃষ্ণঃ স মুষ্ণাতু বঃ।।

অর্থাৎ গোদুগ্ধের কলস নিয়ে গোপীগণ গৃহে যাও, যে গরুগুলি এখনো দোওয়া হয় নি সেগুলি দোয়া হলে রাধাও তোমাদের পরে যাবে। অন্য উদ্দেশ্য হৃদয়ে গুপ্ত রেখে এরূপে যিনি ব্রজ নির্জন করছেন সেই নন্দপুত্ররূপে অবতীর্ণ দেবতা তোমাদের সব অমঙ্গল হরণ করুন।

এই কাব্য সঙ্কলনে চারটি পদে রাধা কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ উল্লেখ আছে। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে' গ্রন্থে বলেছেন—

"এই পদগুলিতে যে শুধু রাধার উল্লেখ রহিয়াছে তাহা নহে, একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, ইহার ভিতরে ভাব, রস, ও প্রকাশভঙ্গি সমস্ত দিক হইতেই পরবর্তী কালের বৈষ্ণব কবিতার সকল বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।"

দ্বাদশ শতকের সমাপ্তিতে শ্রীধর দাস সঙ্কলন করেন 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামক গ্রন্থ। ৪৮৫ জন কবির মোট ২৩৭০ টি কবিতা এই সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে। অধিকাংশ কবিই সঙ্কলয়িতার সময়কার বা কিছু আগের গৌড়বঙ্গের কবি, যেমন রাজা লক্ষ্মণসেন, কেশবসেন, জয়দেব, গোবর্ধনাচার্য, ধোয়ী, ইন্দ্রজ্যোতি, কমলগুপ্ত, রবিগুপ্ত, যজ্ঞঘোষ, কঙ্কদত্ত , দিবাকরদত্ত, প্রভাকরদত্ত, ভগীরথদত্ত, তথাগতদাস, ইন্দ্রদেব, বসন্তদেব, জয়নন্দী, শ্রীধরনন্দী, বীরনাথ, গদাধরনাথ, ত্রিপুরারিপাল, ঈশ্বরভদ্র, বসুসেন প্রভৃতি। 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' সঙ্কলিত বৈষ্ণব কবিতাগুলিতে শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য এবং মধুর— সব রসের কবিতাই পাওয়া যায়। বিশেষ ভাবে মধুর রসের দুটি কবিতা উদ্ধৃত করছি—

কবি অভিনন্দের লেখা একটি কবিতায় দেখা যাচ্ছে নবযৌবনে উপনীত কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে নর্ম লীলায় লুব্ধচিত্ত হলেও মাতা যশোদার ভয়ে ভীত হয়ে যমুনাকূলে অতি নির্জন লতাগৃহে প্রবশে করছেন—

রাধায়ামনুবদ্ধ নর্মনিভৃতাকারং যশোদাভয়া
দভ্যেশেষ্বতিনির্জনেষু যমুনারোধোলতাবেশ্মসু।

আচার্য গোপীক রচিত একটি পদে কৃষ্ণ-অভিসারের একটু বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে—

গভীর রাত্রে কৃষ্ণ রাধার গৃহের কাছে এসে কোকিলের ডাকের মত শব্দ করে রাধাকে সঙ্কেত জানাচ্ছেন, সঙ্কেত শুনে রাধা বাইরে আসছিলেন, বহির্গমনোন্মুখ রাধার শঙ্খবলয় ও মেখলাধ্বনি কৃষ্ণ শুনতে পাচ্ছেন। এদিকে বৃদ্ধা কে কে বলে

চিৎকার করছে, তাতে কৃষ্ণের হৃদয় ব্যথিত হচ্ছে। এই অবস্থায় সেই রাত্রি রাধার গৃহপ্রাঙ্গণে যে কেলিবিটপ তার ক্রোড়ে কৃষ্ণের সারারাত্রি গত হল।—

সঙ্কেতীকৃত কোকিলাদিনিনদং কংসদ্বিষঃ কুর্বতো
দ্বারোন্মোচনলোলশঙ্খবলয়শ্রেণিস্বনং শৃন্বতঃ।
কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্ভজরতীনাদেন দুনাত্মনো
রাধাপ্রাঙ্গণকোণকেলিবিটপিক্রোড়ে গতা শর্বরী।।

এই দুটি সঙ্কলনগ্রন্থে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক প্রণয়কবিতার পাশাপাশি এমন অনেক প্রণয় কবিতা আছে যা একান্তভাবেই লৌকিক। আপাতদৃষ্টিতে বর্ণনায় ভাবে কবিরা এই দুই শ্রেণীর প্রণয়কবিতার মধ্যে কোন পার্থক্য রাখেননি, কিন্তু কৃষ্ণের ভগবত্তা সম্পর্কেও কোন কবিরই যে সন্দেহ ছিল না তার নিদর্শন রচনাগুলির মধ্যেই রয়েছে। স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু কিংবা হরি নরবপুতে কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত এই বিশ্বাস যে সব কবিদেরই ছিল তার নিদর্শন প্রতিক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে। তিনি কংস-বিনাশী এবং তিনি মুরারি-কবিতার মধ্যেই এরূপ উল্লেখ দেখা যাচ্ছে। বহু শ্লোকে কৃষ্ণের কাছে কবিরা মঙ্গল বা দাক্ষিণ্য কামনা করছেন এবং দেখা যাচ্ছে ভাগবত পুরাণ প্রচলিত ধর্মবোধে কবিদের যে আস্থা ছিল একথা অপ্রকট থাকেনি। নরবপু ধারণ করে ভগবান কৃষ্ণ ব্রজধামে আবির্ভূত হয়েছেন। নন্দ যশোদার সঙ্গে বাৎসল্য লীলা এবং গোপীদের ও রাধিকার সঙ্গে মধুর লীলা প্রকট করেছেন, যেমন ভাগবতের দশম একাদশ স্কন্ধে পাওয়া যায়। কবিদের চোখে তাই এই কৃষ্ণ প্রণয় লীলাত্মক কবিতাগুলি ভাগবত প্রণয় রসাস্বাদের কবিতাও বটে।

জয়দেব গোস্বামী 'গীতগোবিন্দ' কাব্যটিতে প্রায় মুখবন্ধস্বরূপ একটি কথা বলেছেন—

যদি হরি স্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুর কোমলাকান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্।।

অর্থাৎ যদি হরি স্মরণে মনকে সরস করতে চাও এবং যদি বিলাসকলায় কৌতূহল থাকে তাহলে জয়দেব ভারতীর মধুর কোমলকান্ত পদাবলী শোন। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' অনেক সমালোচকই আদিরসের বাড়াবাড়ি দেখেছেন। তাঁদের অনেকেরই মনে হয়েছে হরিস্মরণ ব্যাপারটি এখানে গৌণ, বিলাসকলা কুতূহলটাই প্রধান। তাঁরা কিন্তু একটি কথা মনে রাখেন না যে নরবপুধারী ভগবান কৃষ্ণের প্রণয়লীলার বর্ণনাই কবি করেছেন। ভগবান নরবপুধারী-কাজেই তাঁর প্রণয় প্রবৃত্তি মানবীরীতি-আশ্রয়ী। তিনি ভগবততত্ত্বের গ্রন্থ রচনা করেননি। প্রণয়কাব্য রচনা

করেছেন। যেমন ভাগবত পুরাণের কবি ভগবান কৃষ্ণের বীর্যবত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে মানবসুলভ বীররসকেই প্রাধান্য দিয়েছেন ঠিক সেরকম। আমরা যদি কৃষ্ণের কংস, শিশুপালবধকে ভগবানের নরলীলার অংশ বলে গ্রহণ করি তাহলে তাঁর রাধাপ্রণয়ের বর্ণনাও ভগবানের নরলীলারই অংশ। জয়দেবের সমকালীন পাঠকরা কিন্তু এই কাব্যে বিলাসকলার প্রাধান্য সত্ত্বেও হরিস্মরণের পুণ্য লাভের উপাদানও সমানভাবে পেয়েছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য জয়দেবের বিখ্যাত দশাবতার স্তোত্র এই সুদীর্ঘ আট ন'শ বছর ধরে পূর্বভারতের কৃষ্ণ ভক্ত অগণিত মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। ধর্মবোধ ও ভক্তি বিশ্বাসের আকর হিসেবে এটির গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। জয়দেব কিন্তু সেই অবতারের তালিকায় কৃষ্ণকে রাখেননি। কিন্তু বলেছেন কৃষ্ণলীলা পাঠ মানেই হরিস্মরণে মনকে সরস করা। জয়দেব কি কৃষ্ণকে ভগবান বিষ্ণু বা নারায়ণের অবতাররূপে মনে করেননি — নরবপুধারী হরিই স্বয়ং কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান অবতারমাত্র নন — এই কি তাঁর বিশ্বাস ছিল?

অনেকেই অনুমান করেন যে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' নৃত্যগীতসহ পরিবেশিত হত। খুব সম্ভবত বৈষ্ণব ধর্মাশ্রয়ী পূজার্চনায় এবং বিষ্ণুদেবতার মন্দিরসংলগ্ন নাটকেন্দ্রে এটি উপস্থাপিত হত। ওড়িশায় জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' অবলম্বন করেই ক্লাসিক ওড়িশী নৃত্যের প্রচলন, ওড়িশী নৃত্যের বিশেষজ্ঞরা অনেকেই এরূপ মনে করেন। আধুনিক ওড়িশী নৃত্যের নবজন্ম সাম্প্রতিক কালে ঘটলেও, এর অতি প্রাচীন লুপ্ত ধারার নানা ইঙ্গিত তাঁরা আবিষ্কার করেছেন। এই নৃত্যাভিনয়টি একটি ধর্মাশ্রয়ী অনুষ্ঠান তো বটেই, প্রতীক হিসেবে জগন্নাথ সুভদ্রা বলরামের প্রতিকৃতি সামনে রেখে আজও এই নৃত্যরূপটি পরিবেশিত হয়ে থাকে। বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যে ধর্ম প্রণয়ের মর্মে প্রবেশ করে বহু ক্ষেত্রে কবিতার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে গেছে। কতটুকু ধর্ম কতটুকু মানবী প্রণয় তার ব্যবধান কবিরা রাখতে চান নি। তাঁদের নিজস্ব ধর্মশাস্ত্র এই তাঁদের শিখিয়েছে — ভগবান যখন মানবলীলা কবেন তখন তিনি মানবের মতই লীলা করেন। বাঙালী এই মন্ত্রেই ধর্মকে ও জীবনকে মধ্যযুগে এক সূত্রে গেঁথে নিয়েছিল।

চতুর্দশ শতকের শেষদিকে অবহট্ট-অপভ্রংশ ভাষায় প্রাকৃত-পৈঙ্গল নামে গীতি কবিতার একটি সঙ্কলন রচিত হয়। গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত। তিনি প্রাকৃত ছন্দের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে একাদশ থেকে চতুর্দশ শতকে লেখা অনেকগুলি ছোট ছোট কবিতা সংগ্রহ করেন। পণ্ডিতেরা মনে করেন, এই বইটির মধ্যে তুর্ক বিজয় পূর্বেকার বঙ্গদেশের চিত্তবৃত্তি, ভাবপরিবেশ ও প্রকৃতির নানা বর্ণনা আছে। এই গ্রন্থে কৃষ্ণের প্রণয়লীলা বিষয়ক যে সব কবিতা আছে সে সম্পর্কে ডঃ শশিভূষণ

দাশগুপ্তের মন্তব্য উদ্ধৃত করা হচ্ছে—

> একটি প্রাকৃত শ্লোকে কৃষ্ণ কর্তৃক 'রাধামুখ-মধুপান' করিবার কথা দেখিতে পাই।
>
> চাণূর বিহংডিঅ নিঅকুল মংডিঅ
> রাহা মুহ মহু পাণ করে জিমি ভমর রবে
>
> অপর একটি শ্লোকে রাধার স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও ইহা নৌকা বিলাস লীলায় রাধার উক্তি বলিয়াই মনে হয়। সেখানে বলা হইয়াছে,—"ওহে কৃষ্ণ, নাও বাও- চঞ্চল ডগমগির কুগতি আমাকে দিও না। তুমি এই নদীতে পাড়ি দাও, তারপরে তুমি যাহা চাও তাহা নাও।"

এখানে অবশ্য প্রত্যক্ষত কোন ধর্মভাবের অভিব্যক্তি নেই। তবে কৃষ্ণের প্রণয়লীলা বাংলা সাহিত্য জগতে কতদূর বিস্তৃত ছিল তার নিদর্শন হিসেবেই এর উল্লেখ করা হল।

তুর্কবিজয় পূর্ববর্তী বৈষ্ণব ধর্মাচরণ এবং কৃষ্ণভিত্তিক সাহিত্যে এই প্রতিফলনের পটভূমিতেই তুর্কবিজয় পরবর্তী বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্যের ক্রম বিকাশের দিকে আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হবে।

পাঁচ

তুর্ক বিজয়ের ফল : বাংলার ধর্মে ও সমাজে

মুসলমান বিজয়ের ফলে বাংলার রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা এবং ধর্মীয় অবস্থার ক্ষেত্রে গুরুতর পরিবর্তন দেখা দিল, সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা বলেন একটি যুগান্তর সূচিত হল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্বতন হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজাদের আমলে বঙ্গদেশের যে অবস্থা ছিল তাতে কোন মৌলিক পরিবর্তন আসে নি, কিন্তু সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটেছে তার মধ্যদিয়ে বাঙালী জাতি একটি জাতীয় চরিত্র লাভ করেছে। আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালীর ধর্ম ও ধর্ম সংশ্লিষ্ট সমাজ ব্যাপারে যেসব পরিবর্তন দেখা দিল, এখানে তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করছি।

১. বিদেশাগত একটি ধর্ম বঙ্গদেশে প্রবেশ করল। মুসলমানেরা যে দেশের শাসক হয়ে বসল শুধু তাই নয় জনসাধারণের মধ্যেও এই ধর্মের ফলে নানাবিধ প্রতিক্রিয়া সূচিত হল।

   ধর্মান্তর গ্রহণের ফলে বাঙালী মুসলমানের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে লাগল। নিম্নবর্ণের বৌদ্ধেরা, হিন্দুর পশ্চাৎপদ শ্রেণীগুলির মধ্যে ধর্মান্তর

গ্রহণের পরিমাণ কিছু বেশী ছিল। ভয়ে এবং লোভে উচ্চবর্ণের মধ্যেও কিছু মানুষ ধর্মান্তরিত হয়েছে। নব ধর্মের আকর্ষণেও কতক লোক ইসলাম বরণ করেছে। পীর ফকিরদের প্রচারের ফলে সুদূর গ্রামাঞ্চলে ইসলামের প্রসার ঘটেছে। ধর্ম প্রসারের জন্য কোথাও বল প্রয়োগ করা হয়নি এমন কথা বলা যায় না। নিম্নবঙ্গের নানা লৌকিক সাহিত্যে তার নিদর্শন আছে। পাশাপাশি ধর্মীয় ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান সমন্বয়ের নিদর্শনও পাওয়া যাচ্ছে।

২. হিন্দু ধর্মের প্রধানেরা এতকাল বিশুদ্ধি এবং কৌলিন্যের মহিমা যে ভাবে প্রচার করতেন এবার তার পাশে কিছু নতুন প্রক্রিয়া দেখা দিল। দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা যাঁদের হাতে এবং যাঁরা নব্যধর্ম প্রচারে প্রচণ্ড উৎসাহী ও উদ্যোগী তাঁদের সামনে সনাতন হিন্দুধর্মকে রক্ষা করবার একটা নতুন দায়িত্ব সমাজ প্রধানদের উপরে বর্তাল। শুধুমাত্র উচ্চমার্গের বর্ণ হিন্দুরা বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষকে দূরে রেখে হিন্দু ধর্মের গণ্ডিতে নিরাপদ থাকবে এরূপ আশা দূরাশায় পরিণত হল। জনসাধারণের মধ্যে হিন্দুর পৌরাণিক ধর্মের আদর্শ ও ব্রাহ্মণ্য আচার আচরণের প্রভাব ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা হতে লাগল। গোপাল হালদারের মত কোন কোন সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিত একে ধর্মীয়-সামাজিক প্রতিরোধমূলক প্রক্রিয়া বলে বর্ণনা করেছেন। এই প্রতিরোধের ফলে বাঙালী জাতির উচ্চ ও নিম্নবর্গ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও কাছাকাছি একটা পরিধির মধ্যে এল। বৈদিক-ব্রাহ্মণ্য-স্মার্ত-পৌরাণিক ধর্মসংস্কৃতির সঙ্গে, অবৈদিক-অব্রাহ্মণ্য-অস্মার্ত-অপৌরাণিক ধর্ম সংস্কৃতির একটা মিশ্রণ ঘটতে লাগল। ডঃ সুকুমার সেনের মতে বাঙালীর পূর্বোক্ত দুটি ধর্ম সংস্কৃতির ধারা এতকাল পাশাপাশি প্রায় সমান্তরাল প্রবাহিত হচ্ছিল। পারস্পরিক মিশ্রণের যে সুত্রগুলি কার্যকর ছিল তা অত্যন্ত ধীরগতিসম্পন্ন। তুর্ক বিজয়ের বৈদ্যুতি যেন এই হাইড্রোজেন অক্সিজেনের মধ্যে রাসায়নিক মিলন ঘটিয়ে বাঙালী জাতিরূপ জলবিন্দু সৃষ্টি করল। মধ্যযুগের ধর্মসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এর ফল কিভাবে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিভিন্ন ধর্মের প্রসঙ্গে আমদের তা আলোচনা করতে হবে। বর্তমানে শুধু বৈষ্ণব ধর্ম প্রসঙ্গে তার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করব।

৩. ভাগবতের কৃষ্ণ ঐশ্বর্যময় মহান পৌরাণিক পুরুষ, বিষ্ণুর নরদেহে প্রকটন। বিভিন্ন পুরাণে তাঁর মহিমার কথা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। এগুলি কিছু ভারতে মুসলমান আগমনের পরে রচিত হয়েছে এবং প্রাচীন পুরাণে

নতুন অংশ রূপে সংযোজিত হয়েছে। প্রাচীনতম কাল থেকেই উচ্চ সংস্কৃতির সঙ্গে লৌকিক সংস্কৃতির এক ধরনের আদান প্রদান ঘটেছে। সেই ক্রিয়া প্রক্রিয়ার মাত্রাটি বহুগুণিত হয়ে ওঠে বঙ্গদেশে তুর্ক বিজয়ের ফলে। অতিক্রান্ত বিষ্ণুকে সারিয়ে কৃষ্ণ বৈষ্ণব ধর্মের কেন্দ্রে এসে যান এবং পূর্বে কৃষ্ণের লীলাত্মক যে সব কাহিনীর বীজ সাহিত্যে লক্ষ্য করা গিয়েছে (কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, সদুক্তিকর্ণামৃত, প্রাকৃত পৈঙ্গলে যা আমরা লক্ষ্য করেছি) তা ব্যাপকতা লাভ করে । গ্রাম্য গোপ যুবক কৃষ্ণ তাঁর প্রণয়লীলাসহ ভাগবতেব মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে থাকেন। পরবর্তী কৃষ্ণভজনা এবং রাধাকৃষ্ণ ভজনার ভিত্তি এই ভাবেই তুর্ক বিজয় পূর্ববর্তী বাংলায় রচিত হয়। বিষ্ণু উপাসনার স্থানে কৃষ্ণ উপাসনার পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা হতে আরো কিছু সময় লেগেছিল, কিন্তু তার সুচনা এই সময়েই ঘটে।

৪. চতুর্দশ পঞ্চদশ শতকে বঙ্গদেশে বাংলা ভাষায় তিনটি মহাকাব্য-পুরাণের অনুবাদ হয়, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত। এই অনুবাদের ধারা পরবর্তী কালে সমগ্র মধ্যযুগ ধরে সবেগে চলতে থাকে। লক্ষ্য করার মত এই তিনটিই বৈষ্ণব ধর্মাশ্রয়ী। রাম স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার বা পূর্ণাবতাররূপে পরিকল্পিত। বাংলায় যে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠা প্রধানত তা এই তিনটি কাব্যভিত্তিক। পৌরাণিক দেবমণ্ডলীর অন্য দেবতাদের আশ্রয় করে রচিত পুরাণাদি বঙ্গদেশে বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। এই বঙ্গানুবাদের পেছনেও পূর্বোক্ত সংস্কৃতি সমন্বয়ের অর্থাৎ হিন্দুর উচ্চ ও নিম্ন বর্ণের মিলনের অভিপ্রায় কাজ করেছিল। তৎকালীন রক্ষণশীল পণ্ডিত মহল রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণ গ্রন্থাবলীর বাংলাআদি ভাষায় অনুবাদ করলে কিংবা পাঠ করলে কিংবা শুনলে নরকবাসের বিধান দিয়েছিলেন। প্রগতিশীল পণ্ডিতেরা কিন্তু সেই বিধান মানেননি। তাঁরা নিম্নকোটির মানুষ এবং অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত আপামর জনসাধারণের জন্য রামায়ণ-মহাভারত এবং ভাগবতের অনুবাদ করেছেন এবং এতদ্বারা পৌরাণিক হিন্দুধর্মকে সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

ছয়
প্রাক্‌চৈতন্য বৈষ্ণব সাহিত্য

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের যে সব সাহিত্যে বৈষ্ণব ধর্মের সমকালীন বিশিষ্ট প্রবণতাগুলি ধৃত হয়েছে তা হল—

১. **অনুবাদ**
   ক. রামায়ণ—কৃত্তিবাস
   খ. মহাভারত—কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী
   গ. শ্রীকৃষ্ণবিজয় (ভাগবতের দুটি স্কন্ধ— মালাধর বসু)
২. **কৃষ্ণ-রাধা আখ্যান**
   ক. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন -বড়ু চণ্ডীদাস
৩. **পদাবলী (কৃষ্ণ রাধা বিষয়ক)**
   ক. বিদ্যাপতি
   খ. চণ্ডীদাস

(১) অনুবাদ

প্রথম পর্বের যে অনুবাদগ্রন্থগুলি সংগৃহীত হয়েছে তার মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় কৃত্তিবাসের রামায়ণ। মলাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় অতখানি জনপ্রিয় হতে পারেনি, তবে বৈষ্ণবদের মধ্যে এই গ্রন্থটির ব্যাপক প্রচলন ছিল। মহাভারত অবলম্বনে যে দুটি অনুবাদ গ্রন্থ একালের গবেষকরা সর্বপ্রাচীন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন তা সম্ভবত চট্টগ্রাম অঞ্চলেই বেশী প্রচলিত ছিল। মনে হয় পঞ্চদশ শতকে এই অনুবাদ গ্রন্থগুলি রচনার মধ্য দিয়ে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মকে সর্বসাধারণের মধ্যে নিয়ে যাবার একটি সচেতন চেষ্টা হয়েছিল। সেকথা আমরা আগেই বলেছি। তবে এই সব অনুবাদ কর্মের অনেক আগে থেকেই যে রামায়ণ মহাভারত-ভাগবতের অনেক কাহিনী লোকমুখে অথবা কথকতা জাতীয় কোন পরিবেশনরীতির (সম্ভবত কথকতার যথার্থ উদ্ভব পঞ্চদশ শতকের আগে নয়, তবে এর কিছু কিছু প্রাক্‌রূপ পূর্বকালেও হযতো দেখা গিয়েছে) মাধ্যমে লোকের কাছে পরিচিত হয়েছিল, অবশ্যই তার ব্যাপকতা ছিল না। প্রাক তুর্ক আমলে সন্ধ্যাকর নন্দী এবং অভিনন্দ এই বঙ্গদেশের পাঠকদের জন্য ক্ষুদ্রাকার সংস্কৃত রামায়ণ লিখেছিলেন।

প্রথম যুগের অনুবাদ গ্রন্থগুলি মূলানুযায়ী হওয়াই স্বাভাবিক, অনেকটা শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের মত। সংক্ষেপিত হওয়াও অসংগত নয়, অনেকটা পরাগলী মহাভারতের মত। কৃত্তিবাসের রামায়ণের মত কল্পনার অতিবিস্তারে সব দিকেই মূলকে ছাপিয়ে যাওয়া খুব স্বাভাবিক মনে হয় না। হয়তো আদিতে কৃত্তিবাসের রামায়ণও মূলানুগ ছিল — কিছু সংক্ষেপিত থাকাও অসম্ভব নয়। পরবর্তী কালে এর অত্যধিক জনপ্রিয়তার জন্যই নানা লৌকিক কাহিনী, মূল চরিত্রগুলির নানা লৌকিক বিস্তার, বিবিধ স্থানীয় ধর্মমত এই কাব্যটি আশ্রয় করেছিল।

(১.ক). রামায়ণ — কৃত্তিবাস

কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত কাব্যগুলির পাঠে যতই পার্থক্য থাক মোটামুটি একটা কাঠামো পাওযা যাচ্ছে। পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের সূচনা পর্যন্ত প্রায় তিনশ বছর ধরে বাঙালী হিন্দুর বহুমুখী ধর্মসাধনা এই কাব্যের আধারে ধৃত হয়েছে। কেউ জোব জবরদস্তি করে এর পাঠের বিকৃতি ঘটাননি। বাঙালীর ধর্ম ও জীবন-সাধনার-তিনশ বছবের সিদ্ধি যেন এই কাব্যের প্রচলিত রূপের মধ্যে ধরা পড়েছে। সে কারণে তুর্ক বিজয়-উত্তর এবং চৈতন্যপূর্ব বঙ্গের বৈষ্ণব ধর্মবিশ্বাসের প্রতিফলনমাত্র এর মধ্যে পাওয়া যাবে না।

প্রসঙ্গত একটি কথা মানতেই হয়, কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনন্য সাধারণ জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও এবং বঙ্গদেশ বৈষ্ণবধর্ম বিশ্বাসের একটি প্রধান কেন্দ্র হওয়া সত্ত্বেও এখানে রামায়েত সম্প্রদায়ের কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। রামসীতা বিষ্ণুলক্ষ্মীর অবতার রূপে বাঙালীর বিশ্বাসে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তবু ভারতের অন্য বহু স্থানের মত বঙ্গের হিন্দুরা রামসীতার মূর্তি ও মন্দিরে পূজা নিবেদন করতে অভ্যস্ত নয়। বজরঙবলী হনুমান ভক্ত-প্রধানরূপে সারা উত্তর ভারতে ধর্মীয় স্তরে উচ্চস্থানের অধিকারী হলেও তার চার পাশের রঙ্গব্যঙ্গের পরিমণ্ডলই যেন বেশী গুরুত্ব পেয়েছে বঙ্গদেশে।

রামপূজার প্রচলন বঙ্গদেশে না হলেও ভক্তিবাদের প্রভাব বিস্তারে কৃত্তিবাসী রামায়ণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বাল্মীকি রামায়ণে ভক্তিবাদী বীজ আবিষ্কার করা অসম্ভব না হলেও উত্তর ভারতের তুলসীদাসী রামায়ণে এবং বাংলার কৃত্তিবাসে ভক্তিবাদ অত্যন্ত গভীরভাবে প্রবিষ্ট। কৃত্তিবাসী রামায়ণের উপরে চৈতন্যযুগের বৈষ্ণবী ভাবনার প্রভাবে ভক্তির প্লাবন সৃষ্টি হয়েছে এরূপ মনে করার যুক্তিসংগত কারণ আছে। প্রধান প্রধান রাক্ষসবীরগণ ভক্ত বৈষ্ণবের মত রামের স্তবস্তুতি করেছে, এরূপ উল্লেখ বারবারই পাওয়া যায়। বীরবাহু —

ধরণী লুটায়ে রহে জুড়ি দুই কর।
অকিঞ্চনে কর দয়া রাম রঘুবর।।

এমনকি রাবণও শেষ পর্যন্ত পরমভক্তের মত রামের স্তব করেছে—

জন্মিয়া ভারতভুমে আমি দুরাচার।
করেছি পাতক বহু সংখ্যা নাহি তার।।
অপরাধ মার্জনা করহ দয়াময়।
কুড়ি হস্ত জুড়ি রাবণ এক দৃষ্টে রয়।।

কিন্তু তরণী সেনের উপরেই বৈষ্ণব প্রভাব সবচেয়ে বেশী। তরণী রীতিমত বৈরাগী সেজে যুদ্ধে গমন করেছে। তার সারাদেহে রামনাম, রথের গায়ে রামনাম—

অঙ্গে লেখা রামনাম রথের চারিপাশে।

এ যেন চৈতন্যদেব প্রবর্তিত নামমাহাত্ম্যের ঈষৎ পরিবর্তিত প্রতিফলন। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন

> এই সব পড়িয়া রাম ও রাবণের ভীষণ যুদ্ধস্থলকে গৈরিকরেণু রঞ্জিত সংকীর্তন ভূমি বলিয়া ভুল হয় এবং তথাকার দামামা-রোল খোলবাদ্যের মৃদুতা গ্রহণ করে। যাহা হউক রামায়ণ এই রূপ পরিবর্তিত হইয়া বাঙালীর ঘরের উপযোগী হইয়াছিল সন্দেহ নাই—।

তরণীর কাটামুণ্ড রাম নাম ব'লে শ্রীরামের পাদস্পর্শ করেছে। গুরুড়ের আগমনে যখন রামলক্ষ্মণ নাগপাশ থেকে মুক্ত হলেন এবং তাকে বর দিতে চাইলেন তখন লঙ্কার যুদ্ধ-ক্ষেত্রে পক্ষীরাজ গরুড় রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ দেখতে চেয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সেই রূপ প্রকটিত হলে কোনরূপ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এই আশাঙ্কায় গরুড় তার বিরাট ডানার আড়াল তৈরি করে এবং রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ দেখিয়ে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন রাম। রাম কিংবা রাম-সীতা নয়, রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তিই বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে পূজিত। বাঙালী তার মধ্যেই রাম সীতাকে পেয়ে গেছে, পৃথক রামপূজার প্রশ্ন তাই বঙ্গদেশে ওঠেনি।

অবশ্যই বঙ্গীয় বৈষ্ণবেরা রামায়ণকে পুরোপুরি নিজেদের কাব্য করে তুলেছিলেন। কিন্তু বঙ্গীয় শাক্তরাও যে পিছিয়ে ছিলেন না তার নিদর্শন হিসেবে এটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে যে কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামকে দিয়ে একশ আট নীলপদ্মে শরৎকালে দেবী দুর্গার পূজার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং বাঙালী রুচিতে এই পূজাটিও খুবই প্রীতিকর হয়েছিল সন্দেহ নেই। একান্ত গোষ্ঠিবদ্ধ ধর্মাচারীদের বাদ দিলে সাধারণ ভক্ত বাঙালী যতটা বৈষ্ণব ততটাই শাক্ত। রাধাকৃষ্ণ তাদের অতিপ্রিয় হলেও শারদীয় দুর্গোৎসব তাদের জাতীয় পূজা। চৈতন্য পরবর্তী কোন সময়ে রামের এই দুর্গাপূজা কৃত্তিবাসী কাব্যে আশ্রয় পেলেও বিষয়টি বাঙালী জাতি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গেই গ্রহণ করেছিল। বৈষ্ণব ও শাক্ত বিশ্বাসের এরূপ ঘনিষ্ঠ মেল-বন্ধন তাদের অভিপ্রায়কেই তুষ্ট করেছিল।

(১.খ). মহাভারত—কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী

মহাভারতের প্রথম অনুবাদক রূপে পণ্ডিতেরা কবীন্দ্র পরমেশ্বরকেই গ্রহণ করে থাকেন। কাব্যটি ১৫১৩/১৫১৯ সালের মধ্যে লেখা হয়েছিল মনে হয়। রচনাটি সংক্ষিপ্ত নতুন কাহিনীর সংযোজন নেই। কবির প্রতিপালক চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খাঁর অনুরোধে কাব্যটি লেখা। বিশেষভাবে ধর্মভাবব্যাকুলতা এর মধ্যে নেই, বাড়তি কৃষ্ণ মহিমা প্রকাশের চেষ্টা নেই, ভক্তির উচ্ছ্বাস নেই। তবে যতটুকু কৃষ্ণভক্তি সংস্কৃত মহাভারতে প্রবেশ করেছিল সেটুকু সংক্ষেপে তিনি রক্ষা করেছেন।

মূল গল্পটি প্রতিপালক মুসলমান অমাত্যকে শোনানই তাঁর লক্ষ্য ছিল। কিন্তু সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য কবি কোথাও মূলচ্যুতি ঘটাননি। হিন্দুর স্বাভাবিক ধর্মাশ্রয় মহাভারতকে কোথাও কিছুমাত্র বিকৃত করা হয়নি।

কারো কারো মতে অন্য কবি শ্রীকর নন্দী অথবা শ্রীকরন নন্দী। তিনি ছিলেন পরাগল পুত্র নসরৎ বা ছুটি খাঁর সভাকবি। ছুটি খাঁ শ্রীকর নন্দীকে জৈমিনি রচিত মহাভারতের অনুবাদ করতে বলেন। জৈমিনি মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব লিখেছিলেন। ব্যাসদেবের মহাভারতের থেকে জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বের বিস্তার অনেক বেশী। অনেকগুলি নতুন যুদ্ধ কাহিনী জৈমিনির সংহিতায় আছে। শ্রীকর নন্দী কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মত সমগ্র মহাভারত-কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দান করেন নি। তিনি সংক্ষেপিত করলেও জৈমিনি সংহিতা কে মূলত অনুসরণ করেছিলেন। কবি তাঁর লেখায় কিন্তু সংযত ভক্তিরস এবং তির্যক কৌতুকের মিশ্রণ ঘটিয়ে-ছিলেন। কৃষ্ণ ঠাট্টা করে ভীমকে স্থূলোদর এবং বহুভক্ষক বলে কটাক্ষ করায় ভীম বলেন—

কৃষ্ণের বচনে ভীম রুষিয়া বলিল।
মোকে মন্দ বল কৃষ্ণ নিজ না দেখিল।।
তোহ্মার উদরে কৃষ্ণ বৈসে ত্রিভুবন।
আহ্মার উদরে কত ওদন ব্যঞ্জন।।
তুমি স্থূলোদর নহ আমি স্থূলোদর।
বিমসিয়া চাহ কৃষ্ণ দেব দামোদর।।
সংসার উপাড়িয়া সৃষ্টি খাইবা তুহ্মি।
তোহ্মা হোতে বহু ভক্ষ হইল কি আহ্মি।।

ভীমের চরিত্র অবলম্বন করে এই জাতীয় হাস্য মিশ্র ভক্তি বাঙালী মেজাজের সঙ্গে সেই অতীত কাল থেকে একাল পর্যন্ত সমানে মিশে আছে। গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডব গৌরবে' কৃষ্ণের প্রতি ভীমের উক্তি এই প্রসঙ্গে অনেকেরই মনে পড়বে।

অতি ছল অতি খল
অতীব কুটিল।
তুমিই কেবল মাত্র
উপমা তোমার।
তুমি লজ্জাহীন,
তোমারে কি লজ্জা দেব?

এখানে দেখি ভর্ৎসনার পেছনে ভক্তি — কিছু কিছু দ্ব্যর্থবোধক শব্দের মধ্য দিয়ে তা ব্যঞ্জিত।

(১.গ). শ্রীকৃষ্ণ বজয় — ভাগবতের দুটি স্কন্ধ-মালাধর বসু

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অবলম্বন করে লেখা হয়েছিল। মনে হয় অনুবাদটি মূলানুগ। লেখকের নির্বাচন খুব তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীমদ্‌ভাগবতে বিষ্ণুর অন্যান্য অবতারেরও কীর্তি কালাপ বর্ণিত। কবি দুটিমাত্র স্কন্ধ অবলম্বন করেছিলেন। এই দুটি অংশে কৃষ্ণ আর্বিভাবের কারণ এবং তাঁর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কীর্তিকলাপই বর্ণিত। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বোঝায় কবি বাঙালী রুচির পরিপোষণ করেছেন। বাঙালীর যত বিষ্ণুভক্তি কৃষ্ণভক্তিতে গিয়ে ঠেকেছিল।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে' বৃন্দাবনলীলা এবং রাসবর্ণনা যতটুকু আছে তা মূল ভাগবতেরই অনুসরণ। সে দিক থেকে মালাধর বসু যে কৃষ্ণের মাধুর্যলীলার দিকে বিশেষ ঝোঁক দিতে চেয়েছিলেন এরূপ মনে হয় না। ভাগবতের মত তাঁর কৃষ্ণও ঐশ্বর্যদ্যুতি-সম্পন্ন মহাবীর্যশালী ব্যক্তিত্ব।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে' একটি পদ্যাংশে পাওয়া যায়— 'বাসুদেব সুত কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ', এই চরণটি পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবকে ভাব-বিহ্বল করে তুলত। গৌড়ীয় বৈষ্ণধর্মের পূর্ব সূত্র নাকি এর মধ্যে নিহিত ছিল। মালাধর বসুর জন্মস্থান কুলীনগ্রামকে স্বয়ং শ্রীচৈতন্য সে কারণেই শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। কিন্তু মালাধরের কাব্যটি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের রাগানুগা ভক্তির সঙ্গে নিঃসম্পর্ক। তবে প্রাক্‌-চৈতন্য বৈষ্ণব ভাবনার ভাগবতাশ্রয়ী রূপটি এ কাব্যে পাওযা যাবে।

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র অনেকগুলি পুঁথিতে অবশ্য কৃষ্ণের দানলীলা, নৌকালীলা সংক্রান্ত কিছু কাহিনী পাওযা যায়। খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থের পরিশিষ্টে এইরূপ অনেকগুলি সংযোজন মুদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু এগুলি মালাধরের কল্পনার ফসল নয়। চৈতন্য প্রভাব যুগের বৈষ্ণব কবিদের কাব্য কল্পনা এই পালাগুলিকে মালাধরের মূল কাব্যের সঙ্গে সংযোজিত করেছিল।

(২). কৃষ্ণ-রাধা আখ্যান

বাংলার মৌলিক বৈষ্ণব সাহিত্যকে কৃষ্ণ কেন্দ্রিক ভাগবত-অনুবাদ এবং মহাভারত-অনুবাদ থেকে পৃথক ভাবে আলোচনা করাই শ্রেয়। কাহিনী বা পদ অর্থাৎ গীতিকবিতা যাই হোক না কেন বাঙালী কবিরা দেশের মাটি এবং মানুষের মন থেকে এর উপাদান সংগ্রহ করেছেন এবং তদনুযায়ী একে রূপায়িত করেছেন। ভাগবতের অনুবাদে বা মহাভারতের কৃষ্ণপ্রসঙ্গের ভাষান্তরে বাঙালীর নিজস্ব মন

মুখ্যত সর্বভারতীয় চিন্তা চেতনার অংশরূপে প্রকাশ পেয়েছে, গৌণভাবে কিছুটা বাঙালী ভাবাকুলতা অনুবাদের ফাঁক দিয়ে কখনো কখনো আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজেছে। কিন্তু কৃষ্ণমঙ্গল জাতীয় আখ্যান কাব্য অথবা রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কবিতায় যে ধর্মানুভূতি তথা ধর্মবিশ্বাস প্রকাশিত তার স্বরূপ একান্তভাবে বঙ্গদেশীয়।

কৃষ্ণমঙ্গল আখ্যান কাব্যগুলির প্রাচুর্য চৈতন্য পরবর্তী কালে বাংলা ভাষায় লক্ষ্য করা যায়। একটি মাত্র নাট্যধর্মী কৃষ্ণ আখান নিশ্চিতভাবে চৈতন্য-পূর্ববর্তীকালের রচনা—বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। তবে গীতিকবিতার ক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ চৈতন্য পূর্ব যুগে ভালভাবেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই দুই শ্রেণীর রচনার মধ্য দিয়ে সমকালীন বাঙালীর বৈষ্ণব ধর্মবিশ্বাসের স্বরূপনির্ণয় করাই বর্তমানে আমাদের অভিপ্রায়।

(২.ক). শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন — বড়ু চণ্ডীদাস

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি সম্ভবত পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে, বড়জোর ষোড়শ শতকের সূচনায় রচিত হয়। কাব্যটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে এটি কতগুলি নাটগীতির সঙ্কলন। তবে নাটগীতিগুলি বিচ্ছিন্ন নয়, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, ভারখণ্ড প্রভৃতি পরস্পর সংবদ্ধ হয়ে একটি পূর্ণাবয়ব কাব্যের চরিত্র লাভ করেছে। কাব্যটি খণ্ডিত হলেও খণ্ড থেকে খণ্ডে এর বিকাশ ও বিন্যাস দেখে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে একজন সচেতন কবিশিল্পীর রচনা বলেই গ্রহণ করতে হয়। একটি মত প্রচলিত আছে যে একাধিক কবির রচনা এখানে সঙ্কলিত। এই মতের পক্ষে জোরদার পাথুরে প্রমাণ কিছু নেই। আভ্যন্তরে শিল্পগত প্রমাণ একে একেবারে নস্যাৎ করে দেবে।

সেকালে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বন করে সাধারণ স্তরের মানুষের মধ্যে নাটগীতি অর্থাৎ সঙ্গীতপ্রধান অভিনয় কলার প্রচলন ছিল। জয়দেব বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বলেছি যে লোকায়ত নাটগীতির ফর্ম জয়দেবের গীতগোবিন্দ রচনার পিছনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। জয়দেব থেকে বড়ু চণ্ডীদাস-কালের ব্যবধান প্রায় চারশ বছর। মনে হয় 'কৃষ্ণ নাট' এই চারশ বছর এবং আগে পিছে আরো বহু কাল আপামর বাঙালীর মনোরঞ্জন করত এবং ধর্ম পালনের উপায় রূপে গণ্য হত। বড়ু চণ্ডীদাস সম্ভবত একজনে পেশাদার নাটগীতের অধিকারী ছিলেন। বিচ্ছিন্ন ভাবে অনেক পালা লিখেছিলেন, যেমন বংশী খণ্ড বৃন্দাবন খণ্ড ইত্যাদি। তারপর সেই পালা গুলো পরপর যুক্ত করলেন কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোকের সাহায্যে এবং কাব্যটির সূচনায় একটি বিবরণপ্রধান মুখবন্ধ রচনা করে নাম দিলেন 'জন্মখণ্ড'। এইভাবে নাটগীতির সঙ্কলন একটি সংবদ্ধ গীতি সংলাপপ্রধান আখ্যানকাব্যে পরিণত হল।

বড়ু চণ্ডীদাস কে ছিলেন তা নিয়ে বাঙালীর সংস্কৃতিক ইতিহাসে অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে, কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তেও পৌছান যায়নি। তবে বাশুলি নামক কোন শাক্ত দেবী এই কবির গৃহদেবতা হতে পারেন। কারণ ভণিতায় দেবীর প্রতি বড়ুর শ্রদ্ধা বারংবার প্রকাশ পেয়েছে। বাশুলি সেবক বড়ু চণ্ডীদাস কৃষ্ণ কাব্য রচনা করলেন এই ঘটনাটি তাৎপর্য পূর্ণ। কৃষ্ণকে তিনি ভগবান বিষ্ণুর অবতার বলে মনে করেছেন। মনে করেছেন অংশাবতার বলে। জন্মখণ্ডে বলা হয়েছে কংসের অত্যাচারে দেবগণের অনুরোধে ভগবান বিষ্ণু তাঁর ধলা কালা দুই কেশ পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন। কৃষ্ণকেশ থেকে কৃষ্ণ, শ্বেত কেশ থেকে বলরাম জন্ম নিলেন। কোন বিখ্যাত পুরাণে একথা নেই, হয়তো কোন লৌকিক কিংবদন্তী থেকে বড়ু এই ধারণাটি সংগ্রহ করেছিলেন। মানবরূপী কৃষ্ণকে আবদ্ধ রাখার জন্য লক্ষ্মী রাধা রূপে ভূমিষ্ঠ হলেন। লক্ষ্মী ও রাধাকে এক করে ফেলা বড়ু চণ্ডীদাসের পৌরাণিক বোধের অন্যতম নতুন দিগন্ত। এই ভাবে বড়ু চণ্ডীদাস লৌকিক ধর্মবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে পৌরাণিক কৃষ্ণ প্রসঙ্গকে কিঞ্চিৎ প্রসারিত করলেও মূলত ভাগবত অনুসরণ করেই জন্মখণ্ডের কাঠামো গড়েছেন। কংসের বিনাশ ঘটাবার উদ্দেশ্যে কংসভগ্নী দেবকী ও বসুদেবের পুত্ররূপে কৃষ্ণের জন্ম। নবজাত শিশুকে দৈব কৃপায় বন্ধু নন্দের বৃন্দাবন স্থিত বাসভবনে রেখে আসা, কংস কর্তৃক নানা ভাবে তার প্রাণ সংহারের চেষ্টা সত্ত্বেও বৃন্দাবনে কৃষ্ণের বেড়ে ওঠা। কবি এরপর কাব্যের মুখ ফিরিয়ে দিয়েছেন রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র প্রণয়লীলার দিকে। তার তিনটি উৎস।

১. ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণ-গোপীদের রাস লীলা।

২. বাংলার লৌকিক সাহিত্যে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক অজস্র সঙ্গীত।

৩. লৌকিক মানবিক বিচিত্র প্রণয়সঙ্গীত।

এই তিনটি সূত্র সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন লৌকিক প্রেমলীলামূলক কাহিনীর জন্ম দিয়েছিল। কৃষ্ণলীলামুলক সেই আখ্যানগুলি পরবর্তী 'কৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যের মত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভিত্তি।

বড়ুর কৃষ্ণ গ্রাম্য যুবক "ঘোড়াচুলা কানহাই"। তার আচার আচরণেও গ্রাম্য প্রণয়ীর রূঢ়তা এবং মাঝে মাঝে বাল-সুলভতা প্রকট। কিন্তু কবি ভোলেননি এই কৃষ্ণই বনমালী হরি। কংস নিধনের জন্যই তার জন্ম। রাধাকে কৃষ্ণ বলেছেন— 'কংসের কারণে হ এ আন্মার জনম।' এই কৃষ্ণকে দিয়ে তিনি যোগধ্যান ও করিয়েছেন। দেহের দশমী দুয়ারে কবাট দিয়ে কৃষ্ণ আত্মমগ্নও ধ্যানস্থ হয়ে থেকেছেন। এইভাবে আমরা বড়ু চণ্ডীদাসের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে একটা বিচিত্র মিশ্রণ লক্ষ্য করি—

১. তিনি বাশুলি পূজক এবং বাশুলি কোন শাক্ত তান্ত্রিক দেবী হওয়াই সম্ভব।
২. তিনি কৃষ্ণ-বিষ্ণু অবতারত্বে বিশ্বাসী এবং ভাগবতোক্ত পৌরাণিক ধর্মে আস্থাবান।
৩. কৃষ্ণ-বিষ্ণু বিষয়ে (ধলা কালা দুই কেশের প্রসঙ্গ) এবং রাধা বিষয়ে (লক্ষ্মীর অবতারত্ব) লোকাশ্রয়ী ধর্ম বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত।
৪. লৌকিক গোপালক প্রণয় দেবতা কৃষ্ণ এবং বিষ্ণু অবতার কংসারি কৃষ্ণের মধ্যে কোন পার্থক্যই তিনি অনুভব করেন না।
৫. তিনি যোগ সিদ্ধ পন্থায় বিশ্বাসী। কৃষ্ণকে অনেকটা শিবের মত মহাযোগী-যোগ সাধনারত পুরুষ রূপে কাব্য মধ্যে চিত্রিত করেছেন।

এই ভাবে দেখা যায় বাঙালী হিন্দুর ধর্ম বিশ্বাসে লোকিক -পৌরাণিক, বৈষ্ণব-শাক্ত এবং শৈব (যোগসাধনা) মতবাদের একটি চমৎকার সমন্বয়। এরা পাশাপাশি অবস্থান করেছে, কোথাও সংঘাতে লিপ্ত নয়।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের কাহিনীটি রোমান্টিক প্রণয় কাহিনী রূপে সর্বদাই ব্যাখ্যাত হয়ে থাকে। আমরা 'মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারী চরিত্র' গ্রন্থে রাধার মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের দিক থেকে কাব্যটির মানবিক এবং কাল্পনিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা করেছি। কিন্তু ধর্মসাধনার দিক থেকে এই কাহিনীর একটি নিগূঢ় ব্যাখ্যা চোখ এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। বিমুখ রাধাকে কৃষ্ণ প্রায় জোর করেই প্রেমের বন্ধনে বাঁধতে চাইছে। তাকে একরূপ দৈহিক বলে যৌন মিলনে বাধ্য করেছে। ক্রমে রাধার মধ্যে নারী সত্তার উন্মেষ ঘটেছে। প্রণয় প্রগলভতা প্রবল হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণ মিলনে সে আনন্দ উপভোগ করেছে। ঠিক এই অবস্থায় কৃষ্ণ তাকে পরিত্যাগ করে সুদূরে যোগসাধনায় নিমগ্ন হয়েছেন। রাধার বিরহ ব্যাকুলতা চরমে উঠেছে। পরবর্তী অংশ খণ্ডিত বলে জানার উপায় নেই। এই অংশের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অনুধাবন করা খুব দুরূহ নয়। ভগবান মানুষকে তাঁর দিকে আকর্ষণ করছেন। সংসার সমাজের বন্ধনে মানুষ রাধার মতই ঈশ্বর বিমুখ হয়ে থাকতে চাইছে। পরমাত্মা তখন জীবাত্মার উপরে যে বল প্রয়োগ করছেন তাকে খৃষ্টান মিষ্টিকরা ডিভাইন বলে উল্লেখ করেছেন। এই ঐশ্বরিক বল প্রয়োগ যখন জীবাত্মার সংসার বন্ধন ছিন্ন করেছে তারপরই জীবাত্মার ঈশ্বর অভিমুখে দুঃখ কষ্টের মধ্যদিয়ে তীব্র যন্ত্রনায় ক্ষুরস্য ধারা পথে অভিযান। কারণ প্রেমিক ঈশ্বর তখন অদৃশ্য। বিরহ বেদনায় প্রেমিকা-জীবাত্মা তখন যন্ত্রনা বিক্ষত। এই আধাত্মিক রূপকথাটি 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের' কবির ভাবনায় ছিল—অন্তত পক্ষে তার অন্যতম মাত্রা রূপে এই ব্যাখ্যাটি গ্রহন যোগ্য, আমরা এরূপ বিশ্বাস করি।

(৩). পদাবলী (কৃষ্ণ-রাধা বিষয়ক)

চৈতন্য প্রভাবের পূর্বে বাংলা ভাষায় কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কহীন খণ্ড খণ্ড পদ বা গীতিকবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন চণ্ডীদাস। বাংলার বাইরের মিথিলার কবি বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণ প্রণয়-কবিতায় এই কালপর্বে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। সম্ভবত চৈতন্যপূর্বকাল থেকেই তিনি বাঙালী কাব্যরসিকদের কাছে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন । চৈতন্যপ্রভাব যুগে এই স্বীকৃতির পরিচয় অনেক বেড়ে যায়। সে কালীন বৈষ্ণবধর্মের কথা মনে রেখে এই দুজন পদ রচয়িতার বিশিষ্টতা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

(৩.ক). বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতি মিথিলার রাজসভার কবি ছিলেন। তিনি নানা ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন এবং বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি 'বিভাগসার', 'দান বাক্যবলী' প্রভৃতি হিন্দু স্মৃতি গ্রন্থ, 'বর্ষক্রিয়া', 'গঙ্গাবাক্যবলী', 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী' প্রভৃতি পূজা ও সাধনপদ্ধতির গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সংস্কৃত ভাষায়। 'কীর্তিলতা' এবং 'কীতির্ত পতাকা' এই দুটি ইতিহাসগ্রন্থ লিখেছিলেন অবহট্ঠ ভাষায়। তাছাড়াও 'ভূ-পরিক্রমা' নামে গদ্য কাহিনী রচনা করেছিলেন। হরগৌরী বিষয়ক অনেকগুলি গীতিকবিতা লিখেছিলেন মৈথিলী ভাষায় এবং রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদগুলি লিখেছিলেন ব্রজবুলি ভাষায়। বিদ্যাপতি প্রসঙ্গে বর্তমান গ্রন্থ রচনা করতে বসে আমাদের দুটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।—

এক। বিদ্যাপতিকে বাংলা সাহিত্যের এই আলোচনা গ্রন্থে কোন্ যুক্তিতে আমরা অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

দুই। বৈষ্ণব কবিতার ধারায় তাঁর আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর ধর্মবিশ্রাসের স্বরূপটি নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা যায় কিনা?

বিদ্যাপতি মৈথিল ব্রাহ্মাণ। মিথিলার রাজকবি ও সভাসদ হিসেবে তিনি দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেছেন। বাঙালী জয়দেবকে, যিনি ছিলেন লক্ষ্মণসেনের সভাকবি, যত সহজে আমরা বাংলা সাহিত্যের আলোচ্য বিষয় করে তুলি, বিদ্যাপতির ক্ষেত্রে তা পারা যায় না। জয়দেবের আলোচনা কালে যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে তিনি বাঙালী এবং বঙ্গবাসী ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় কাব্য লিখলেও তার মধ্যে বাংলা ছন্দ ও পদ রচনারীতি যেমন প্রবেশ করেছে, তেমনি মাঝে মাঝে ভাষাও বাংলার খুব কাছে চলে এসেছে। কিন্তু বিদ্যাপতি শুধু মৈথিলি ছিলেন না, তিনি

বাংলাতে কিছু লেখেননি। তাঁর রাধাকৃষ্ণ পদাবলী ব্রজবুলিতে লেখা। এই ব্রজবুলি ভাষা কিন্তু বাংলা মৈথিলী অবহট্ট এই ভাষাগুলির মিশ্রণের ফলে জাত একটা বিশেষ ধরনের কাব্য ভাষা (লিটারেরি ডায়লেক্ট)। বিদ্যাপতিকে বাঙালী কবি বলার উপায় নেই। তাঁর সংস্কৃত অবহট্ট ও মৈথিলী ভাষায় লেখা রচনাগুলিকে বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করাও যাবে না। শুধুমাত্র তাঁর ব্রজবুলি পদ বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ বিষয়ে অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তীর যুক্তি গ্রহণযোগ্য মনে করি—

> "মনে রাখিতে হইবে যে তদানীন্তন মিথিলা দীর্ঘকাল ধরিয়া বাংলার সারস্বত তীর্থ ছিল এবং স্বভাবতই তাহার উপর মৈথিল ভাষার একটা আকর্ষণ ছিল। মিথিলাতেই ব্রজবুলির ক্ষেত্র কতকটা প্রস্তুত হইয়াছিল— বিদ্যাপতি-উমাপতি স্বয়ং এ কাজ করিয়াছিলেন। শৈব মিথিলার বৈষ্ণব ভাবধারা বর্ষিত হইয়াছিল বাংলারই 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্' হইতে। সেই ধারা-পানে যে কয়টি চাতক আনন্দে গাহিয়া উঠিয়াছিল, উমাপতি তাহাদের মধ্যে প্রাচীনতম। সাধারণ মিথিলাবাসী যে সে-গানে মুগ্ধ হইবে না এবং বাঙালীই তাহা কান পাতিয়া শুনিবে, একথা তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল না। তাই পদাবলী রচনায় তাঁহার প্রয়োগ করিয়াছিলেন সরলতর ভাষা। ....বিদ্যাপতির হরগৌরী পদাবলীর কঠিন ও দুর্বোধ্য মৈথিল দেখিয়া মনে হয় এ পদ রচনায় মিথিলার বাইরে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না, যেমন ছিল বৈষ্ণব পদ-রচনায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত বিদ্যাপতির প্রতি মিথিলাবাসীর উপেক্ষা লক্ষণীয়
>
> — (বৈষ্ণব পদাবলীর ক. বি. প্রকাশিত ভূমিকা)

প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাপতির কবিত্ব বুঝবার জন্য তাঁর অন্যবিধ সাহিত্যের প্রসঙ্গ আমরা উল্লেখ করে থাকি। কিন্তু তাঁর রাধাকৃষ্ণ প্রণয় পদাবলী বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের অচ্ছেদ্য অংশরূপে দীর্ঘকাল ধরে গৃহীত হয়ে আসছে। বাংলার বৈষ্ণব পদাবলীতে চৈতন্য পরবর্তীকালে বিদ্যাপতি নাম নিয়ে একাধিক বাঙালী কবি কবিতা লিখেছেন। গোবিন্দ দাস এবং শেখরের মত বড় কবিরা ছাড়াও অনেক মাঝারি শক্তির কবি বিদ্যাপতির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। বিদ্যাপতির ব্রজবুলি পদের আদর্শে চৈতন্যদেব বিদ্যাপতির পদাবলীর রসাস্বাদ করেছেন বলে তাঁর জীবনী গ্রন্থে উল্লেখ আছে। বৈষ্ণব কীর্তনীয়ারা আখর সংযুক্ত করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দিক থেকে ব্যাখ্যা করে বিদ্যাপতির পদ কীর্তন করেছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর পুরাতন সব সঙ্কলন গ্রন্থেই ('ক্ষণদাগীতচিন্তামণি', 'পদরত্নাকর', 'পদামৃত সমুদ্র') বিদ্যাপতিব পদ সসম্ভ্রমে সঙ্কলিত হয়েছে। আধুনিক

যুগে ঐতিহাসিকের এ বিষয়ে করণীয় কিছু নেই। বৃটিশপূর্ব যুগেই বাঙালী রসিক পাঠক এবং বৈষ্ণব তাত্ত্বিক, সঙ্কলনকর্তা, কীর্তনিয়া সকলে বিদ্যাপতিকে বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত রূপে সহজেই গ্রহণ করে নিয়েছেন।

বিদ্যাপতি বৈষ্ণব ছিলেন না, আবার বৈষ্ণব বিরোধীও ছিলেন না। তিনি স্মার্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ধর্মমত সম্পর্কে পণ্ডিতেরা অনেক বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। এ বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে সিদ্ধান্ত করেছেন তাকে আমরা গ্রহণযোগ্য মনে করি—

> তিনি মিথিলা, বাংলা ও ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের ব্রাহ্মণের ন্যায় স্মার্ত ও পঞ্চোপাসক ছিলেন, অর্থাৎ স্মৃতির ব্যবস্থা মানিয়া চলিতেন এবং গণেশ, সূর্য, শিব বিষ্ণু ও দুর্গা এই পঞ্চ দেবতার উপাসনা করিতেন।
>
> — (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঃ কীর্তিলতার ভূমিকা)

বিদ্যাপতি রাজসভার কবি ও পণ্ডিত। তাঁর কিছু কিছু রচনা ধর্ম সংস্পর্শহীন যেমন 'কীর্তিলতা', 'কীর্তিপতাকা', 'পুরুষ পরীক্ষা' প্রভৃতি। কিন্তু স্মৃতির গ্রন্থগুলি হিন্দুর ধর্মীয় আচার-আচরণ সম্পর্কিত এবং পুজা ও সাধনপদ্ধতির সঙ্কলনগুলি প্রত্যক্ষত ধর্মাশ্রয়ী। তাঁর মৈথিলী ভাষায় লেখা 'হরগৌরী পদাবলী' এবং ব্রজবুলিতে লেখা 'রাধাকৃষ্ণ পদাবলী' একই সঙ্গে ধর্ম সম্পৃক্ত এবং রসসৃষ্টিমূলক। হরগৌরী এবং রাধাকৃষ্ণ এঁদের দেবতা হিসেবেই তিনি মনে করেছেন এবং হরগৌরীর দাম্পত্য লীলা এবং রাধাকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেম লীলার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি জীবনরস সম্ভোগে অবশ্যই ব্যাপৃত হয়েছেন, কিন্তু দেবতার লীলাব, সম্ভোগের জগৎ থেকে নিজেকে নির্বাসিত করেননি। সেকালের কবিরা চৈতন্য-পন্থীদের মত কোন প্রেমতত্ত্ববোধে দীক্ষিত না হলেও জীবন-প্রেম এবং ঈশ্বরলীলা এ দুয়ের মধ্যে কোন বিরোধ অনুভব করতে চাননি, কৃষ্ণকে কবি মাধব বলে বার বার উল্লেখ করেছেন এবং তাঁকে পরমব্রহ্ম চৈতন্য-স্বরূপ বলে অনুভব করেছেন। আমরা মধ্য-যুগের সাহিত্যে ধর্মের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এইসব গুরুত্বপূর্ণ কারণেই বিদ্যাপতিকে অন্তর্ভুক্ত করেছি।

বিদ্যাপতি প্রার্থনাসূচক কতকগুলি পদ-রচনা করেছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কৃষ্ণতত্ত্বের সঙ্গে এবং সাধ্য-সাধন ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে তা স্বতন্ত্র স্তরের হলেও কবির ব্রহ্মরূপে বন্দিত হয়েছেন। শুধু তাই নয় কবির ব্যক্তিগত বোধ এবং ধর্মবোধ ওখানে ওতপ্রোত হয়ে উঠেছে। তিনি মাধব কৃষ্ণকে বলেছেন—

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরী সমানা।।

ভণয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমনভয়
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদি নাথ কহায়সি
ভবতারণ ভার তোহারা।।

তিনি মাধব কৃষ্ণকে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূল বলে অনুভব করেছেন। এই মাধবই যে প্রনয়লীলার কৃষ্ণ তাতে সন্দেহ নেই। কারণ হিন্দু পৌরাণিক দেবমণ্ডলীতে কৃষ্ণই মাধব, অন্য কোন দেবতা মাধব নন। কবি অন্যত্র বলেছেন—

তুঁহু জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহ মুঞি ছার।।
কি এ মানুস পসু পাখি কিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাক গতাগতি পুনপুন।—

জগন্নাথই কৃষ্ণ তিনিই মাধব। তাঁর কাছেই কবির চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ।

এই কবিতাগুলি একটু গভীরভাবে পড়লে লক্ষ্য করা যায় কবি শুধু মাত্র তত্ত্বচিন্তা প্রকাশের জন্যই এসব লেখেননি, উক্তিগুলি যেন তাঁর সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞাতার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। এ বিষয়ে বিদগ্ধ অধ্যাপক. ড. ক্ষেত্র গুপ্তের মন্তব্য—

> "কবির অন্তর্গূঢ় কবি ব্যক্তিত্বের কিছু পরিচয় এর মাধ্যমে পাওয়া যায় বলে আমার বিশ্বাস। ....বার্ধক্যে স্মৃতির আত্মগ্লানি, যৌবনের ভোগপঙ্কিল জীবনের সম্পর্কে মৃত্যুপথ যাত্রীর তীব্র বিশ্লেষণ এই কবিতাগুলিতে প্রকাশিত.... এর মধ্যে যৌবনের দিনগুলির যে স্মৃতির দাহন আছে তাই লক্ষণীয় বলে মনে করি। এ শুধু সাধারণভাবে সংসার জীবনের নিন্দামাত্র নয়। একটি বিশেষ দিকের প্রতি কবি বারবার আত্মগ্লানির সঙ্গে ফিরে তাকাচ্ছেন ও শিহরিত হচ্ছেন। এটি আকস্মিক নয়, কবির অতীত জীবন ও মননের সত্যকার পরিচয়সাক্ষী।"

— (প্রাচীন কাব্য ঃ সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন)

সমালোচকের উদ্ধৃত মন্তব্য কতটা সত্য তার প্রমাণ পাওয়া যাবে প্রার্থনা পর্যায়ের কবিতা থেকে সঙ্কলিত নীচের উদ্ধৃতি তিনটিতে—

১. তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুত-মিত-রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পলুঁ
অব মঝু হব কোন-কাজে।।

২. নিধুবনে রমণী রসরঙ্গে মাতল
তোহে ভজব কোন বেলা

৩. যাবত জনম হম তুয়া পদ ন সেবলুঁ
যুবতী মতে মঞে মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পিয়লুঁ
সম্পদ বিপদহি ভেলি।।

বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদগুলি মানবিক প্রণয়বোধে উদ্দীপ্ত। নরনারীর দেহভাবনা-প্রধান প্রেমানুভূতির চিত্র হিসেবে এ কবিতাগুলির মূল্যায়ন অনেক সমালোচকই করেছেন। বর্তমানে সেই প্রসঙ্গ আমাদের আলোচ্য নয়। বিদ্যাপতির কবিতায় আধুনিক লেখকেরা কামভাবনার আধিক্য লক্ষ্য করেছেন এবং দৈবীভাব এরূপ কামাত্মিকা রূপ নিতে পারে না বলে সিদ্ধান্ত করতে চেয়েছেন। এই সিদ্ধান্ত আমাদের কাছে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় নি। কারণ প্রাচীন ভারতে নরনারীর দেহ সম্বন্ধকে অশ্লীল ও ধর্মপথ-বিমুখ বলে কখনো মনে করা হয়নি। বহু প্রাচীন মন্দিরে কামলীলার যে ভাস্কর্য দেখা যায় তা ধর্মপথগামী মানুষকে বিমুখ করে তোলবার জন্য নয়। মানবদেহধারী কৃষ্ণ যদি যুরোপ-বিদিত প্লেটনিক লাভ -এর চর্চা নাই করেন তাহলে সব কিছু ভক্তিধর্ম ভ্রষ্ট বলে সেকালের মানুষ মনে করত না। এই সাধারণ পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এমন কয়েকটি কবিতার উল্লেখ করছি যার মধ্য দিয়ে এমন গভীর তাৎপর্য ব্যঞ্জিত যাতে ব্যাকুল ঈশ্বর জিজ্ঞাসা অনুভব করতে হয়।

হাথক দর্পণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল।।

বিদ্যাপতির এই কবিতায় রাধার কৃষ্ণানুভব শুধু হাতের দর্পণ মাথার ফুল চোখের কাজল মুখের তাম্বুল —এইরূপ প্রসাধনবাচকতায় সীমাবদ্ধ নয়। হাতের দর্পণের মধ্যে রাধা নিজেকে দেখতে পায়—কৃষ্ণে রাধার আত্মদর্শন। রাধা বলেছেন তুমি আমার 'পাখীক পাখ'পাখীর পাখায়-ই তো নীল আকাশের মুক্তি। কৃষ্ণের প্রেম রাধার কাছে সেই মুক্তির ডানা । রাধা আরও বলেছেন কৃষ্ণ হল তাঁর কাছে 'মীনক পানি',মাছের কাছে জল যেমন রাধার কাছে কৃষ্ণ তেমনি— জীবন মৃত্যুর আধার । এর পরেও বিদ্যাপতির রাধার অতৃপ্তি যায় না, তাঁর চূড়ান্ত জিজ্ঞাসা—

তুঁহু কৈ সে মাধব কহ তুহুঁ মোয়

কোন ব্যাখ্যায়ই তো তোমার স্বরূপ বুঝতে পারছি না। কেউ যদি একে রোমান্টিক প্রণয়ানুভূতির রহস্যময়তা বলেন তো আমরা বিবাদ করব না। কিন্তু এ যে সুগভীর ঈশ্বরানুভূতি একথা সবাইকে মানতে হবে।

বিদ্যাপতির রাধার বিরহের আর্তি নানা পদে বিশাল বিশ্বে আপনার বেদনা ছড়িয়ে দিয়েছে—

এ সখি হামারি দুঃখের নাহি ওর
সুন ভেল মন্দির, সুন ভেল নগরী
সুন ভেল দশ দিশ সুন ভেল সগরী।

কৃষ্ণ মিলনে আবার রাধার আনন্দোচ্ছ্বাস—

আজু মজু গেহ গেহ করি মানলু
আজু মজু দেহ ভেল দেহা।

এখানে আনন্দের উল্লাস আকাশ স্পর্শী। নারীর বিরহ নারীর মিলন এত গভীর হতে পারে কিনা তা নিয়ে আমরা প্রশ্ন তুলব না। বড় কবির সৃষ্টিতে মানবিক অনুভূতি কখনো কসমিক হয়ে উঠতে পারে। তবে ভক্তপ্রাণ রাধার কৃষ্ণ বিচ্ছেদ ও কৃষ্ণ মিলনের এই সুগভীর সুর শুনে তাকে আমরা ভ্রান্ত বলতে পারি না। কৃষ্ণের আগমনে রাধিকার উল্লাস প্রকাশ পেয়েছে এমন একটি কবিতা—

পিয়া জব আওব এ মজু গেহে।
মঙ্গল জতহুঁ করব নিজ দেহে।।
কনয়া কুম্ভ ভরি কুচযুগ রাখি।
দরপর ধরব কাজর দেই আঁখি।।
বেদি বানাওব হম আপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে।।

রাধা তাঁর নারী দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে কৃষ্ণের আগমনী সম্বর্ধনা জানাবে।এই বর্ণনায় তীব্র দেহ সম্ভোগের যে চিত্র ও বাসনা প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্য দিয়ে পাঠক অন্য একটি বোধের ব্যঞ্জনা লাভ করে—সমগ্র দেহ দিয়ে অস্তিত্ব দিয়ে আপনার সত্তা পরিপূর্ণ ভাবে সমর্পণ করে ঈশ্বরকে গ্রহন করা। বিদ্যাপতির কবিতায় চাটুল্য, তারুণ্য বহিরঙ্গ মাধুর্য এবং ছলা-কলার প্রাচুর্য সকলের চোখেই পড়ে। প্রেমের সেই রূপ থেকে রাধা-প্রেমের যে উত্তরণ উদ্ধৃত কবিতাগুলিতে এবং অনুরূপ আরো বহু কবিতায় দেখা যায় তাকে পরিণত মনের কবির ধর্মভাব ব্যাকুলতা বলে অনেক সমালোচক মনে করে থাকেন। খগেন্দ্রনাথ মিত্র এবং বিমান বিহারী মজুমদার সম্পাদিত 'বিদ্যাপতির পদাবলী'র ভূমিকায় বিমান বিহারী মজুমদার লিখেছেন যে কবির প্রেমদৃষ্টিতে পূর্ব পর্যায় থেকে উত্তর পর্যায়ে একটি গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছিল। উত্তর পর্যায়ের কবিতাগুলির ভাব গভীরতা অবশ্যই ভক্তিপ্রাণতা। কবির বয়োবৃদ্ধি এবং সুখ দুঃখের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের মূল কারণ।

(৩.খ). চণ্ডীদাসের পদাবলী

চণ্ডীদাসের কবি ব্যক্তিত্ব নিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কতকগুলি দুশ্ছেদ্য সমস্যা সূচিত হয়েছিল। তার পূর্ণ সমাধান আজও ঘটে নি। মোটামুটি ভাবে কাজ

চলা গোছের একটা সিদ্ধান্ত করে নিয়ে সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা এবং সমালোচকদের অগ্রসর হতে হচ্ছে। সেই সিদ্ধান্তগুলি —

১. বাশুলী পূজক বড়ু চণ্ডীদাস 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নাটগীতিটি রচনা করেছিলেন।
২. চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক প্রণয় পদাবলী লিখেছিলেন। তিনি সহজিয়া সাধক ছিলেন।
৩. বাশুলী পূজক এবং সহজিয়া চণ্ডীদাস দুজনেই চৈতন্য পূর্ববর্তী কবি।
৪. চণ্ডীদাস নাম গ্রহণ করে চৈতন্য প্রভাব যুগে আরো অনেক কবি পদবেলী লিখেছিলেন মনে হয়। তাঁরা চণ্ডীদাস নাম গ্রহণ করে পূর্বসূরীর খ্যাতির সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেতে চেয়েছিলেন। অথবা এমনও হতে পারে অন্য অনেকের কবিতা চণ্ডীদাসের নামে কালক্রমে চলে গিয়েছে। ছাপাখানা না থাকার যুগে এরকম হওয়া অসম্ভব ছিল না। কোন কোন গবেষক 'দীন চণ্ডীদাস', 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' এই সব ভনিতা দেখে যাদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন তাঁদের স্বাতন্ত্র্য আদৌ প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

আমরা চৈতন্য পূর্ববর্তী পদাবলী রচয়িতা চণ্ডীদাসের কবিতা নিয়ে আলোচনা করেছি। সম্ভবত লোকশ্রুতি যে বীরভূমের নানুরে তার আদি বাড়ী ছিল এবং রজকিনী রামী তাঁর উত্তর সাধিকা ছিলেন। তিনি নিজে ব্রাহ্মণ ছিলেন। রামীকে নিয়ে তাঁর লেখা প্রণয়মূলক বা সাধনমূলক পদের সংখ্যাও কিছু কম ছিল নয়। এখন নানুরে চণ্ডীদাস মেলায় যে বাউল সমাবেশ ঘটে তা ইঙ্গিত করে চণ্ডীদাস সত্যই হয়তো সেজ প্রেম সাধনার সাধক ছিলেন। তবে এ বিষয়ে পাথুরে প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় না। প্রসঙ্গত একটি কথা উল্লেখযোগ্য, চৈতন্যদেবের পরে যখন বৈষ্ণব পদাবলী সঙ্কলিত হতে থাকে তখন প্রথম দিকে বেশ কিছু কাল চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত পদ সেই সব সঙ্কলনে গৃহীত হয় নি। পদাবলীর চণ্ডীদাস সহজ মতের সাধক ছিলেন বলেই সম্ভবত তাঁর প্রতি সঙ্কলকদের প্রথমদিকে এরূপ বিরূপতা ছিল। অল্প কালের মধ্যে অবশ্য চণ্ডীদাস-পদাবলীর ভাব গভীরতা ও ব্যাকুল আর্তি বৈষ্ণব কীর্তনীয়াদের বশীভূত করে এবং চণ্ডীদাসের পদাবলী 'জাতে' উঠে যায়।

ধর্মমতে চণ্ডীদাস সহজপন্থী ছিলেন এইরূপ কিংবদন্তী চলে এসেছে। কাজেই এর ভিত্তিতে সত্য আছে বলে অনুমান। চণ্ডীদাসের নামে এমন কিছু পদ পাওয়া যাচ্ছে যার মধ্যে সহজ তত্ত্বের গূঢ় তাৎপর্য মাঝে মাঝে ানুভব করা যায়। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' নামক সঙ্কলনে (সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত) 'পিরীতের প্রতি' এই শিরোনামে এগারোটি পদ সঙ্কলিত আছে। এই জাতীয় শিরোনাম বৈষ্ণব পদাবলী সঙ্কলনে বড় দেখা যায় না। 'পিরিতি' শব্দটিও

চণ্ডীদাস তাঁর কবিতায় বিশেষভাবে ব্যবহার করেছেন, যার ফলে শব্দটির মধ্যে একটি নতুন ধরনের অর্থদ্যোতনা এসে গিয়েছে। উল্লিখিত কবিতাগুলি ছাড়াও,আরো বহু কবিতায় তিনি 'পিরিতি' শব্দটি হয়তো সাধারণ অর্থেই ব্যবহার করেছেন যেমন—

১. পিরীতি লাগিয়াঁ দিনু পরাণ নিছনি।
কেন বা কানুর সনে পিরীতি করিনু।

২. অবশ করিয়া কালা কানুর পিরীত।

৩. বিষম হইল কালা কানুর পিরীতি।

৪. পিরীতি দেখিয়া পড়সী করিব
তা বিনে সকলে পর।।
পিরীতি দ্বারের কবাট করিব
পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতে মজিয়া সদাই থাকিব
পিরীতে গোঙাব কাল।।
পিরীতি পালঙ্কে শয়ন করিব
পিরীতি সিথান মাথে।
পিরীতি বালিসে আলিস ত্যজিব
থাকিয়া পিরীতি সাথে।।
পিরীতি সরসে সিনান করিব
পিরীতি বসন লব।।
পিরীতি ধরম পিরীতি করম
পিরীতে পরাণ দিব।।
পিরীতি নাসার বেশর করিব
দুলিবে নয়ন কোণে।।
পিরীতি অঞ্জন লোচনে পরিব
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনে।।

বাহুল্য ভয়ে আমরা আর উদ্ধৃত করলাম না। কিন্তু উল্লিখিত এগারটি পদে তো বটেই আরো বহু পদে 'পিরীতি'র স্বরূপ ব্যাখ্যানে কবির সদৃশ কল্পনা লক্ষ্য করা যায়। এই জাতীয় অধিকাংশ পদে রাধাকৃষ্ণের নামোল্লেখও থাকে না। এগুলি কৃষ্ণের উক্তি না রাধার উক্তি তা বোঝাও যায় না। যেন স্বয়ং কবির সাধনা ও সাধ্য বস্তুর উপলব্ধি এই কবিতাগুলিতে প্রত্যক্ষত প্রকাশ পেয়েছে। দুই নরনারীর

পিরীতি থেকে — রাধাকৃষ্ণের পিরীতি থেকে — কবি পিরীতি'কে স্বতন্ত্র করে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ করে একটি ভাব বা আইডিয়া করে তুলেছেন। পিরীতি যেন একটি নির্বিকল্প প্রত্যয়। শুধু প্রত্যয় বলাই যথেষ্টনয়,এটিই কবির সাধ্য বস্তু। যেমন বৈদান্তিকের 'ব্রহ্ম'লাভ, বৌদ্ধ সহজিয়ার 'মহাসুহ' প্রাপ্তি, সেইরূপ 'সহজিয়া চন্ডীদাসের 'পিরীতি'। সহজিয়া বলেই কবির কাছে 'পিরীতি' নামক সাধ্য বস্তুটি স্বভাবজ অস্তিত্বের মত। 'পিরীতি'র মধ্যেই তাঁর অবস্থান, 'পিরীতি' নগরে তাঁর বাস, 'পিরীতি' তাঁর প্রতিবেশী, 'পিরীতি' তার বাসগৃহ—ঘরের চাল, দ্বারের কবাট, সবই 'পিরীতি'। 'পিরীতি'র ঘরে, পিরীতি'র পালঙ্কে, 'পিরীতি' বালিসে মাথা দিয়ে, 'পিরীতি' সরোবরে স্নান করে, 'পিরীতি'র বসন পড়ে তার অবস্থান। শেষ চারটি চরণে সাধক কবি হয়ে উঠেছেন সাধিকা রাধা— যদিও রাধিকাব নামটি উচ্চারিত নয়। কিন্তু এই 'পিরীতি' সাধিকা স্নানের পরে 'পিবীতি'র অঞ্জন চোখে দিয়ে 'পিরীতি'র বেশর নাকে পবেছেন।

এই কবিতাটি 'পিরীতি'ব তত্ত্বে সিদ্ধির কবিতা। সাধ্যবস্তুর প্রাপ্তির অর্থাৎ 'পিবীতি'-প্রাপ্তির নিবিড় ও অদ্বয়-প্রায় উপলব্ধি।

অন্য বহু কবিতায় যখন কবি কানুর 'পিরীতি'র জন্য রাধার ব্যাকুলতার কথা বলেন তখন ও এই তাৎপর্যটি তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে। যেমন--

না জানে পিরীতি যারা নাহি পায় তাপ।
পরবশ পিবীতি আঁধার ঘরে সাপ।।
সই পিরীতি বড়ই বিষম।
না পাই মরমী জনে কহিতে মরম।।
গৃহে গুরুগঞ্জন কুবচন জ্বালা।
কত না সহিব দুঃখ পরাধিনী বালা।।
পিরীতি বেয়াধি যদি অন্তরে সান্তাইল।
ঔষধ খাইতে তবে পরাণ জারি গেল।।

এর মধ্য দিয়ে রাধাকৃষ্ণের প্রণয় প্রসঙ্গ এবং কবির 'পিরীতি'তত্ত্ব প্রসঙ্গ এক ও অচ্ছেদ্য হয়ে ওঠে। অবশ্য কবিতার পাঠক হিসেবে আমাদের স্বীকার করতে হয় যে রাধাকৃষ্ণ প্রণয়মূলক পদগুলি তার মানবিক রূপরসের মধ্যে উক্ত পিরীতি তত্ত্বকে আত্মসাৎ করে ফেলে। অপরদিকে শুধু 'পিরীতি'ব্যাখ্যানমূলক পদগুলিতে সহজিয়া সাধ্যসাধন বোধটি প্রকট হয়। কবিতা হিসেবে এর মূল্য কিছু কম হলেও একটা রহস্যময়তা পাঠকচিত্তে অস্পষ্ট ব্যাকুলতা জাগায়।

চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত কোন কোন কবিতায় সহজ সাধনের উল্টো রীতি প্রকট হয়েছে। সর্ব শ্রেণীর সহজ সাধকেরাই জীবনের ভোগবৃত্তি জন্মমৃত্যুর চক্রাবর্তন প্রভৃতির মধ্যে লুকানো বিপরীত মুখিতাকে আয়ত্ত করতে চায়। তাদের কামচর্চাও

কামাতীত সাধনায় পর্যবসিত করতে চায়। রাধাকৃষ্ণের প্রণয় ব্যাপার পার্থিব নরনারীর দেহভাবমূলক প্রণয়ের মধ্যে বিদেহী সত্যের অনুসন্ধান। কবির ভাষায়—

১. কলঙ্ক সাগরে সিনান করিবি
এলইয়া মাথার কেশ।
নীরে না ভিজিবি জল না ছুঁইবি
দুঃখ সুখ ক্লেশ।।

২. সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি
তবে তো রসিক রাজ।
যে জন চতুব সুমেরু শিখর
সুতায় গাঁথিতে পারে।
মাকসার জালে মাতঙ্গ বাঁধিলে
এ রস মিলায়ে তারে।।

এখানে যে 'বসিকরাজ' কথাটি আছে তা বিশেষ ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন- -

> We have seen that Sahaja as the absolute reality of the nature of pure love involves within it two factors, i.e , the enjoyer,and the enjoyed,represented in the Nitya-vrindavana by Krisna and Radha.These principle of the enjoyer and the enjoyed are known in the sahajiya school as the purusa and the prakriti,manifested on earth as the male and the female.It has been in a song (ascribed to candidas) —There are two current in the lake of love,which can be realised only by the Rasika (i.e., people versed in Rasa).
>
> — Obscure Religious cults

সহজিয়া সাধক হিসেবেই যে চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণ পদাবলীতে ধর্মবোধ দানা বেঁধে আছে তা মনে করার কারণ নেই। রাধার প্রেমানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে এমন বহু সংখ্যক কবিতায় একটি নিগূঢ় ধর্মোপলব্ধি প্রকাশিত। কাব্য পাঠক হিসেবে এর মূল্যায়ন করতে গেলে আমাদের হয়তো বলতে হবে এগুলি রোমান্টিক প্রণয় কবিতা। কিন্তু এই রোমান্টিক বিশেষণে যেন অনেক কথাই বলা হয় না। চণ্ডীদাসের রাধার প্রণয়োপলব্ধি রোমান্টিকতা ছাপিয়ে আধ্যাত্মিক সৃষ্টি স্তরে গিয়ে পৌঁছয়। চণ্ডীদাস একটি পদে বলেছেন,"আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে,ভিতর দুয়ার খোলা।" রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শময় বস্তু জগৎ কবির হৃদয়ে প্রবেশের পথ পায় না। উপলব্ধির গভীরতম কেন্দ্রে বর্ণ, রেখা, রস, স্পর্শ, গন্ধ স্বধর্ম হারিয়ে উপলক্ষ হয়ে ওঠে। এই সব ইন্দ্রিয় পথের একটাই লক্ষ্য-একটা বিচিত্র অনুভূতি যার নাম কৃষ্ণ। কবির হয়ে রাধা—

এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে।।
এ ছার নাসিকা মুই যত করি বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যাম-গন্ধ।।
সে না কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কান।।
ধিক্ রহ এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব।।

ইন্দ্রিয়াতীত এই কৃষ্ণ রাধার (অথবা চণ্ডীদাসের) কামনা-বাসনা-আর্তি —আদর্শের তিল তিল সমন্বয়ের সৃষ্টি, সে রূপ নয় শুধুই নাম -মানস পুরুষ, রূপ তাকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। একটি নামের সঙ্কেতে সে অবাধ, অনন্ত; তাকে ঘিরে গভীর তৃষ্ণা আকচল হয়ে ওঠে। রাধা নাম শুনেই জপ করে, জপ করতে করতে আপনাকে হারিয়ে ফেলে—

সই কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।।
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে।।

কৃষ্ণ ধ্যানে রাধা যোগিনীর মত হয়ে যায়। তার আহার নিদ্রা বন্ধ হয়। সে বৈরাগিনীর রক্তিম গৈরিক অঙ্গে ধারণ করে—

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে,
না শুনে কাহারো কথা।।

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে,
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে,
যেমন যোগিনী পারা।।

আউলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনী,
দেখয়ে খসায়া চুলি।

হসিত বয়ানে চাহে চন্দ্র পানে,
কি কহে দু হাত তুলি'।।

এক দিঠি করি' ময়ুর-ময়ূরী-
কণ্ঠ করে নিরখনে।
চণ্ডীদাস কয়— নব পরিচয়
কালিয়া বন্ধুর সনে।।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বাউল সম্প্রদায়ের পরিধেয় বস্ত্র ঠিক গৈরিক নয়—ঈষৎ রক্তিম গৈরিক। শুধুই ধূসর বৈরাগ্য নয়, হৃদয়ের প্রণয় রক্তে রঞ্জিত ও উত্তীর্ণ গৈরিক। এই করিতায় রাধার যে অবস্থা তাকেই বলে দিব্যোন্মাদ—মানসিক পূর্বরাগ ছাড়িয়ে তা অনেক দূরে যায়।

চণ্ডীদাসের রাধার প্রণয় বিরহ নেই। কারণ রাধার অন্তরেই শ্যামচাঁদ ঘুমিয়ে আছে। ·

হিয়াব মাঝারে মোব এ ঘর মন্দির গো
রতন-পালঙ্ক বিছা আছে।
অনুরাগের তুলিকায় বিছানা হয়্যাছে গো
শ্যামচাঁদ ঘুমায়্যা রয়েছে।।

অথচ"দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাদেঁ বিচ্ছেদ ভাবিয়া" বিচ্ছেদ নেই অথচ বিচ্ছেদের ভাবনা আছে, এর মধ্য দিয়ে অবশ্যই জীবাত্মা পরমাত্মার প্রণয়-মিলন ও মিলনে বিচ্ছেদ দ্যোতিত হচ্ছে।

চণ্ডীদাসের পদাবলী চৈতন্যপূর্ব বৈষ্ণব ধর্ম-ভাবুকতার কতকগুলি উল্লেখযোগ্য দিকের স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে।

এই অধ্যায়ে আমরা পুরাণের অনুবাদ, কৃষ্ণ-লীলা মূলক আখ্যান এবং রাধাকৃষ্ণ পদাবলী অবলম্বন করে চৈতন্য-পূর্ববর্তী বাঙালী সমাজে এবং বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিফলনের স্বরূপ পর্যালোচনা করেছি। এই ধারার পরবর্তী বিকাশ চৈতন্য প্রভাব যুগে, পরবর্তী পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করব।

চতুর্থ অধ্যায়
মঙ্গল দেবদেবী এবং বাঙালীর লৌকিক ধর্ম

এক
মুখবন্ধ

বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত চারশ বছর জুড়ে রচিত হয়। যেসব দেবদেবীকে অবলম্বন করে এইসব কাব্যকাহিনীর বিস্তার তারা সবাই মিলে বাংলার নিজস্ব একটি দেবপরিমণ্ডল রচনা করেছে। এই দেব-মণ্ডলীর উৎপত্তি ও পরিণতির পেছনে দীর্ঘকালীন ইতিহাস আছে। এর শিকড় তুর্ক বিজয়ের পূর্বযুগ পর্যন্ত প্রসারিত। তবে এদের মধ্যকার মুখ্য দেবতারা চৈতন্যপ্রভাবের পূর্বেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। অবশ্য চৈতন্যধর্মের প্রভাবে তাদের উপরও কিছুটা রঙ লেগেছিল।

চৈতন্য আবির্ভাব এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সর্বব্যাপী প্রভাবের ফলে বাঙালীর ধর্ম সংস্কৃতিতে যে আলোড়ন ঘটে তা শুধুই বৈষ্ণব ভাবনাকে ও রচনাকে নয়, মঙ্গল দেব ভাবনা ও মঙ্গল কাব্যাদিকে পরোক্ষভাবে নতুন রূপ দান করে। কিন্তু মনসা, চণ্ডী, ধর্ম, শিবায়ণের শিব এবং আরো বহু সংখ্যক দেবদেবী চৈতন্য আবির্ভাবের পূর্বেই বাঙালীর ধর্মবিশ্বাসে নিজ নিজ স্থান করে নেয়। সে কারণেই আমরা চৈতন্যপ্রভাবিত বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্য আলোচনার পূর্বেই মঙ্গল দেবদেবী সংক্রান্ত এই অধ্যায়টির উপস্থাপনা করেছি তবে এই বিষয়টিকে আমরা চৈতন্য-পূর্ব এবং চৈতন্যোত্তর এই দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করব না। একটি অধ্যায়েই চারশ বছরের মঙ্গল দেবদেবীর আলোচনা নিয়ে আসব। কারণ চৈতন্য প্রভাব এঁদের ইতিহাসে একটি পরোক্ষ ও গৌণ ভাব।

দুই
বাংলার নিজস্ব পুরাণ : নিজস্ব দেবতা

বাংলা মঙ্গল কাব্যগুলিকে আমরা প্রভাব ও প্রাচুর্যের দিক থেকে তিনটি ভাগে ভাগ করব—

১. প্রধান মঙ্গলকাব্য—মঙ্গল দেবদেবী।

১.ক. মনসা—পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ পর্যন্ত বহু কাব্য রচিত হয়। দেড় শতাধিক কবির পূর্ণ বা খণ্ড পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। বঙ্গদেশের সমস্ত অঞ্চলে এবং সন্নিহিত বিহার, উড়িষ্যা, আসামে এই দেবতার পূজার প্রচলন ও সংশ্লিষ্ট মঙ্গলকাব্যের জনপ্রিয়তা বিষয়ে তথ্য মিলেছে।

১.খ. চণ্ডী—ষোড়শ শতকের শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেকগুলি কাব্যের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে।

১.গ. ধর্ম— ধর্মঠাকুরের পূজা এবং ধর্ম মঙ্গলকাব্য গঙ্গার পশ্চিম তীরে রাঢ়—অঞ্চলেই বেশী প্রচলিত। সপ্তদশ শতকের আগে লেখা কাব্য পাওয়া যায়নি।

২. মধ্যম স্তরের জনপ্রিয় মঙ্গলকাব্য।

২.ক. কালিকা— সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে রচিত কয়েকটি কালিকা মঙ্গল বিদ্যাসুন্দর পাওয়া গিয়েছে। দেবী কালীর পূজার অতি ব্যাপক প্রচলনের তুলনায় এই মঙ্গলকাব্য বিস্তার ও প্রভাবের দিক থেকে অনেক সংকীর্ণ।

২.খ. অন্নদামঙ্গল— কবি ভারতচন্দ্র রচিত একটিমাত্র কাব্য। কাব্যের গুণ যাই হোক লোকায়ত ধর্মের আশ্রয় হিসেবে দেবী অন্নপূর্ণার স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট অবস্থান বঙ্গদেশে ছিল না।

২.গ. শিবায়ণ— সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের কয়েকটি কাব্য পাওয়া গিয়েছে, সংখ্যায় খুব বেশী নয়। লোকায়ত সাধনার —নীল পূজা গাজন প্রভৃতির সঙ্গে এই সব কাব্য কাহিনীর সম্পর্ক রয়েছে।

৩. গৌণ মঙ্গল দেবতা ও কাব্য। এই শ্রেণীতে যে সব দেবতার প্রসঙ্গ আসে তারা সকলেই অঞ্চল বিশেষে সীমাবদ্ধ। রচিত কাব্যের সংখ্যা প্রতি ক্ষেত্রে দু' একটির বেশী নয়। দেবতারা একান্তভাবে আঞ্চলিক। অনেকেই লৌকিক গ্রাম দেবতার স্তর থেকে উঠে এসেছে। তবে কাব্য হিসেবে উল্লেখযোগ্য না হলেও এদের কোন কোন দেবতার পূজা সমগ্র বঙ্গদেশে প্রসারিত ছিল এবং এখনো অনেকটাই আছে। শীতলা, ষষ্ঠীর মত দেবী ছোটখাট পাঁচালী জাতীয় কাব্যের মাত্র আশ্রয় হয়ে থেকেছে। কিন্তু সারা দেশের মানুষের ভক্তি বিশ্বাস ভয় আরাধনা এঁদের সঙ্গে যুক্ত দেখা যায়। আবার বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায় একান্তভাবেই দক্ষিণ বঙ্গের ব্যাঘ্রসমাকীর্ণ অঞ্চলের পূজ্য দেবতা। কৃষ্ণরামের কাব্যটির জন্য তিনি লৌকিক গ্রাম্য দেবতার স্তর থেকে মঙ্গল কাব্যের দেবতার উচ্চতর পদমর্যাদা লাভ করেছেন। আবার সত্যনারায়ণের মত দেবতাকেও এই শ্রেণীভু ক্ত করতে হয়। হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলে জাত সত্যনারায়ণ হিন্দুর ঘরে ঘরে পূজিত হন। তিনিও একান্তভাবে একটি লৌকিক দেবতা। তাঁকে

নিয়ে পাঁচালী জাতীয় অনেকগুলি ক্ষুদ্র কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত হয়েছে। স্বয়ং ভারতচন্দ্রও একটি লিখেছেন।

আমরা মঙ্গলকাব্যের দেবপরিমণ্ডল আলোচনা করবার সময়ে সাধারণত গ্রাম দেবতাদের সতর্কভাবে বাদ দিয়েছি। যেসব গ্রামদেবতা কোন মঙ্গলকাব্যের বিষয় হয়ে উঠেছেন বা মঙ্গলকাব্য আশ্রয়ী কোন দেবতার স্বরূপ নির্মাণে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তারা আমাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্যে স্থান পাচ্ছেন। বাংলার গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছে অজস্র গ্রামদেবতা। তাঁরা শেষ পর্যন্ত শিব, চণ্ডী, কৃষ্ণ-নারায়ণের রূপভেদ হিসেবে লোকের মনে এবং পুরোহিতের মন্ত্রে স্বীকৃতি পেলেও আসলে একান্তই অব্রাহ্মণ্য-অনার্য কোটির দেবতা। মঙ্গল দেবদেবীরা মূলত এই স্তর থেকে বেড়ে উঠলেও এইসব লৌকিক গ্রামীণ দেবতারা সেই বিকাশ লাভের সুযোগ পায়নি। কোন কবির দৃষ্টিও তাঁদের উপর পড়েনি। তাই লেখা কাব্যের বিষয় হয়ে ওঠেননি, মুখে মুখে রচিত ও প্রচারিত কিছু ছড়ায় কিংবদন্তিতে তাঁদের অবস্থান। এই দেব মণ্ডলীকে নিয়ে উপযুক্ত বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা এবং বিচার বিশ্লেষণ মধ্যযুগের বাঙালীর ধর্মবিশ্বাসের পরিমণ্ডলকে পুরোপুরি চিনিয়ে দিতে সাহায্য করবে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা মধ্যযুগের লিখিত বাংলা সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত বাঙালীর ধর্মবিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। সে কারণে আমরা গ্রামদেবতা বিষয়ক প্রসঙ্গ আলোচনার বাইরে রেখেছি।

মঙ্গলকাব্যের এবং সংশ্লিষ্ট পাঁচালী জাতীয় ক্ষুদ্র রচনার সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন আখ্যান এবং তৎসংশ্লিষ্ট ধর্ম জিজ্ঞাসা বর্তমান অধ্যায়ের বিষয় নয়। সেসব প্রসঙ্গ পরবর্তী কোন অধ্যায়ে আলোচিত হবে। তবে প্রসঙ্গক্রমে একটি দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়ে পারে না যে মধ্যযুগ থেকে সারা বঙ্গদেশ জুড়ে দেবী কালীর যে প্রতিষ্ঠা তার সম্যক প্রতিফলন মঙ্গলকাব্যে ঘটেনি। কালী যে মূলত বাঙালীরই দেবী, শাক্ততন্ত্র মতে যাঁর আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা, যাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাব চৈতন্য পন্থারও প্রতিস্পর্ধী তাঁর মঙ্গলকথা মাত্র 'বিদ্যাসুন্দর' আশ্রয়ে প্রকাশ পেল এই তথ্য বিস্ময়কর। প্রভাবের সমান্তরাল প্রতিফলন যদি ঘটত অসংখ্য কালিকা মঙ্গল— কালী মহিমার আরো নানা দিকের প্রচার কবিদের রচনায় স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশ পেত। এদিকে কবিদের লক্ষ্য কেন পড়ল না তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

মধ্যযুগের কোন একটা সময় থেকে দশভুজা দুর্গা পূজারও ব্যাপক প্রচলন দেখা দেয়। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের সূচনা অংশে শিব-দুর্গা বিষয়ক কিছু সংকীর্ণ প্রসঙ্গ ছাড়া স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ দুর্গামঙ্গল কাব্য রচিত হয়নি এটি লক্ষ্য করবার মত। চণ্ডীমঙ্গলের দ্বারা দশভুজা দুর্গার মহিমা কীর্তিত হয়েছে এরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।

তিন
তুর্কবিজয়-পূর্বে

তুর্ক বিজয়ের পূর্ব থেকে সাধারণ বাঙালী সমাজে নানা দেবতার পূজা প্রচলিত ছিল। গ্রামের ঠিক বাইরে বা প্রান্তে 'থান' বলে একটি জায়গা নির্দিষ্ট থাকত। কোথাও কোথাও এই 'থান' খোলা আকাশের নীচে বা গাছের ছায়ায়। দেবমূর্তি বা দেবপ্রতীক কোথাও থাকে বা কোথাও থাকে না। সর্বত্র তার উদ্দেশ্য পশু পাখি বলি দেওয়া হত। প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণ্য বিধান অনুযায়ী এইসব পুজো ছিল নিষিদ্ধ। কিন্তু শাস্ত্রের নিষেধ অমান্য করে সাধারণ বাঙালী এই সব গ্রাম দেবতার পুজো করত। এ বিষয়ে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে বিশেষজ্ঞের মন্তব্য করেছেন—

> ব্রাহ্মণ্য বিধানে গ্রাম্য দেবতাব পূজা নিষিদ্ধ; মনু তো বারবাব এইসব দেবতার পূজারীদের পতিত্ই বলিযাছেন। কিন্তু কোন বিধান, কোন বিধি নিষেধই ইহাদের পূজা ঠেকাইয়া রাখিতে আজও পারে না, আগেও পারে নাই। ইঁহাদের কেহ কেহ ক্রমশঃ ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মে কর্মে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন, এমনও বিচিত্র নয়। শীতলা, মনসা, বন দুর্গা, ষষ্ঠী, নানা প্রকারের চণ্ডী, নরমুণ্ডমালিনী শ্মশানচারী কালী, শ্মশানচারী শিব, পর্ণশবরী, জাঙ্গুলী প্রভৃতি অনার্য গ্রাম্য দেবদেবীরা এইভাবেই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মে কর্মে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়; দুই চারি ক্ষেত্রে তাহার কিছু কিছু প্রমাণও পাওয়া যায়।

গ্রাম দেবতা ছাড়াও তৎকালীন জনসাধারণের মধ্যে নানা লৌকিক দেবদেবীর পূজা এবং উৎসব প্রচলিত ছিল। গাছ পূজা, ধ্বজা বা পশুপক্ষী লাঞ্ছিত ধ্বজা পূজা, এমন কি তৎকাল প্রচলিত ব্যবহারিক যন্ত্রের পূজা যেমন, আখমাড়াই যন্ত্র বা পশ্চাসুরের পূজা প্রচলিত ছিল। বাংলার অনার্য আদিবাসীদের মধ্যে রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি ধর্মোৎসব খুবই জনপ্রিয় ছিল। পরে এগুলির আর্যীকরণ ঘটে ছিল।

গ্রামীণ নারী সমাজে অতি প্রাচীন কাল থেকে নানাবিধ ব্রত ধর্মাচারণ হিসেবে ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। এগুলি প্রাগ আর্য ধর্ম বিশ্বাসের নিদর্শন, যার কিছু কিছু একাল পর্যন্ত চলে এসেছে। যেমন, বারি বর্ষণের জন্য গুহ্য যাদুশক্তির পূজা-পূণ্য পুকুর ব্রত, ইতু পূজা প্রজনন শক্তির পূজা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বাংলার ব্রত' বই-তে এরূপ অনেক ব্রতের চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস' বই-তে এরূপ ত্রিশটির বেশী ব্রতের ব্যাখ্যামূলক ইঙ্গিত করেছেন। তিনি পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কর্তৃক স্বীকৃত এবং পরিবর্তিত

অন্তত পঁচিশটির বেশী ব্রতের পরিচয় দিয়েছেন।

একান্ত সাধারণ বাঙালীর ধর্মাচারণ পূর্বোক্ত পূজা যাত্রা ব্রতের মধ্য দিয়ে প্রাচীন কাল থেকে প্রবাহিত হয়ে. আধুনিক কাল পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে এবং এখনো সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি। বাংলার লোকসংস্কৃতি এবং লোকসাহিত্যের চর্চায় বাঙালীর এই অতি প্রাচীন ধর্মানুষ্ঠানগুলি নানা ভাবে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। ব্রতের ছড়া (সাহিত্য), ব্রতের আলপনা (চিত্রকলা),বিভিন্ন যাত্রা উৎসব (পুরোনো নাট্যধর্মী অনুষ্ঠান), গ্রাম দেবতার মহিমা প্রচারমূলক কথিকা (সাহিত্য)— এগুলি সবই সাধারণ মানুষের সৃষ্ট শিষ্ট সাহিত্য রূপে লিখিত আকার যেমন পায়নি তেমনি অভিজাত শিল্পকলা রূপেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। আমরা এই সব ধর্মবিশ্বাস ও পূজা প্রণালীকে লিখিত বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত করে যে বিশ্লেষণ করতে পারি না তা আগেই বলা হয়েছে।

চার
তুর্কবিজয়ের ফলে

তুর্ক বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালীর ধর্ম জগতে দ্বিমুখী রূপান্তব দেখা যায় যার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১.হিন্দুধর্ম

২.ইসলামধর্ম

হিন্দু ধর্ম পূর্বেই প্রচলিত ছিল। তুর্ক বিজয় এবং ইসলামের আগমনের ফলে তার মধ্যে অতি গুরুতর পরিবর্তন দেখা দিল। তাছাড়া এদেশে বহিরাগত একটি ধর্ম ইসলাম প্রবেশ করল, প্রতিষ্ঠা লাভ করল এবং ক্রমে বিস্তার লাভ করতে লাগল। এই অবস্থায়— দুই ধর্মের সংঘাত সম্বন্ধ সম্পর্কের তথা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার কিছুটা ফলাফল আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাক্ চৈতন্য-ধর্ম সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করেছি। অন্য দিকগুলি এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

প্রথমত, তুর্ক বিজয়ের পূর্বে বাঙালী একদিকে আর্য-ব্রাহ্মণ্য-পৌরাণিক-স্মার্ত ধর্ম বিশ্বাসের অনুগামী ছিল। তার পাশাপাশি প্রায় সমান্তরালভাবে অব্রাহ্মণ্য, অপৌরাণিক, অস্মার্ত, অনার্য ধর্মাচরণের একটি অতি প্রবল ধারা বহমান ছিল। তুর্ক বিজয়ের প্রতিক্রিয়ায় এই দুই সমান্তরাল ধর্মবিশ্বাস আর পৃথক বইল না, পরস্পর পবস্পরের সঙ্গে নানা মাত্রায় ও অনুপাতে মিশে গেল। ফলে বাঙালীর একটি নিজস্ব দেব পরিমণ্ডল গড়ে উঠল। বিষ্ণু যেমন কৃষ্ণের রূপান্তরে বাঙালী প্রাণের কাছাকাছি এল, তেমনি এই কৃষ্ণের মধ্যে গ্রাম্য প্রণয়ী যুবকের একটা ভাবরূপ, গোপালক সমাজের আরাধ্য গোপালকৃষ্ণের কল্পরূপ মিশে গেল। বিষ্ণু

কৃষ্ণের এখানে আর্য পৌরাণিক স্তর থেকে অনার্য লৌকিক স্তরে নেমে এসে মিশ্রণ। আবার অরণ্যদেবী চণ্ডী ব্যাধকুলের পূজিতা, তিনি শিবপত্নী পার্বতীতে রূপান্তরিত হলেন। এখানে ঘটল দেবতার অনার্য স্তর থেকে উর্ধ্বতর পৌরাণিক স্তরে নবরূপ প্রাপ্তি। এই দ্বিমুখী রূপান্তর বাঙালী হিন্দুকে দুটি স্বতন্ত্র সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত না রেখে বহুধারা সমন্বিত একটি স্রোতে পরিণত করল। বহিরাগত ইসলামের প্রতিরোধ বাসনা এই মিশ্রণের ভেতরে কাজ করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বর্তমানে আমাদের প্রবেশ করার ইচ্ছে নেই।

দ্বিতীয়ত, পূর্বোক্ত মিলনসাধনের ফলে বাঙালী এক বিরাট দেবপরিমণ্ডল (প্যানথিয়ন অফ গডস) লাভ করল। বামায়ণ, মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণগুলির মধ্য দিয়ে সর্বভাবতীয় হিন্দুর যে আরাধ্য দেব মণ্ডলী, তার থেকে স্বতন্ত্র বাঙালী হিন্দুর একটি নিজস্ব দেবমণ্ডলী গড়ে উঠল। তাতে রইল সর্বভারতীয় পৌরাণিক অনেক দেবদেবীর পরিবর্তিত রূপ এবং অনেক লৌকিক দেবদেবীর পরিবর্তিত তথা উর্ধ্বায়িত রূপ। পূর্বে উল্লিখিত অনেক গ্রামদেবতা বা যাত্রাদি ধর্মানুষ্ঠান বা ব্রতাচরণ বাঙালী হিন্দুর ধর্ম জীবনে অংশ হয়ে রইল বটে কিন্তু এই পৌরাণিক দেবমণ্ডলী থেকে তাদের অবস্থান স্বতন্ত্রই রইল। অবশ্য কিছু গ্রামদেবতা মঙ্গল দেবদেবীর গঠন প্রক্রিয়ায় অল্পাধিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

তৃতীয়ত, বহিরাগত মুসলমানেরা এদেশের জনসাধারণের একটা অংশকে ধর্মান্তরিত করতে থাকে এবং মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাও ক্রমে বাড়তে থাকে। অল্প কালের মধ্যেই বাংলার বাইরে থেকে আসা মুসলমানদের তুলনায় ধর্মান্তরিত বাঙালী মুসলমানেরা সংখ্যায় বেড়ে যায়। মুসলমান ধর্মবিশ্বাসকে অবলম্বন করে বাঙালী মুসলমান কবিরা কাব্য লিখতে শুরু করেন এবং 'রসুল বিজয়', 'জঙ্গনামা','মুক্তাফা চরিত','মক্তুল হোসেনে'র মত ধর্মাশ্রয়ী কাব্য রচিত হতে থাকে।

চতুর্থত, বাঙালী মুসলমান কবিরা মধ্যযুগে ধর্মভাবমুক্ত কিছু রোমান্টিক আখ্যান রচনা করেছিলেন। এই কাব্যগুলিও সম্পূর্ণ ধর্মভাবমুক্ত ছিল না, অনেক সময়ে সূফী প্রেমসাধনার রূপক এদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে; 'ইউসুফ-জুলায়খা', 'লয়লা মজনু' প্রভৃতি এ জাতীয় কাব্য।

পঞ্চমত, মুসলমান সূফীরা এদেশের জনসাধারণেব মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং এদেশে প্রচলিত লোকায়ত স্তরের সহজিয়া প্রেমধর্মগুলির সঙ্গে তাদের ভাবধারার মিশ্রণ ঘটতে থাকে। এর প্রভাবও আমরা বাংলা গীতিকবিতায় লক্ষ্য করি।

ষষ্ঠত, মুসলমান ধর্মসাধনায় লোকপ্রচলিত নানা প্রবণতা প্রবেশ করতে থাকে। অন্ত্যজ শ্রেণীগুলির মধ্যে পুরনো হিন্দু বিশ্বাস এবং নব্য ইসলামিক বিশ্বাস

মিশে কিছু মিশ্র ধর্মের উদ্ভব ঘটে। সত্যপীর-সত্যনারায়ণ দেবতার কথা আগেই বলা হয়েছে। হঠযোগী নাথপন্থীদের মধ্যেও মুসলমান সাধকদের একটা ধারা নিজস্ব বিশিষ্ট স্থান তৈরী করে নেয় এ বিষয়ে আমরা পরে লক্ষ্য করব।

তুর্ক বিজয়ের ফলে বাঙালীর ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে যেসব প্রভাব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তার সূত্রাকার পরিচয় এখানে দেওয়া হল। এর মধ্যে বিশেষভাবে মঙ্গল দেবদেবী আশ্রয়ী ধর্ম সাধনার কথা আমরা এই অধ্যায়ে বলব।

পাঁচ

মঙ্গলদেবতার সাধারণগুণ

মঙ্গল দেবদেবীদের উৎপত্তি বিষয়ে আলোচনায় প্রবেশ করবার আগে সাধারণভাবে একটি কথা বলা প্রয়োজন। এই দেবদেবীরা আপামর জনসাধারণের পূজ্য। কোন দেবতার পূজা হয়তো সারা দেশব্যাপী ছিল। কোন দেবতার পূজা হয়তো অঞ্চলবিশেষে ছিল। কোন দেবতার পূজা হয়তো সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে প্রচলিত হয়েছিল। কোন দেবতার পূজা হয়তো তুলনামূলকভাবে নিম্নবর্গের জনসাধারণের ধর্মাচরণের বিষয় ছিল। কিন্তু সাধারণ ভাবে এইসব দেবদেবী বাঙালীমাত্রের ভক্তি ও বিশ্বাসের আশ্রয় ছিল। এই দেবতারা মানুষের বাস্তব জীবনের সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত ছিল। সাধকেরা ভক্তি মুক্তি লাভের জন্য এঁদের পূজা করত না। এঁদের পূজার্চনার সঙ্গে কোন গভীর আধ্যাত্মিক দার্শনিকতার সম্পর্ক ছিল না। মানুষ তাদের অভাব অভিযেগ দূর করবার জন্য একান্ত বাস্তব তুচ্ছ ও বৃহৎ সমস্যার সমাধানের জন্য এইসব দেবতার পুজো করত। আদিম মানুষ যে মনোভাব নিয়ে বৃক্ষ প্রস্তরে দেবপূজা করেছে, বৈদিক যুগে যে মনোভাব নিয়ে ইন্দ্র-বরুণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হয়েছে, মঙ্গল দেবদেবীর পুজো অর্চনার ক্ষেত্রেও এইরূপ মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। মানুষের সবচেয়ে স্বাভাবিক ধর্ম-ভাবুকতা ও দেব-কল্পনার মূলে যে মনোভাব কাজ করে থাকে এখানে তারই প্রতিফলন দেখতে পাই।

মানুষ নানা রোগ থেকে বাঁচার জন্য ধনজন লাভের জন্য, শিকারে, ব্যবসায়ে, কৃষিতে সাফল্য লাভের জন্য, এমন কি রাজা হবার জন্য এইসব দেবদেবীর পুজো করেছে এবং এইসব প্রয়োজনের উৎসে উপযোগী দেবতার কল্পনাও করে নিয়েছে। আদিতে এক এক দেবতা এক এক ধরনের উপযোগিতা নিয়ে দেখা দিলেও ক্রমে নানা ধরনের প্রয়োজন নির্বাহের দায়দায়িত্ব তাঁদের উপর অর্পিত হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী সম্পর্কে আর একটি কটাক্ষ অনেকেই করেছেন

এঁদের আচার-আচরণ সন্ত্রাসমূলক। এঁরা শক্তি প্রদর্শন করেন, যথার্থ ভক্তির সঙ্গে এদের সম্পর্ক নেই। সন্দেহ নেই এইসব দেবদেবী বিপদ নিবারণ এবং সুখ প্রদানের দেবতা। তাঁরা গুণহীন শক্তিহীন নন। তাঁদের এই শক্তিপ্রদর্শন লোকের মন আকৃষ্ট করার একটি বড় উপায়। কোন কিছু করবার শক্তি আছে বলেই মানুষ তাঁদের পুজো করে। তাঁদের প্রতি নতি না জানালে বিপদ আছে জেনে পুজো করে। অর্থাৎ ভয় এবং লোভ দুটোই এই পুজোর সঙ্গে জড়িত। কিন্তু মূল মনস্তাত্ত্বিক কারণ যদি ভয়ের এবং লোভের হয় তাহলেও তাদের পুজোর সঙ্গে এক ধরনের হৃদয়ভাবব্যাকুলতা লক্ষ্য করা যায়। তাদের ভক্তি অহৈতুকী না হলেও এও যে এক ধরনের ভক্তি সন্দেহ নেই। মানব মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় যেখানে বীর পুজোর উৎস, যেখানে প্রতিজ্ঞার জন্য বা প্রাপ্তির সম্ভাবনার জন্য কৃতজ্ঞতা বা আগাম কৃতজ্ঞতা, সেখানে এই ভক্তির অবস্থান।

মঙ্গল দেবদেবীর পূজা অর্চনার রীতিনীতি সাধারণ হিন্দু বাঙালীর পুরোহিত-তন্ত্রের অনুসরণেই ঘটে। ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্র বাঙালীর পূজাব অব্রাহ্মণ্য উৎস জাত দেবদেবীর ক্ষেত্রেও একটি ব্রাহ্মণ্য রীতির প্রলেপ দিয়ে তাকে সর্বভারতীয় হিন্দুত্বে 'শোধন' করে নিয়েছিল। সংস্কৃত মন্ত্র স্তব স্তুতি যাগযজ্ঞ পশুবলি প্রভৃতি পদ্ধতি শীতলা-ষষ্ঠী থেকে শুরু করে চণ্ডী পুজো পর্যন্ত বাঙালীর মঙ্গল দেবদেবীর ধর্মসাধনার জগৎটি গড়ে তুলেছিল। নানা লৌকিক আচরণের সঙ্গে আপোস করে একটি হিন্দু পুরোহিত আশ্রয়ী ধর্মপরিমণ্ডল তৈরী হয়েছিল।

ছয়
মনসাপূজা

মনসা পুজোর উৎস খুঁজতে গেলে তুর্কবিজয়ের পূর্ববর্তী অতি প্রাচীনকালে চলে যেতে হয় । মনে হয় চতুর্দশ শতক পর্যন্ত এই দেবীর বিবর্তন হতে সময় লেগেছে। বাঙালী সমাজে এই পরিণত রূপে তাঁর ব্যাপক প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ণাঙ্গ মনসামঙ্গল কাব্যে এই প্রতিষ্ঠাব প্রচার চতুর্দশ পঞ্চদশ শতক থেকেই আমরা লাভ করি। কানা হরি দত্ত, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, বিপ্রদাস পিপলাই এঁরা মনসামঙ্গলের প্রথম যুগের কবি। কানা হরি দত্ত সম্ভবত চতুর্দশ শতকে কাব্যটি রচনা করেছিলেন। বিজয় গুপ্ত লিখেছিলেন—

হরি দত্তের যত গীত লোপ পাইল কালে।
জোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে দলে।।

পঞ্চদশ শতকে লোপ পেলে অন্তত চতুর্দশ শতকের লেখা বলে মনে হয়। এছাড়া জোড়া গাঁথা নেই কথায় বোঝা যায় কাব্যটির ভাষাশৃঙ্খলা ছিল না। বাংলা

আখ্যানকাব্যের সেই আদিযুগে সেরকম না থাকারই কথা। সে যাই হোক চতুর্দশ শতক পর্যন্ত বিকশিত মনসা দেবীর স্বরূপ সন্ধানই আমাদের প্রথম কর্তব্য।

মনসা দেবী সাপের ভয় থেকে বাঁচান আবার তিনিই সর্পদেবী। সর্পের জননী, সর্পদের পূজ্য দেবী এবং নিজেই একটি সর্পিনী। তাঁকে বলা হয়েছে অযোনিসম্ভূতা এবং দেবলোকে পিতা শিব আপ্রাণ চেষ্টা করলেও তাঁকে স্থান দিতে পারলেন না। তাঁর মাতৃত্ব দেবলোকে স্বীকৃত নয়। তার জন্য দেবলোকে উপযুক্ত পাত্র জোটেনি, এক বৃদ্ধ ঋষিকে সংগ্রহ করে নিতে হয়েছে। সে ঋষিও তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছে। স্বামী পরিত্যক্তা মনসার সন্তান হয়েছে কতকগুলি নাগশিশু— অভিজাত দেব সমাজে অপাঙক্তেয়। মহাদেব সঙ্গে থেকেও মনসাকে দেবলোকে অবস্থিতি করাতে পারেননি। তাকে অরণ্য ঘেরা সাঁতালি পর্বতে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন— অন্ত্যজেরা যেমন শহরের বাইরে স্বতন্ত্র পল্লীতে থাকে। তাঁর সঙ্গিনী 'নেতা' মন্ত্রে তন্ত্রে যতই দক্ষ হোক বৃত্তিতে এবং বর্ণে রজক। এখানেও দেবীর অন্ত্যজ সংস্পর্শের চিহ্ন।

নরলোকে মনসার পূজা জেলে এবং দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মেয়ে মহলেও তাঁর প্রবেশ ছিল। উচ্চবর্ণের সনকা বা বেহুলা তাঁর সহজ সাধিকা কিন্তু বণিক প্রবর চাঁদ সদাগর পুজো না কবলে ব্যাপক সমাজে তাঁর পূজা প্রচলনের আশা নেই।

গল্পের এই কাঠামোর মধ্যে দেবী হিসেবে মনসার স্বরূপটি কাব্যের কবিরা অনেকখানি ধরে রেখেছেন। ইনি লৌকিক স্তরের সর্পদেবী। আর্য দেবমণ্ডলীর সঙ্গে এঁর সম্পর্ক নেই। অন্ত্যজ জনতার মধ্যেই এঁর ব্যাপক প্রতিষ্ঠা । একদিকে যেমন সাপের বিষে মৃত্যু ঘটানো এবং সাপের বিষ দূর করায় এই দেবী সাপুড়ে বেদিয়া শ্রেণীর এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রাচারের সঙ্গে জড়িত, অন্যদিকে নেতা ধোবানীর সূত্র ধরে মারণ উচাটন প্রাণগ্রহণ প্রাণদান প্রভৃতি আধা তান্ত্রিক তথ্য গুহ্য লৌকিক সাধনপ্রক্রিয়ার সঙ্গে এই দেবীটির তাত্ত্বিক যোগাযোগ। কোন কোন প্রাচীন মনসা মঙ্গলে, বিশেষত লখীন্দরের পুনর্জীবন দান প্রসঙ্গে মন্ত্রাচারের যে আয়োজন দেখা যায়—

ডাইনে ধবল নদী বামে গঙ্গাদেবী।
পদ্মাবতী মন্ত্র পড়ে শিবের পদ ভাবি।।
আরে কালকূট বিষ তোর নাম নেই।
অমৃত মন্থনে তোরে সৃজিল গোসাঞি।।
কাজল বরণ বিষ চলে যেন পাকে।
গাঙ্গের কূলে থাকিয়া ধোপাঝি ডাকে।।

গাঙ্গের কিনারা দিয়া বাহিয়া গেছে লতা।
পদ্মাবতী মৎস্য মারে খাড়ুই ধরে নেতা।।
কূলে থাকি ধোপাঝি হাসি হাড়ি যায়।
ধন্বন্তরির আজ্ঞায় বিষ ঘা মুখে আয়।।

তা একটি গুহ্য সাধন সম্প্রদায়ের দিকে ইঙ্গিত করে যারা বিষবৈদ্য থেকে বিষবেদে পর্যন্ত উচ্চ থেকে নিম্ন পর্যায়ের বিষচিকিৎসক শ্রেণীর কর্মকাণ্ডের কথা মনে করিয়ে দেয়। অনার্য দেবী মনসাকে প্রধানত অভিজাত শৈব ও শাক্তদের সঙ্গে সংঘাতের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয়। চাঁদ সদাগর শিব এবং ভবানী দুইয়ের উপাসক ছিল, কাব্যমধ্যে বারংবার সে কথার উল্লেখ দেখা যায়। অনার্য স্তর থেকে আগত মনসা একটি শক্তিদেবী সন্দেহ নেই। কিন্তু দুর্গা-চণ্ডী-অন্নপূর্ণারূপে শিবপত্নী পার্বতীর মধ্যে যে শক্তিময়ী দেবীকে বাঙালী পূজক তুর্ক বিজয়ের পরবর্তী সময় থেকেই অর্চনা করেছে তার সঙ্গে মনসার কৌলীণ্যগত পার্থক্য গোড়ায় ছিল । শিবের কন্যারূপে তাঁর পৌরাণিক আর্যদেবমণ্ডলীতে প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা কাব্যমধ্যে লক্ষ্য করা যায় তাতে আর্য-অনার্য লৌকিক-পৌরাণিক বিশ্বাসের যে জটিল মিশ্রণেব কথা আমরা আগে বলেছি তাতে সংশয় থাকে না।

মনসার উৎস আলোচনা করতে গিয়ে পণ্ডিতেরা যেসব অভিমত ব্যক্ত করেছেন তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা হচ্ছে—

১. ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর মতে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মধ্যে 'মনচা-আম্মা' নামে একটি সর্পদেবীর পূজা সেকালে সুপ্রচলিত ছিল। দ্রাবিড় দক্ষিণ ভারত থেকে এই দেবী এবং সংশ্লিষ্ট কাহিনীর এই বীজ সেন রাজাদের সঙ্গে বাংলায় এসেছে বলে তিনি মনে করেন। দেবসভায় বেহুলার নৃত্যগীত অনেকটাই দাক্ষিণাত্যের মন্দিরের দেবদাসীর নৃত্যের সদৃশ। এই তথ্যটিকে তিনি সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

২. ড. সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে'র প্রথম খণ্ডে লিখেছেন আদি দেব নিরঞ্জনের কামবাসনা উদ্ভূত সর্পরাজ্ঞী মনসার সঙ্গে পর্বতবাসিনী কুমারী বিষ বিদ্যার ও সিজবৃক্ষ পূজার সংযোগের ফলে পাঁচালী কাব্যের মনসা সৃষ্টি হইয়াছে।' তাঁর মনে এই পর্বতবাসিনী কুমারীই জাঙ্গুলি বা জাঙ্গুলিতারা মহাযানী বৌদ্ধ দেবী, ইনিই মনসাদেবীর মূল। তিনি ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রীর 'মনচা-আম্মা' তত্ত্বটিকে গুরুত্ব দিতে চাননি।

৩. অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় শাস্ত্রী মহাশয়ের 'মনচা-আম্মা' তত্ত্বটি যেমন মেনে নিয়েছেন তেমনি ড. সেনের জাঙ্গুলি সূত্রকেও অস্বীকার করেননি। তিনি 'বাঙালীর ইতিহাস' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, "সাপ প্রজনন শক্তির প্রতীক এবং মূলত কৌম সমাজের প্রজনন শক্তির পূজা হইতেই মনসা পূজার উদ্ভব এ তথ্য নিঃসন্দেহ। পৃথিবী জুড়িয়া আদিবাসী সমাজে কোন না কোন রূপে সর্প

পূজার প্রচলন ছিলই। বাংলাদেশে যেসব মনসা দেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতেই মনসা দেবীর সঙ্গে একাধিক সর্পের ক্রোড়াসীন একটি ফলের এবং কোথাও কোথাও একটি পূর্ণ ঘটের প্রতিকৃতি বিদ্যমান। ইহাদের প্রত্যেকটিই প্রজনন শক্তির প্রতীক।"

৪. 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থের লেখক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বৌদ্ধ সর্পদেবী জাঙ্গুলিকে মনসার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের 'মনচা-আম্মা' প্রসঙ্গটিকে তিনি গুরুত্ব দেননি। কিন্তু 'মুদামা' নামে অপর এক দক্ষিণ ভারতীয় সর্প দেবীর কথা বলেছেন। তাছাড়াও "জৈন ধর্ম হইতে পদ্মাবতীর ঐতিহ্যের ধারাটি আসিয়া কালক্রমে মনসার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। তাহার সঙ্গে মহাভারত হইতে জরৎকারুর কাহিনীটিও আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে।"

আমরা চারটি প্রধান মতের উল্লেখ করলাম। এঁদের সকলের বক্তব্যের মধ্যেই কিছু কিছু গ্রহণযোগ্য অংশ আছে বলে মনে হয়। এঁদের কথায় পার্থক্য যেমন আছে কিছুটা ঐক্যও আছে। এঁদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে এবং বাংলা মনসামঙ্গল কাব্যগুলি পর্যবেক্ষণ করে, এদেশে প্রচলিত মনসাপূজার রীতিপদ্ধতির কথা স্মরণ রেখে এই দেবতার উদ্ভব এবং বিশিষ্টতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটি নীচে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

প্রথমত, দক্ষিণ ভারতের কোন প্রাচীন সর্পদেবীর সঙ্গে বাংলার মনসার সাদৃশ্য থাকতে পারে কিন্তু তাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন দেখি না। এমন কি নামের উচ্চারণ-সাদৃশ্যের জন্যও নয়। সর্পপূজা নানা দেশের নানা স্তরের মানুষের মধ্যে সুপ্রচলিত। এ দেশীয় অনার্য জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত সর্পদেবীর পূজা থেকেই দক্ষিণ ভারতে বা বঙ্গদেশে মনসা কল্পনা এসেছে এরূপ মনে করাই সঙ্গত।

দ্বিতীয়, মনসার ভিত্তিতে অতি প্রাচীন সর্প টোটেম এবং সিজগাছ টোটেম থাকা সম্ভব। নীহাররঞ্জন রায় প্রজননশক্তির আদি উপাসনার উপরে যে গুরুত্ব দিয়েছেন মনসার ক্ষেত্রে সেটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। বৌদ্ধ তান্ত্রিক জাঙ্গুলিতারা দেবীটি এই সব উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। মহাভারতীয় জরৎকারু কাহিনীবিধৃত সর্পদেবীর প্রভাব থাকাও কিছু অসম্ভব নয়। এইভাবে প্রায় দেড়শ দু'শ বছর ধরে বাংলার মনসার উদ্ভব ও পরিণতি ঘটেছে।

মনসাপূজার প্রধান কারণগুলি নির্দেশ করা হচ্ছে।

১. তিনি সর্পভয় দূর করেন অর্থাৎ তিনি বিষনাশের দেবতা। চাঁদের বন্ধু বিষবৈদ্য শঙ্কর গাড়ুরি বা ধন্বন্তরি মনসার প্রতিস্পর্ধী শক্তি। শঙ্কর এবং মনসা উভয়েই সর্পাঘাতে মৃতকে বাঁচাতে পারেন।

২. মনসা সর্পাঘাতে মৃত্যু আনে—এ কারণেও তিনি পূজ্য। ভয় থেকে বাঁচবার জন্য পূজা।

৩. সাপ প্রজননশক্তির প্রতীক। পূর্ণঘট প্রজননশক্তির প্রতীক। পূর্ববঙ্গে মনসাপূজা হয় পূর্ণঘট-চিত্রে। তিনি পুত্রবর দান করেন। তিনি মৃত পুত্রকে প্রাণ দান করেন। প্রজননশক্তির এইসব প্রকাশ কাব্যের মধ্যেই ধরা পড়েছে।

৪. তিনি দরিদ্রকে ধনী করেন, বাণিজ্যে সাফল্য দেন।

৫. মুসলমান শাসকদের অবিচারের হাত থেকে তিনি অসহায় পূজকদের রক্ষা করেন। নিদর্শন— হাসান হোসেন পালা।

এইসব শক্তির সমবায়ে মধ্যযুগের বাংলায় মনসা সর্বসাধারণের — হিন্দুমাত্রের ভক্তির আশ্রয় হয়ে ওঠেন।

সাত
চণ্ডীপূজা

চৈতন্য আবির্ভাবের বহুপূর্ব থেকে আমাদের দেশে চণ্ডীপূজার প্রচলন ছিল। এ বিষয়ে চৈতন্য ভাগবতে, বৃন্দাবনদাস যেসব উক্তি করেছেন তা থেকে অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল—

১. ধর্ম কর্ম লোকে সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।।

২. প্রভুরে দেখিয়া বলে নিমাই পণ্ডিত।
করাইবা সম্পূর্ণ মঙ্গলচণ্ডীর গীত।।
গায়েন সব ভাল মুই দেখিবারে চাঁউ।।
সকল আনিয়া দিব যথা যেই পাঁউ।।

৩. দেখ এই চণ্ডী বিষহরিরে পূজিয়া ।
কে না ঘরে যায় খায় যত নাগরিয়া।।

আমরা অবশ্য আরও প্রাচীনকালে এই ধর্মের উৎস সন্ধানে যেতে চাই। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় তুর্ক বিজয় পূর্ব বঙ্গদেশে শাক্ত ধর্মের প্রবল প্রতাপের কথা তাঁর গ্রন্থ মধ্যে উল্লেখ করেছেন। দেবী দুর্গা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অষ্টভুজা দশভুজা রূপে পূজিত হতেন। তাঁর সঙ্গে চণ্ডী নামটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিল। এই দেবীকে কখনও কখনও চণ্ডী নামে যে অভিহিতি করা হত তার নিদর্শনও পাওয়া গিয়েছে। শাক্ত ধর্ম বামাচারী তন্ত্রসাধনার অঙ্গরূপে যেমন প্রচলিত ছিল তেমনি ব্রাহ্মণ্য পুরাণে শিবের শক্তিরূপে তাঁর পরিচয়ও প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু তুর্ক বিজয়ের পরবর্তী ধর্ম-দ্বন্দ্ব ও মিশ্রণের প্রক্রিয়ায় চণ্ডীদেবীর অনেক রূপান্তর হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে যে চণ্ডীকে পাচ্ছি তাঁকে এক কথায় বহুরূপী বলা চলে। পুরাতাত্ত্বিক সব সূত্রগুলি এখনে মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছে এরূপ কথা বলা

যায় না, অনেকটা মিশ্রণ, বলা যায় পাশাপাশি অবস্থান সতর্ক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে।

আধুনিক পণ্ডিতেরা চণ্ডীর উৎস সন্ধান করতে গিয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন। তার মধ্যেকার প্রধান চিন্তাধারাগুলি এখানে উদ্ধৃত করছি—

১. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর বিখ্যাত 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে প্রচুর তথ্যের উল্লেখ করে এই দেবীর পৌরাণিক উৎসের কথা অস্বীকার করেছেন। বাঙালী এবং বাংলার সন্নিহিত অঞ্চলের নানা অনার্য জাতি চণ্ডীর ন্যায় নানা লৌকিক দেবতার পুজো করত অতি প্রাচীনকাল থেকে। "ওঁরাও ওদের মধ্যে শিকার ও যুদ্ধের দেবী হিসেবে চণ্ডী ছিলেন বিশেষ পরিচিতা। তাঁর মতে কালকেতুর কাহিনীতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এই চণ্ডী প্রকৃতই পশুকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং ব্যাধ জাতির আরাধ্যা । কিন্তু ধনপতির গল্পে চণ্ডীর সঙ্গে ব্যাধ কিংবা পশুকুলের সংশ্রব নেই। এখানে তিনি যোষিতা মিষ্ট দেবতা, তিনি এখানে প্রধানত হারান জিনিস ফিরিয়া পাইবার দেবতা, কালকেতু ব্যাধের কাহিনীর চণ্ডীর যেমন একটি আরণ্যক পরিচয় আছে, ধনপতি সদাগর চণ্ডীর তেমনই গার্হস্থ্য পরিচয় আছে।"

২. মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীদেবীকে যাঁরা পৌরাণিক তান্ত্রিক দেবপরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত বলতে চান, তাঁরা পুরাণ বর্ণিত বিভিন্ন নারী দেবতা, হিন্দু তন্ত্রে বর্ণিত নানা দেবদেবী এবং বৌদ্ধতন্ত্রে উল্লিখিত কোন কোন দেবীর সঙ্গে এর সাদৃশ্য দেখেছেন। দ্বিজ মাধব কৃত 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' কাব্যটির ভূমিকায় সম্পাদক সুধীভূষণ ভট্টাচার্য এই মতের পরিপোষণ করে লিখেছেন, "সরস্বতী মূর্তির কাঠামোর উপর যথাক্রমে মহিষমর্দিনী লক্ষ্মী ও উমা মূর্তির প্রলেপ দিয়া মঙ্গলচণ্ডীর প্রতিমা নির্মিত হইয়াছে ইহাই আমাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। ....অন্তত পক্ষে দশম একাদশ শতক হইতে পৌরাণিক দেবী রূপেই মঙ্গলচণ্ডীর পূজা এদেশে চলিয়া আসিতেছে এবং মঙ্গলচণ্ডীর কবিগণ এই দেবীর পরিকল্পনার জন্য পুরাণের নিকটেই ঋণী ছিলেন। তাঁহারা কোন অপৌরাণিক জগৎ হইতে মঙ্গলচণ্ডী গ্রহণ করেন নাই।"

৩. ড. সুকুমার সেনের বক্তব্যের সঙ্গে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মিল দেখা যায়। তিনি 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' ১ম খণ্ডে লিখেছেন "দুটি কাহিনীরই দেবী কান্তারবাসিনী দুর্গা, তবে একটু তফাৎ আছে। কালকেতু ফুল্লরা কাহিনীর মঙ্গলচণ্ডী বন্য পশুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। গোধিকা তাহার বাহন এবং প্রতীক। ধনপতি খুল্লনার চণ্ডীমঙ্গল গৃহপশুপালিনী দেবী। তাঁহার পূজার প্রতীক ঘট বা ঝারি এবং উপকরণ আটগাছি দুর্বা ও আটটি ধান। ইনি হারানো পাওয়ার দেবতা। খুল্লনা প্রথমে ইহাকে পূজা করিয়া হারানো ছাগল পাইয়াছিল পরে পতিপুত্র।"

মঙ্গলকাব্যে চণ্ডীদেবীর উৎসে যে লৌকিক ধর্মবিশ্বাস এবং মেয়েলি ব্রত পূজা গভীরভাবে সক্রিয় ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। বাংলার মেয়েমহলে যুগযুগান্তর ধরে প্রচলিত অসংখ্য ব্রত চণ্ডীর নামের সঙ্গে জড়িত। যেমন, নাটাইচণ্ডী, ঘোর চণ্ডী, উড়ন চণ্ডী, কুলুই চণ্ডী, শুভ চণ্ডী বা সুবচনী, কড়াই চণ্ডী, ওলাই চণ্ডী, ঢোলাই চণ্ডী, সঙ্কটামঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি। এইসব লৌকিক গ্রাম্য দেবী নামে চণ্ডী হলেও মার্কণ্ডেয় চণ্ডী পুরাণের অশুর বিনাশিনী দেবী চণ্ডীর সঙ্গে মূলত অভিন্ন ছিলেন না। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের সঙ্গে কালকেতু এবং ধনপতির কাহিনী দুটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়লেও এই কাহিনী দুটির সাক্ষ্যে স্বীকার করা যায় না যে এরা এক দেবী। ইনি যে গোধিকা টোটেম দেবী তাতেও সন্দেহ নেই। চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডীও এক স্বর্ণকান্তি গোধিকা। তাতে দেখা যায়—

১. গোধিকার রূপ ধারণ করেই চণ্ডী কালকেতুর গৃহে প্রবেশ করেছেন। গোধিকা কালকেতুর ভোজ্য এবং দেখা যাচ্ছে শেষপর্যন্ত পূজ্যও বটে। টোটেম তত্ত্বের একটি মূল সূত্রই এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

২. ইনি পশুকুলের দেবী অর্থাৎ শিকারীদের আরাধ্যা দেবী ও আরণ্য পশুদের সংরক্ষণের কর্ত্রী, তেমনি শিকারে সাফল্য অসাফল্য এঁরই ইচ্ছার অধীন।

৩. অন্ত্যজ ব্যাধ জাতির ইনি আরাধ্যা দেবী।

৪. ইনি ধনদাত্রী। এরই কৃপায় ব্যাধ রাজা হয় এবং এরই নির্দেশে মানুষ বন কেটে নগর বসায়।

৫. গোধিকা থেকে সুন্দরী অভিজাত রমণীতে এবং অভিজাত রমণী থেকে মহিষমর্দিনী দুর্গায় রূপান্তর কালকেতু ফুল্লরা প্রত্যক্ষ করেছে। এর মধ্যে দেবীর লীলা কাজ করলেও অনার্য অরণ্যদেবীর পৌরাণিক দেবমণ্ডলীতে উত্থান লক্ষ্য করা যায়।

৬. ধনপতি কাহিনীর চণ্ডীও পশুপালিকা দেবী তবে ঠিক বনদেবী নন, গৃহপালিত পশুর রক্ষাকর্ত্রী। তিনি হারিয়ে যাওয়া দ্রব্যাদি পশুপ্রাণী ইত্যাদি পাইয়ে দেন। বলা যায় পুরোপুরি মেয়েলি ব্রতের দেবী।

৭. লক্ষ্য করার তিনি উচ্চ অভিজাতদের পূজিত নন। ডাকিনী দেবী বলে ধনপতি চণ্ডীর নিন্দা করেছে। খুল্লনা এই দেবীকে ঘটে পুজো করেছে মূর্তিতে নয় এবং ধনপতি সেই ঘট পায়ে ঠেলেছে।

৮. গজলক্ষ্মী একটি অর্ধ পৌরাণিক পরিকল্পনা । এর মধ্যে, দেবীর গজভক্ষণ ও উদ্গিরণের মধ্যে প্রলয় ও সৃষ্টির রূপক থাকলেও তাকে প্রাচীন পৌরাণিক দেবমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, বরং হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রের সঙ্গে কিঞ্চিৎ সম্পর্ক যুক্ত বলে মনে হয়—যদিও তার সঙ্গে মিলেছে অনেকখানি লৌকিক কল্পনা।

৯. মশান থেকে ডাকিনী যোগিনী ভূত প্রেতাদি সঙ্গে করে চামুণ্ডা রূপিনী

দেবীর শ্রীমন্তকে রক্ষা করার মধ্যে পৌরাণিক ও লৌকিক কল্পনার সমন্বয় ঘটেছে। কালিকা মঙ্গল কাব্যগুলিতে সুন্দরের রক্ষায় কালিকার এই রূপ ভূমিকা চিত্রিত।

মোট কথা বাঙালী হিন্দুর দেবী ভাবনার চূড়ান্ত রূপ পার্বতী, দুর্গা এবং কালী। এই পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ভাব কল্পনাটি শেষ পর্যন্ত আরোপিত হলেও লৌকিক অনার্য উৎস তাতে ঢাকা পড়েনি।

আট
ধর্মপূজা

ধর্মঠাকুরের পূজা বিশেষ করে রাঢ়বঙ্গের অতি প্রাচীন লৌকিক ধর্মানুষ্ঠান। তুর্কি বিজয়ের অনেককাল আগে থেকে এই দেবতার পূজার জড় বঙ্গীয় লোকসমাজে ছড়িয়ে ছিল এবং একথাও নিশ্চিত যে ধর্মদেবতার সুনির্দিষ্ট রূপ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগে মোটামুটি সুস্থিত হয়ে গিয়েছিল। মনে হয় ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রথম কবিবা এই সময়েই তাঁদেব কাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু রামাই পণ্ডিত, ময়ূর ভট্ট প্রভৃতি যাঁদের নামে প্রচলিত ধর্মপূজাবিধি ও ধর্মমঙ্গল কাব্য মুদ্রিত হয়েছে সেগুলির কোনটাই চৈতন-পূর্ব কালের লেখা নয় বলে পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন। ধর্মমঙ্গলের যে সব কবির রচনা পুরানো তার কোনটিকে সপ্তদশ শতাব্দীব আগে নিয়ে যাওয়া যায় না তাই বলে এরূপ মনে কবার কারণ নেই যে এই দেবতার পূজা চৈতন্য পরবর্তীকালের ব্যাপার।

অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস' আদি পর্বে ধর্মপূজা বিষয়ক যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে তুর্ক বিজয়ের আগেই এই দেবতা নিজ রূপে বঙ্গসমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ধর্ম ঠাকুরকে বৌদ্ধ দেবতা বলে মত প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-দেবতা'। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনও এই মতের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালের পণ্ডিতেরা এই মত খণ্ডন করেছেন। ড. সুকুমার সেন, ড. নীহাররঞ্জন রায়, ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য অন্য নানা বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন কথা বললেও ধর্মঠাকুর যে মূলত বৌদ্ধ দেবতা নয় সে বিষয়ে এক মত হয়েছেন। ড আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' থেকে তাঁর সুচিন্তিত মতামতের কতকাংশ উদ্ধার করছি। —

'অতি প্রাচীনকাল হইতেই পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত রাঢ় বলিয়া পরিচিত অঞ্চলে ডোম নামক জাতি সুসংহত সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিত। তাহারা এক অতি প্রাচীন পদ্ধতিতে সূর্যদেবতার উপাসনা করিত, তাহাদের মতে সূর্যদেবতা শ্বেতবর্ণ বলিয়া পরিকল্পিত হইত এবং সেই দেবতাকে তাহারা শ্বেতবর্ণের পশু বলি দিয়া

তুষ্ট করিত। ইনি তাহাদের সর্বোত্তম দেবতা (supreme God) ছিলেন। ক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দুগণ সেই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়া সেই দেবতার মধ্যে নিজেদের ধর্মের কিছু কিছু উপাদান মিশ্রিত করিয়া দিয়া তাঁহাকে নিজেদের বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের পরিকল্পনায় এই দেবতার মৌলিক আদিম উপাদানগুলি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইল না। এই ভাবে ডোম জাতির সর্বোত্তম দেবতা সূর্য, বৌদ্ধ নিরঞ্জন ও হিন্দু বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কল্পিত হইলেন।"

ধর্মঠাকুরের রূপ নিয়ে আলোচনা করলে কয়েকটি বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১. এই দেবতার মূলে অবশ্যই সূর্য দেবতার অস্তিত্ব ছিল। ধর্ম ক্রুদ্ধ হলে কুষ্ঠ রোগ হয়। কুষ্ঠ ব্যাধি সূর্য দেবতার অভিশাপের ফল বলে অনেকের বিশ্বাস ছিল। ধর্ম দেবতাকে খুশী করতে পারলে সূর্য পশ্চিমে ওঠে। রঞ্জাবতী শালে ভর দিলে সতী রমণীর আত্মহত্যার পাপ সূর্যকে আচ্ছন্ন করেছিল। সূর্যের ঘোড়া ধর্মভক্ত লাউসেনের সাহায্যের জন্য মর্ত্যে জন্ম গ্রহণ করে। এই তথ্যগুলো দিয়ে বোঝা যায় সূর্য ও ধর্ম কোন একটা স্তরে এক হয়ে মিলে আছে।

২. বাংলায় তুর্ক বিজয়ের পূর্বকাল থেকে ডোম সৈন্যদের গৌরবময় ইতিহাস ছিল। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি যে ডোম সৈন্যদের বীরত্বগাথা তাতে সন্দেহ নেই। লাউসেনের পক্ষে এবং বিপক্ষে সেনাপতিরা ছিলেন ডোম। ধর্মঠাকুরের মূলে প্রাচীন ডোমদের কোন রণদেবতার বীজ থাকা সম্ভব।

৩. অনেক পণ্ডিত মনে করেন লৌকিক সূর্যদেবতার সঙ্গে বৈদিক বরুণ এবং বৈদিক সূর্যদেবতার কল্পনা কোথাও কোথাও মিলে গিয়েছে। অনেকে মনে করেন বুটপরা ইরানি মিহিরের প্রভাবও এক্ষেত্রে কাজ করেছে।

৪. ধর্মঠাকুর নানা গ্রামে নানা নামে পূজিত হন। এই দেখে মনে হয় নানা গ্রামদেবতা সুযোগ সুবিধা মত ধর্মঠাকুর কল্পনার সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

৫. মূর্তি ছাড়াই একখণ্ড প্রস্তরে বহু স্থানে ধর্মের পূজা হয়। এ থেকে মনে করা হয়েছে যে আদিম প্রস্তর উপাসনা ও ধর্মপূজা পরস্পর সংশ্লিষ্ট।

৬. ধর্মঠাকুরের পুজো করেই রঞ্জাবতী লাউসেনকে পুত্ররূপে লাভ করেছে। এর দ্বারা অনুমান করা যায় আদিম প্রজননশক্তির পূজাও এক্ষেত্রে কিছুটা সক্রিয় ছিল।

৭. ধর্মঠাকুরের দেবরূপ পূর্ণ হয়ে ওঠে পৌরাণিক হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। লৌকিক দেবতাটি বৌদ্ধদের প্রভাবে বুদ্ধ-নিরঞ্জন বা ধর্ম-নিরঞ্জন হয়ে ওঠে । অন্যদিকে তুর্ক বিজয়ের পরবর্তী পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রভাব বিস্তারের কালে ধর্মঠাকুর কখনো বিষ্ণু কখনো শিবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান।

৮. তুর্ক বিজয়ের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় ধর্মকে কল্কি অবতারের সঙ্গে এক করে

ফেলা হয়। রামাই পণ্ডিতের নামে প্রচলিত 'নিরঞ্জনের রুখ্মা' নামক কবিতাটির কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে—

ধর্ম হইল যবন রূপী   মাথায়েত কালা টুপী
হাতে শোভে তিরুচ কামান।

কবির কল্পনায় কল্কি অবতার এক মুসলমান ধর্ম যোদ্ধায় রূপান্তরিত।

সর্বশেষে একটি বক্তব্য এই যে এত রকম মিশ্রণ সত্ত্বেও ধর্মঠাকুর শেষপর্যন্ত আপামর বাঙালীর পূজা ও সাধন ক্ষেত্রে মনসা বা চণ্ডীর মত পৌরাণিক দেবতা বলে গৃহীত হননি। তাঁর প্রচলনও রাঢ় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থেকেছে, সমগ্র বাংলায় বিস্তৃত হয়নি। ক্বচিৎ কোথাও ধর্মঠাকুর শিব বা বিষ্ণুতে রূপান্তরিত হয়েছেন সেখানে অবশ্য ব্রাহ্মণ পুরোহিতই পুজো করে। অন্যত্র ধর্ম পূজার প্রধান অধিকারী ডোমেরা। আজকাল কোথাও কোথাও কৈবর্ত, শুঁড়ি, বাগদি, ধোপা এরাও ধর্ম পণ্ডিত বা ধর্মপুজোর পুরোহিতের কাজ করে। ধর্মঠাকুরের আসল প্রতীক পাদুকা চিহ্ন। ধর্ম পুজোর পুরোহিতেরা তাদের গলায় ঝুলিয়ে রাখেন একখণ্ড পাদুকা বা পাদুকার মালা। স্তূপীকৃত পিষ্টক আর প্রচুর মদ্য দিয়ে পুজো হয়, 'মদ্যের পুষ্করণী দিব পিষ্টের জাঙ্গাল।' ধর্মের গাজনের নাচে মৃতদেহ ও নরমুণ্ড থাকে। ধর্মঠাকুর শূন্য মূর্তি, তাঁর কোন প্রতিমা হয় না। তাঁর বাহন সাদা পেঁচা বা সাদা কাক। ধর্মপুজো বেশির ভাগই হয় থানে—মন্দিরে নয়, যেমন আর পাঁচটি গ্রাম দেবতার হয়। সেখানে যে প্রতীকে (লক্ষণীয়, মূর্তিতে নয়) ধর্মের পুজো করা হয় তা একটা কচ্ছপের মত দেখতে প্রস্তর খণ্ড, তার উপরে পাদুকাচিহ্ন আঁকা। এগুলো নিঃশংশয়ে অনার্য পরিচয়টি ধরিযে দেয়।

ধর্মমঙ্গলের এক প্রাচীন কবি রূপরামের কাব্যে দেখা যায় কবির কাছে ধর্মঠাকুর আবির্ভূত হবার পূর্বমুহূর্তে দুটি বিরাট বাঘ এসে উপস্থিত হয়েছিল। বাঘের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের সম্পর্কটি কি তা অন্য কোথাও বিশ্লেষিত হয়নি। এই কবি বলেছেন—

একে শনিবার তায় ঠিক দুপুর বেলা।
সম্মুখে দাঁড়াইল ধর্ম গলে চন্দ্রমালা।।

ধর্মঠাকুরের এই মানুষী মূর্তিরও অন্য কোন হদিস কাব্য মধ্যে পাওয়া যায় না। দর্মমঙ্গল কাব্য মধ্যে কানাড়া লাউসেন দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে শিব ও ধর্মকে এক করে ফেলা হয়েছে। তাছাড়া শিবের গাজনের মতই ধর্মের গাজন হয়। এইসব মিলে ধর্মঠাকুর বাঙালীর ধর্মচেতনার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট, বলা যায় অভিনব স্থান জুড়ে রয়েছে।

নয়
বাংলার শিব-পূজা

পৌরাণিক দেবপরিমণ্ডলে বিচিত্র নামে ও রূপে শিবের অবস্থান। পৌরাণিক যুগেই আর্য এবং অনার্য বিশ্বাস ও পূজার মিশ্রর এই দেবতার রূপ নির্ণয়ে সাহায্য করেছিল। একদিকে বৈদিক রুদ্রদেবতা অন্যদিকে অনার্য সংস্কার জাত নানা দেবতার নানা বৈশিষ্ট এই দেবতার বিবর্তনে ক্রমে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে।

বৈদিক রুদ্র প্রচণ্ড পলয়শক্তির দেবতা। তবে দেবমণ্ডলীব মধ্যে তাঁর স্থান যে সর্বাগ্রে ছিল এমন নয়। পৌরাণিক দেব পরিমণ্ডলে তিনি শান্ত হয়েছেন, কখনো প্রলয়ড নৃত্যে পটরাজ রূপে কল্পিত হলেও তিনি যোগ স্বপ্নে সন্তুষ্ট আশুতোষ শিবরূপে ভক্তদের কাছে পুজিত হয়েছেন। তাঁব ধ্যানমগ্ন রূপের পরিকল্পনা খুব প্রাচীন। শিব-পার্বতীর যুগ্মরূপ যেমন অতি প্রাচীন কাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে তেমনি ধ্যাননিবত যোগী মূর্তিও অতীত কাল থেকে প্রস্তর উৎকীর্ণ প্রতিমা রূপে মন্দিরে পুজিত হয়েছে। এই ধ্যান স্তব্ধ মূর্তিটি ধ্যানী বুদ্ধের প্রভাবে পড়ে উঠেছিল বলে অনেক পুরাতাত্ত্বিক পণ্ডিত মনে করেন।

শিবের মহিমা রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণগুলির মধ্য দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত। শিব-পুরাণ, শাক্ত পুরাণ উভয়ত শিবের মহিমা প্রচার মূলক অনেক কাহিনী পাওয়া যায়। মহাকবি কালিদাস তাঁর 'কুমার-সম্ভব' কাব্যে যোগী শিব এবং গৃহস্থের আদর্শ দেবতা পার্বতীর সঙ্গে যুগনদ্ধ শিবের যে বিবরণ দিয়েছেন তার মহিমা উচ্চকোটিতে বিশেষভাবে স্বীকৃত। পৈরাণিক যুগে শিব প্রধান তিন দেবতার অন্যতমরূপে স্বীকৃত। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মধ্যে শিব হলেন প্রলয়ের দেবতা। কিন্তু পৌরাণিক যুগের পুর্বেই শিব দেবতার পূর্ণ বিকশিত রূপের মধ্যে আর্য় এবং অনার্য উভয়বিধ কল্পনার সংযোগ ঘটেছিল। দক্ষযজ্ঞের কাহিনীটি এ প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে। দক্ষপ্রজাপতি দেবকুলে সর্বমান্য। কন্যা সতী শিবকে বিবাহ করলেও দক্ষ শ্মশানচারী ভূতসেবক এই দেবতাকে জামাইরূপে গ্রহণ করতে রাজী নন। সে কারণে যজ্ঞে তাঁকে আমন্ত্রণ জানান না। শেষপর্যন্ত শিবনিন্দা শুনে সতী যজ্ঞস্তানে প্রাণত্যাগ করেন। শিবের ভূতপ্রেতদের তাণ্ডবে যজ্ঞ পণ্ড হয়। এই কাহিনীর মধ্যে অনার্য দেবতা শিবের আর্য দেবমণ্ডলীতে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য কি ধরনের সংঘাত মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল তার রূপকাশ্রিত আভাস পাওয়া যায়। মহাভারতেও দেখি সুমদ্রমন্থনে যেসব ঐশ্বর্য পাওয়া গিয়েছিল অমৃতসহ সে সব ঐশ্বর্য অন্য দেবতারা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়। বঞ্চিত শিবের ভাগে শেষপর্যন্ত হলাহল জোটে। এই কাহিনীও ইঙ্গিত করে প্রতিষ্ঠিত দেবমণ্ডলীতে বহিরাগত শিবের প্রবেশ বিলম্বিত হয়েছিল।

বিভিন্ন পুরাণে শিবের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। আর্য দেবমণ্ডলীর শীর্ষে বিষ্ণুর সঙ্গেই প্রায় তাঁর আসন। শিব এবং বিষ্ণু পরস্পর পরস্পরকে পূজ্য দেবতা বলে জ্ঞান্য করতেন। কিন্তু পাশাপাশি এটিও লক্ষণীয় যে ভদ্র অভিজাত আর্য দেবতার বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি শিবের মধ্যে কতগুলে অনার্য অন্ত্যজ স্তরের বৈশিষ্ট্য পুরাণকারেরা প্রকাশ করিয়েছেন। তিনি শ্মাশন-শ্মাশানে বাস করেন। তাঁর সর্বদেহ ভস্মে আচ্ছাদিত। সাপ তাঁর ভূষণ, বাঘ বা হাতির চামড়া তাঁর পরিধেয়, ভূতপ্রেত তাঁর নিত্য সঙ্গী। এমন কি ভূতপ্রেত নিয়ে তিনি আর্য যজ্ঞও পণ্ড করেন। পুরাণে বারবার তাঁকে বলা হয়েছে কামাচারী। ঋষি বধুদের তিনি প্রলুব্ধ করেন, কখনো কখনো তিনি নগ্ন হয়ে বিচরণ করেন। এর পাশাপাশি বিশিষ্ট [illegible] দেবসুলভ গুণ ও উচ্চ আধ্যাত্মিক গৌরব নানারূপ ব্যাখ্যার দ্বারা আরোপ করে [illegible] স্বভাব বৈশিষ্ট্য ঢেকে দেবার চেষ্টাও আছে। তিনি জিতেন্দ্রিয় যোগী এবং যজ্ঞ আত্মা বলেই না নি তাঁর নগ্নতা এবং কামাচারে যথার্থ কোন দোষ নেই। তিনি সর্বত্যাগী বলেই শ্মাশানবাসী। তিনি মহা প্রলয়ের দেবতা বলেই ভূতনাথ। এই সব ব্যাখ্যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আর্য ব্যতিরিক্ত অন্যবিধ উৎস থেকে এই [illegible] আর্য মণ্ডলীতে গৃহীত হয়েছে। বিবিধ লৌকিক ও আঞ্চলিক মানবিক বৈশিষ্ট এবং বিভিন্ন কৌমসমাজে প্রচলিত লৌকিক আচার আচরণের তথা ধর্মীয় বিশ্বাসের পুঞ্জীভূত বিগ্রহ এই শিব পৌরাণিক যুগে দীর্ঘ সময় ধরে ধীরে ধীরে আর্য দেবমণ্ডলীতে নিজের স্থান করে নিয়েছিল।

শিশ্ন উপাসনা বা লিঙ্গপুজা অতি প্রাচীন প্রজননশক্তির পূজা। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই নানা আকারে এর প্রচলন। ভারতের পৌরাণিক যুগের কোন একটা স্তরে এই আদিম লিঙ্গপুজা শিব পূজার সঙ্গে সম্পর্কিত হয। বিষ্ণু যেমন শালগ্রাম শিলারূপে অখণ্ড মণ্ডলাকারং—অসীমের দ্যোতনা আনেন, শিব তেমনি লিঙ্গপ্রতীকে শুধু জনবৃদ্ধি নয় যাবতীয় মানবিক ও সামাজিক প্রয়োজনে বহুগুণিত করবার প্রতীক রূপে গৃহীত হয়ে থাকেন। শিব-পার্বতী — নরনারীর যুগ্মরূপের আদি প্রতিমা। এক্ষেত্রেও যোনি পীঠে আবদ্ধ লিঙ্গের ব্যাপক প্রতিষ্ঠা ও পুজা শিব-পার্বতীর যুগ্মরূপের প্রতীক হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত।

শিবের শ্বেতবর্ণ দেহ, কৈলাস নিবাস এই দুটির ইঙ্গিত করে হিমালয়ের ওপারে তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে আদিতে এই দেবকল্পনার কিছু সসম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক। তাছাড়াও শিবকে বুদ্ধের মত ধ্যানীরূপে কল্পনা করাও ইঙ্গিত করে হিমালয় অঞ্চল থেকেই এই দেবতা গাঙ্গেয় উপত্যাকার দিকে ক্রমে প্রভাব বিস্তার করেন।

শিবের রূপের এই ক্রমবিকাশ সবই একটি সর্বভারতীয় ব্যাপর এবং প্রধান প্রধান পুরাণ ও উপপুরাণগুলি রচিত হবার সময়ে অর্থাৎ ভারতের তুর্ক প্রভাব

বিস্তৃত হবার অগেই সুপ্রতিষ্ঠিত। বঙ্গদেশে শিব পুজার প্রসার তুর্ক বিজয়ের আগেই ঘটেছিল। বৈষ্ণব ধর্মের মত অতটা প্রসারিত না হলেও পৌরাণিক শৈব ধর্ম পঞ্চম শতক থেকেই যে বাংলায় প্রচলিত হয়েছিল তার নিদর্শন মেলে। লিঙ্গরূপে এবং প্রতিমারূপে তার পুজার সূচনা দেখা যায়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বঙ্গরাজ শশাঙ্কের মুদ্রায় মহাদেবের এবং নন্দী বা বৃষের প্রতিচ্ছবি আছে। পাহাড়পুরের ফলকেও শৈব ধর্মের নানা চিহ্ন বর্তমান। অবশ্য শিবের যে বিশিষ্ট প্রতিমা একাল পর্যন্ত সুপ্রচলিত তা পূর্ণরূপ লাভ করে পাল ও সেন পর্বে।

তুর্ক বিজয় পরবর্তী মধ্যযুগের বাংলায় শিব যেমন পৌরাণিক সব বৈশিষ্ট নিয়ে উপস্থিত তেমনি বঙ্গদেশীয় কতকগুলি নবীন প্রত্যয় তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। বাংলায় লিখিত কাব্যে শিবকে পাওয়া যায় এই রচনাগুলিতে —

১. নাথপন্থী কাহিনীগুলিতে

২. মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলে

৩. শিবায়ন কাব্যে

৪. উমা-মেনকা বিষয়ক আগমনী বিজয়া গানে। এছাড়া মৌখিক কবিতায় শিব-পার্বতী বিষয়ক অনেক ছড়া পরবর্তী গবেষকদের সঙ্গলনে ধরা পড়েছে। শিবের গাজনগান বহুল প্রচলিত একটি লোকিক প্রসঙ্গ। এছাড়া শিব চতুর্দশী ব্রত কথায় শিবের যে মহিমা প্রচারের ব্যাপরটি আছে তা কখনো কখনো লিখিত কবিতার আকারে ধরা রয়েছে — তার মৌখিক রচনা হিসেবেও তার প্রচলন বেশী।

মঙ্গলকাব্যে কখনো কখনো সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক একটি 'মিথ' সংযোজিত থাকে। তাতে আদিবেদ নামে বিশ্বসৃষ্টির কারণ একটি, সৃষ্টি-রহস্যভেদকারী দেবকল্পনা লক্ষ্য করা যায়। যখন কোথাও কোনরূপ কোন চিহ্ন ছিল না, কোন আলো কিংবা কোন অন্ধকার ছিল না, তখন আদিদেব সৃষ্টির বাসনায় আদিদেবী বা আদ্যাপ্রকৃতিকে সৃষ্টি করলেন এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশ্বসৃষ্টি-প্রজাসৃষ্টি করলেন। এই আদি দেব কে? ব্রহ্মা? বিষ্ণু? মহেশ্বর? যদিও হিন্দু পুরাণ মতে ব্রহ্মাই প্রজা সৃষ্টি করেন, কিন্তু প্রলয় পয়োধিজলে অনন্ত শয়ন বিষ্ণুর নাভিমূল থেকে তার উদ্ভব। মঙ্গলকাব্যের আদিদেব এবং আদিদেবীর বর্ণনা শুনে বুঝবার উপায় নেই এরা শিব-পার্বতী অথবা বিষ্ণু শক্তি? কোন কোন ধর্মমঙ্গলে যেমন রূপরাম বা খেলারাম আদিদেব নিরুজন বলে উক্ত দেবতার উল্লেখ করা হয়েছে। এই আদিদেব নিরঞ্জন এবং আদ্যাপ্রকৃতির সংযোগের ফলে তিনটি প্রথম দেবতার উদ্ভব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। তাঁরা আদিপ্রকৃতির গর্ভজাত। তারা বালুকা নদীর তীরে যখন তপস্যারত তখন আদিদেব নিরঞ্জন শব মুর্তিতে তাঁদের সামনে দিয়ে ভেসে যাচ্ছিলেন। দুর্গন্ধ থেকে ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু মুখ ফিরিয়ে নিলেন কিন্তু শিব তাঁকে কাঁধে নিয়ে নৃত্য শুরু করে

দিলেন। আদিদেব বুঝলেন তাঁর এই কনিষ্ঠ পুত্রই পরম তত্ত্বজ্ঞ। তিনি তাঁকে নির্দেশ দিলেন আদিদেবীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী রূপে সংযুক্ত হতে এবং প্রজা সৃষ্টি করতে। এইভাবে বিশ্ব সৃষ্টি হল। শিবের এই অভিনব নব্য পরিচয়টি বাঙালী কবিদের রচনায় ধৃত হয়েছে এবং শিবশক্তির মধ্যে একই সঙ্গে পুত্র-মাতা এবং স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক কল্পিত হয়েছে যা মানব সমাজের আদিমতম অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

নাথযোগীদের কাব্যে (যেমন গোর্খবিজয় এবং রাজা গোপীচন্দ্রের গান) উভয় ক্ষেত্রেই আমরা শিবকে পাই একটু ভিন্নরূপে। তিনি যোগীশ্রেষ্ঠরূপে হিন্দুর কাছে পূজিত। এখানে যোগীরাজ শিবকে একটা তত্ত্বরূপে ভাবা হয়েছে। যোগীরাজ শিব তিনি যোগীদের কায়া সাধনের মাহাত্ম্য এবং বিন্দুধারণের তত্ত্ব এবং নারীসংসর্গ বিমুখতার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিচ্ছেন। তিনি আদিনাথ অর্থাৎ নাথপন্থার আদিগুরু। শুধু তাই নয় হিন্দু নাথপন্থীদের চূড়ান্ত লক্ষ্য শিবত্ব প্রাপ্তি। অর্থাৎ সর্ববিধ বিকারহীন ক্ষয়হীন অমরত্বের আদর্শাযিত একটা কাল্পনিক রূপ তারই নাম শিবত্ব শিব কি কোন দেবতা? অথবা কোন তত্ত্বমূর্তি? মহাযানী বৌদ্ধেরা যেমন বুদ্ধত্ব লাভের সাধনায় সর্বশক্তি এবং চিত্ত নিয়োগ করেন, তাঁদের কাছে বুদ্ধদেব কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসেবে থাকেন না, 'বুদ্ধত্ব' একটা চরম তত্ত্বাদর্শ হয়ে ওঠে— অনেকটা সেই রকম।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে পুরাণাশ্রয়ী শিবের কাহিনী অনেক পাওয়া যায় বিশেষ করে চণ্ডীমঙ্গল এবং অন্নদামঙ্গলে। পৌরাণিক শিবকাহিনী এবং লৌকিক শিবকাহিনীতে এই দুয়ের মিশ্রণ বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায়। শিব সতীর উপাখ্যান, দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করার ঘটনা বাহান্ন পীঠের উদ্ভব, পার্বতী রূপে সতীর নবজন্ম লাভ, শিব পার্বতী বিবাহ এ পর্যন্ত কাহিনী পুরাণ অনুসারী। চণ্ডীমঙ্গল অন্নদামঙ্গলের মধ্য দিয়ে সর্বভারতীয় পৌরাণিক শিব বাঙালীর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। লোকায়ত শিব পার্বতীর গানগুলোও তাতে সহায়তা করেছে। চণ্ডীমঙ্গল অন্নদামঙ্গলে এখান থেকে একান্ত বাঙালী শিব কল্পনার অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করা যায়। পুরাণাদিতে কোথাও কখনো শিবের দারিদ্র্য এবং সাধারণ গার্হস্থ্য সম্পর্কিত দু'একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু শিবায়নে —মনসা, চণ্ডী, অন্নদামঙ্গলে, উমা সঙ্গীতে শিব একান্ত পরিচিত বাঙালী রূপটি নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। কখনো তিনি সাধারণ ভাগচাষী, কখনো প্রত্যক্ষত কৃষি কর্মের সঙ্গে যুক্ত এবং সর্বদাই তিনি দরিদ্র। শিবের দারিদ্র্য ঘোচাবার জন্যই যেন দেবী পার্বতী মর্তলোকে পূজা আদায়ের জন্য দেবী দুর্গারূপে আবির্ভূত।

সপ্তদশ শতকে লেখা রামকৃষ্ণ রায়ের 'শিবায়ন' কাব্যটিতে পৌরাণিক নানা কাহিনীর পাশে ব্যাধ কর্তৃক শিব চতুর্দশীতে না জেনে শিবপূজার প্রচলিত কাহিনীটি আছে। এখানে শিব চতুর্দশী ব্রতের অধিষ্ঠাতা দেবতা রূপে আমরা শিবকে পাচ্ছি

সন্দেহ নেই। তাঁর এই রূপটি নেহাৎ লোক কল্পনা জাত।

শিবের এই মিশ্ররূপ গাজনে চড়কে লিঙ্গে প্রতিমায় পৌরাণিক মহিমায় লৌকিক ব্রতকথায় বাঙালী জনমানসে দীর্ঘকাল ধরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

শিবের আর একটি পরিচয় বাঙালীর ধর্মভাবনার সঙ্গে যুক্ত, তা হল শাক্ত তান্ত্রিকতা সংশ্লিষ্ট একটি বিশেষ বিশ্বাস। শাক্ত তান্ত্রিক পূজা কেন্দ্রগুলিতে — মহাপীঠ, পীঠ, উপপীঠ বলে যেগুলি বিখ্যাত তাদের প্রত্যেকটির সঙ্গে ভৈরবরূপী শিব বিভিন্ন পরিচয়ে অবস্থান করেন। বহু স্থলে তাঁর স্বতন্ত্র মন্দির থাকে এবং থাকে রীতি মাফিক পূজার ব্যবস্থাও। কোথাও মূল দেবীর মন্দির বা থানের পাশে তিনি লিঙ্গরূপে অবস্থান করেন। চণ্ডীমঙ্গলে, অন্নদামঙ্গলে এবং শিবায়নে শিব সতী, শিব-পার্বতীর যুগ্ম সম্পর্কের ভিত্তিতে শাক্ত-তান্ত্রিকতা এবং শৈব বিশ্বাসের এই মিলিত রূপটি বাংলার নিজস্ব উদ্ভাবনা। তা না হলে কালী চণ্ডী- পার্বতী পৌরাণিক ভাবে শিবের পত্নী বলে পরিচিত হলেও শাক্ত-তন্ত্রধর্ম এবং শৈব ধর্ম গোড়ায় অচ্ছেদ্য ছিল না। ক্রমে তাদের মধ্যে কোন কোন স্তরে অদ্বয় কল্পিত হয়েছে।

দশ

অন্নদামঙ্গল-কালিকামঙ্গলের দেবী

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে অন্নদা বা অন্নপূর্ণা দেবীর মহিমা নিয়ে একটি মাত্র কাব্য রচিত হয়েছে— ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল। অন্নপূর্ণা দেবী চণ্ডীর রূপভেদ। উত্তর ভারতের সুবিখ্যাত হিন্দু তীর্থ কাশী বা বারাণসীতে এই দেবীর অধিষ্ঠান। 'কাশীখণ্ড' নামক উপপুরাণে এই অন্নপূর্ণার মহিমা কীর্তিত হয়েছে এবং সে কাব্যটি একান্ত অর্বাচীন নয়। দেবী চণ্ডী দশভুজা দুর্গারূপে বহুকাল পূর্ব থেকেই বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণনগরকেন্দ্রিক বঙ্গীয় সংস্কৃতিতে অন্নপূর্ণারূপে তাঁর নব প্রতিষ্ঠা ঘটানো হয়েছে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র অন্নপূর্ণারূপী এই দেবীর পূজার প্রচলন করে হয়তো শক্তি-পূজা পরিমণ্ডলে কিছু অভিনবত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। ভারতচন্দ্র এই সুযোগে কিছু অপ্রচলিত এই দেবীর মহিমা প্রকাশক নব্য কাব্য রচনা করে অভিনবত্ব দেখাবার সুযোগ করে নিলেন। অন্নপূর্ণার মহিমা বিষয়ে কাশী প্রতিষ্ঠা, ব্যাস ছলনা প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলি কাশীখণ্ড থেকেই গৃহীত। তবে হরিহোড়ের গৃহে অন্নদারূপিণী দেবীর পূজা প্রাপ্তি, হরিহোড়কে ত্যাগ করে যাত্রাকালে দরিদ্র পাটনীকে ছলনা ও কৃপাদান, ভবানন্দ মজুমদারের গৃহে তাঁর অধিষ্ঠান, ভবানন্দকে ধনজন রাজ্য সাফল্য দান, এমন কি মোঘল বাদশাহের হাত থেকে রক্ষা করা এইসব গুণাবলী ভারতচন্দ্র কর্তৃক আরোপিত।

ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হল—

১. ভারতচন্দ্রের কাব্যে শাক্ত তান্ত্রিকতার প্রতি প্রবণতার চিহ্ন নানা স্থলে বিদ্যমান থাকলেও, কাহিনী বয়নে তো বটেই সরাসরি ব্যাখ্যায় তিনি শাক্ত শৈব বৈষ্ণবের মধ্যে মিলনের কথাই বলতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে ভেদবুদ্ধি দেখাতে গিয়েই ব্যাসদেব লাঞ্ছিত হয়েছেন। ষোড়শ-সপ্তদশ শতক থেকে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে শাক্ত বৈষ্ণবের সুবিদিত বিবাদের মধ্যে অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্র এই ধর্মমিলনের আদর্শ প্রচার করতে চেয়েছিলেন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। কারণ বাঙালী হিন্দু সমাজের পুর্নগঠনের জন্য এর প্রয়োজন ছিল।

২ ভারতচন্দ্রের যুগে বাঙালীর জীবন বারবার নানা কারণে বিপদ ও বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। মোগল শাসনের শিথিলতার দরুণ নবাবী আমলে অরাজকতার মাত্রা বেড়ে যায়। অবিচার, পীড়ন এবং দারিদ্র্য প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার বস্তু হয়ে ওঠে। বারংবার বর্গীর আক্রমণে গঙ্গার পশ্চিম তীর বিধ্বস্ত হয়। দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেশের বহু স্থানেই মাঝে মাঝে বিরাজ করতে থাকে। অন্নহীনের সমাজে দশভুজা দুর্গার নবরূপ অন্নপূর্ণার রূপ বিশেষ সামাজিক তাৎপর্য নিয়ে দেখা দেয়।

তবে একথা স্বীকাব কবে নিতে হয় যে অন্নদামঙ্গলের দেবীব মধ্যে আমরা পুরাণ বর্ণিত এক দেবীব বঙ্গীয় রূপায়ণ দেখতে পাই। লোকায়ত উৎস থেকে বাঙালী জাতি তাকে তৈরী করে নেয়নি।

অন্নদামঙ্গলের অন্নদা এবং কালিকামঙ্গলের কালিকা এক দেবী নন যদিও ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যে দুই দেবীরই মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করে কাহিনী রচনা করেছেন। তবে দুটি কাহিনী এমন স্বতন্ত্র তাদের যোগসূত্র এমন ক্ষীণ যাতে কখনো একরূপ মনে করার অবকাশ থাকে না যে এই কাব্যমধ্যে আমরা একটি দেবীকেই দুই রূপে দেখতে পাচ্ছি। অন্নদা এবং কালিকা দুই স্বতন্ত্র দেবী এবং স্বতন্ত্রভাবেই ভারতচন্দ্রের কাহিনীতে তাঁদের অবস্থান। তবে উভয়েই শাক্ত দেবী, তন্ত্রের সঙ্গে অল্পাধিক সম্পৃক্ত, শিবের ভক্তিরূপে পরিচিত, উভয়েই দেবী পার্বতী দুর্গার রূপভেদরূপে কল্পিত।

কালিকামঙ্গল

কালিকা দেবীর পরিচয় দিতে গিয়ে ড আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য সর্বজনগ্রাহ্য হওয়া উচিত বলে মনে করি—

"তন্ত্রশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কালী শক্তিদেবতা চণ্ডীরই রূপভেদ মাত্র। অবশ্য নিম্নস্তরের অনার্য সমাজ হইতেই যে কালিকা দেবীর উদ্ভব হইয়াছে, তাহা তাঁহার দেবত্বের প্রকৃতি হইতেই উপলব্ধি করা যায়। তন্ত্রের ভিতর দিয়া ইনি ক্রমে পৌরাণিক সাহিত্যেও প্রবেশ লাভ করেন। কিন্তু পরবর্তী পৌরাণিক

সম্পর্কের ফলেও তাঁহার অনার্য প্রকৃতির মূলে বিন্দুমাত্রও আর্য প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব অনার্য সমাজের মধ্যে তিনি যে একজন বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্না দেবী ছিলেন, তাহাই মনে হয়। 'লিঙ্গপুরাণ', 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ', কালিকাপুরাণ ইত্যাদিতে অনেক কাহিনীর অবতারণা করিয়া কালীর সহিত একটা মৌলিক আর্য সম্পর্ক স্থাপন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে; পুরাণে চণ্ডীর সহিতও কোন কোন স্থানে তিনি অভিন্ন বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার বিশিষ্ট অনার্য প্রকৃতি অত্যন্ত স্পষ্ট।"

সমগ্র বঙ্গদেশে তন্ত্রোক্ত প্রধান দেবী হিসেবে চামুণ্ডা বা কালীর পূজা সুপ্রচলিত। মূর্তিতে কিংবা শব-সাধনায়, মূর্তিহীন ধ্যানমন্ত্রে, আদি প্রকৃতি রূপে এই দেবী পূজিতা। তিনি ভদ্র-কালী, রক্ষা-কালী,দক্ষিণা কালী, শ্মশান-কালী, মহা-কালী, উত্তম-কালী প্রভৃতি নানা নামে পূজিতা। এঁদের মধ্যে উৎপত্তি ও স্বরূপের দিক থেকে কিছু কিছু পার্থক্য রয়েছে তবু এঁরা এক অখণ্ড তন্ত্রাশ্রয়ী কালী সাধনার অর্ন্তভুক্ত। বহু প্রাচীনকাল থেকে ভারতের নানা স্থানে বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে নানা রূপে এই রুদ্র, ভীমা, নগ্না দেবীর মূর্তিকল্পনা ও পূজাচার প্রচলিত দেখা যায়। কিন্তু পূর্ব-ভারতের আসাম, বঙ্গ, বিহার ও ওড়িষ্যায এঁর প্রচলন অতিশয় ব্যাপক। তন্ত্রোক্ত কায়াসাধনের সাধ্যবস্তুরূপে শুধু নয়, সাধকের কুলকুণ্ডলিনী শক্তিরূপে এঁর অবস্থান কল্পিত। আবার চোর ও ডাকাতের আশ্রয়দাত্রী দেবী রূপে কালীর পরিকল্পনা একটি বিস্ময়কর ব্যাপার বলে মনে হয়। কালিকা চোরকে রক্ষা করেন এবং রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে অবৈধ প্রণয়ীকে বিপন্মুক্ত করেন। কোন দেবীর এই পরিচয়টি কৌতূহলোদ্দীপক। এর মধ্য দিয়ে দেবীর একটি প্রতিবাদী ভূমিকা যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে আরও বিস্তৃত বিশ্লেষণ করা হবে।

রামপ্রসাদ সেন, ভারতচন্দ্র রায়, কৃষ্ণরাম দাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবি বিদ্যাসুন্দর কাব্যটির সঙ্গে কালিকার মহিমা যুক্ত করেছেন। তবে অর্বাচীন সংস্কৃতে লেখা 'চৌর-পঞ্চশিকা' কাব্যে এর পূর্বসূত্র পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে একথাও উল্লেখ করবার মত যে সাবেরিদ খাঁ, শ্রীধর দাস প্রভৃতি বিদ্যাসুন্দরের অন্যান্য কবিরা কালিকামঙ্গলের খোলসে এই প্রণয়কাব্যটি বিতরণ করেননি।

কালীপূজক বঙ্গদেশে কালিকা মঙ্গল রচনায় কবিদের তেমন উৎসাহ দেখা যায় না। যে কয়জন বিদ্যাসুন্দর-কালিকামঙ্গল রচনা করেছেন তাঁদের লেখায় বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয় ব্যাপার যতটা বিস্তৃত কালিকামহিমা তার তুলনায় নেহাৎই সংক্ষিপ্ত। এদেশের ধর্ম বিশ্বাসেব দিক থেকে দেখলে স্বীকার করতেই হয় আরো বহুবিধ আখ্যানের মধ্যে কালিকা মহিমা প্রচারিত হলেই বিষয়টা সঙ্গত হত।

ছয়
মঙ্গল কাব্যের অন্যান্য দেবদেবী

আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে' আরো অনেকগুলি গৌণ মঙ্গলকাব্যের উল্লেখ করেছেন। ড. সুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে'ও এই জাতীয় অপ্রধান মঙ্গল কাব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই জাতীয় মঙ্গলকাব্যগুলি অধিকাংশই সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কিংবা অষ্টাদশ শতকে রচিত। আমরা এ জাতীয় দেবতার নাম, সংক্ষিপ্ত পরিচয়, পূজার ব্যাপকতা এবং সাহিত্যে এঁদের অবস্থান--- একটি তালিকা আকারে নীচে প্রকাশ করছি।-

১. শীতলা-মঙ্গল

দেবী— ভারতের নানা স্থানে বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে পূজিতা। কোথাও কোথাও নামে কিছু পার্থক্য আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতেও এই দেবীর পূজা যে প্রচলিত ছিল তার নিদর্শন আছে। গর্দভবাহিনী শ্বেতকায় নগ্নমূর্তি বাংলার গ্রামাঞ্চলে গাছের তলায় শীতলার থানে পূজিত হয়। সাধারণ পুরোহিতের দ্বারা পূজা হয় না, গ্রহ বিপ্ররাই পুজো করে। মনে হয় কোন কোন শ্রেণীর গ্রামদেবতা এবং অনার্য বিশ্বাস আশ্রয়ী দেবকল্পনার ভিত্তিতেই শীতলা দেবীর বিকাশ।

কাব্য ও কবি—কাব্য কাহিনীটি অপুষ্ট ব্রতকথা ধরনের। বল্লভ, শঙ্কর, নিত্যানন্দ, মাণিকরাম গাঙ্গুলী প্রভৃতি কবির রচনা পাওয়া গিয়েছে। কোন লেখাই সাহিত্যমানের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য নয়।

২. ষষ্ঠী-মঙ্গল।

দেবী— শিশুরক্ষিকা দেবী হিসেবে ষষ্ঠী মধ্যযুগের বাংলায় সুপ্রচলিত। ষষ্ঠী-ব্রত খুবই প্রাচীন এবং ব্যাপক। দেবীটি গ্রামীণ, গার্হস্থ্য এবং অনার্য বিশ্বাসসম্ভূত।

কাব্য ও কবি—কাব্য কাহিনীটি ব্রতকথা ধাঁচের। কৃষ্ণরাম দাস, রুদ্ররাম, শঙ্কর প্রভৃতি কবির নাম পাওয়া যাচ্ছে। কোন রচনাই উল্লেখযোগ্য নয়।

৩. রায়-মঙ্গল।

দেবতা— দক্ষিণ বঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে পূজিত। ইনি বাঘের দেবতা। আমাদের দেশের বহু স্থানে বাঘের দেবতা পূজার প্রচলন আছে। এই দেবতা নানা রূপে পূজিত হয়ে আসছেন। ব্যাঘ্র উপাসনার পিছনে আদিম কৌম টোটেম উপাসনার বীজ আছে বলে অনেকে মনে করেন। দক্ষিণ বঙ্গে দক্ষিণ রায় নামে একটি ব্যাঘ্র দেবতার পূজার মোটামুটি ব্যাপক প্রচলন আছে। এ বিষয়ে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য '[illegible]' গ্রন্থে এবং 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে' যে সব আলোচনা করেছেন তার থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু সূত্র এখানে উদ্ধার করা হল—

১. নিম্ন বঙ্গের ব্যাঘ্র অধ্যুষিত সুন্দরবনের স্থানীয় দেবতা দক্ষিণ রায়। সুন্দরবন অঞ্চলের ব্যাঘ্র ভয় থেকে মুক্তি পাবার জন্য লোকপূজ্য আঞ্চলিক দেবতা হিসেবে এঁকে গণ্য করা যেতে পারে।

২. অনেকের অনুমান সুন্দরবন অঞ্চলের এক প্রসিদ্ধ ব্যাঘ্র শিকারী ছিলেন দক্ষিণ রায়। ধর্নুবাণে তিনি বহু ব্যাঘ্র ও কুম্ভীর হত্যা করেন। যশোর জেলার মুকুট রায় নামক কোন রাজার ইনি ছিলেন সেনাপতি। নিম্ন বঙ্গের ইনি ছিলেন শাসনকর্তা। তাঁর পরিচিতি ছিল দক্ষিণ দিকের অধিকারী দক্ষিণ রায় বলে। ক্রমে তাঁর উপর দেবত্ব আরোপিত হয়েছে। এই কিংবদন্তিমূলক প্রসঙ্গটির ভিত্তিতে কোন ঐতিহাসিকতা আছে কি না সন্দেহ।

৩. বাংলার নিজস্ব দেবতা দক্ষিণ রায়। ইনি ব্যাঘ্র রূপে পূজিত। আবার ব্যাঘ্র বাহন ধর্নুঃশর হস্তে দিব্যকান্তি দেবতা রূপেও পুজিত। তাঁর এই দেহকান্তি অবশ্য পৌরাণিক হিন্দু দেবতার আদর্শেই পরিকল্পিত।

৪. দক্ষিণ রায়ের এই পৌরাণিক মূর্তির সঙ্গে সর্বদাই একটি মাটির নরমুণ্ড রক্ষিত ও পুজিত হয়। কোথাও কোথাও পূর্ণাঙ্গ মূর্তিটি থাকে না শুধুই মাটির নরমুণ্ড বা 'বারা ঠাকুর' দক্ষিণ রায় রূপে পূজিত হয়। মনে হয় পূর্ণাঙ্গ মূর্তি নয় আদিতে এই 'বারা ঠাকুর' পূজিত হত। কেউ কেউ এই নরমুণ্ডের প্রতীকে আদিম কৃষি প্রজনন শক্তির জাদুর অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন। এর সঙ্গে আর একটি অনুমান যুক্ত হয়ে যায়, তা হল ঐ 'বাবা ঠাকুর' বা মুণ্ডটি আসলে একটি প্রস্তর খণ্ড যা পৌরাণিক প্রভাবে নরমুণ্ডের সুস্পষ্ট চেহারা নিয়েছে কিন্তু তার ভূমিলগ্ন রূপটি পরিত্যাগ কবতে পারেন নি। ফলে হস্তপদহীন মুণ্ডরূপেই থেকে গিয়েছে। এর মধ্যে আদিম প্রস্তর উপাসনার যে সম্ভাবনা আছে এই ব্যাখ্যাটি তার পরিপোষণ করে। ছিন্নমুণ্ড প্রসঙ্গে আরো একটি তথ্যের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। তা হল বাংলার অতি প্রচলিত কালী মূর্তির হস্তে একটি অসুরের ছিন্ন মুণ্ড এবং গলদেশে লম্বমান বহু মুণ্ডে গ্রথিত মুণ্ডমালা থাকে। এই মুণ্ডগুলি কালী কর্তৃক নিহত অসুরেরই মুণ্ড সন্দেহ নেই। কিন্তু দেবী মূর্তির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত থাকায় দেবী পূজাব সময়ে এরাও ফুল চন্দন সিঁদুরের অর্ঘ্য পায়। এর সঙ্গে কাটা 'বারা ঠাকুরের' মূর্তিটির কোন সাদৃশ্য আছে কি না তা ভেবে দেখা যেতে পারে।

আদিতে দক্ষিণ রায় দেবতা রূপে কিভাবে উদ্ভব লাভ করলেন এবং প্রতিষ্ঠিত হলেন তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও দক্ষিণ বঙ্গের লৌকিক দেবতা রূপে ইনি বঙ্গীয় দেবমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

কবি ও কাব্য—সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ ভাগে কৃষ্ণরাম দাস 'রায় মঙ্গল' নামে দক্ষিণ রায়ের মহিমাজ্ঞাপক কাব্যটি রচনা করেন। ইনি বর্তমান নিমতা অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। মনে হয় সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে সুন্দরবনের ব্যাঘ্রের

উপদ্রব ঐ সব অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। রুদ্রদেব নামে আর একজন কবির রচনাও পাওয়া গিয়েছে।

দক্ষিণ রায় প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত একটি ঘটনা হল এই যে, এই কাব্যের মধ্যে মুসলমান দেবী বনবিবি এবং ইসলামী ধর্মযোদ্ধা বড় গাজী খাঁর প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে। আমরা পরে যখন ইসলাম ধর্ম ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করব তখন এই বিষয়টির পর্যালোচনা করব।

৪. অন্যান্য দেবদেবী

অন্যান্য কয়েকটি দেব দেবী নিয়েও ক্ষুদ্রাকার কয়েকটি মঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়েছে। যেমন- পঞ্চানন-মঙ্গল, সূর্য-মঙ্গল, গঙ্গা-মঙ্গল, সুবচনী-মঙ্গল, কপিলা-মঙ্গল, কামাক্ষ্যা-মঙ্গল প্রভৃতি। এদের মধ্যে সূর্য ও গঙ্গা বৈদিক-পৌরাণিক দেব পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হলেও একান্ত লৌকিক ব্রত, বিপদতারণপূজা (যেমন মাঝি মল্লার গঙ্গা পূজা) প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে উল্লিখিত কাব্যগুলিতে নবরূপ লাভ করেছে, বাঙালীর একান্ত নিজস্ব ধর্মের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। আবার উল্লিখিত দেবতার কোন কোনটি যেমন পঞ্চানন, সুবচনী প্রভৃতি একান্ত লোক উৎসজাত অধিকাংশ ক্ষেত্রে এঁরা ব্রতের অধীশ্বর দেবদেবী— কবিদের হাতে পড়ে মঙ্গলকাব্যে মঙ্গল দেবতার স্তরে উন্নীত হয়েছে।

বারো
মঙ্গলকাব্যের দেবলোক

আমরা প্রধান ও অপ্রধান অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর পরিচয় দিলাম। এঁরা সকলে মিলে দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলার হিন্দু সমাজে একটা বিশিষ্ট দেব-পরিমণ্ডল গঠন করেছে। প্রাচীন পৌরাণিক দেব-পরিমণ্ডলের পাশে এটা একটা স্বতন্ত্র বঙ্গীয় দেব-পরিমণ্ডল। এই দুই পরিমণ্ডলের মধ্যে আভ্যন্তর দ্বন্দ্ব যেমন আছে সামগ্রিক মিলনও রয়েছে। বিশ্লেষক পণ্ডিতেরা দ্বন্দ্ব সংঘাতের দিকটি আবিষ্কার করতে পারেন। কিন্তু সাধারণ নরনারীর কাছে এই দুই দেব-পরিমণ্ডলের কোন বিরোধ নেই। এই দুই দেব-পরিমণ্ডল মিলেই তাঁদের বিশিষ্ট ধর্ম জগতটি গঠিত।

একটি নক্সার সাহায্যে এই বিষয়টি বুঝে নেবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

১-২-৩-৪— এই চতুষ্কটি সর্ব ভারতীয় পৌরাণিক দেব পরিমণ্ডল।

ক-খ-গ-ঘ—এই চতুষ্কটি বঙ্গীয় বিশিষ্ট দেব পরিমণ্ডল।

দেখা যাচ্ছে ক-ত-০-ঘ এই চতুষ্কটি পূর্বোক্ত প্রথম এবং দ্বিতীয় চতুষ্কটির

মিলন স্থান। এই অংশটিতে সর্বভারতীয় পৌরাণিক দেব-পরিকল্পনা এবং মধ্যযুগের বাংলার নিজস্ব দেব-কল্পনা— এই দুয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও মিশ্রণ ঘটেছে।

মধ্যযুগ থেকে বাঙালী হিন্দু ত্রিস্তর দেবতায় বিশ্বাস স্থাপন করে আসছে। প্রথমত ১-২-০-ঘ-ক-৪— এই সর্বভারতীয় পৌরাণিক দেবপরিমণ্ডলে, দ্বিতীয়ত ৩-খ-গ-০—এই বঙ্গীয় নিজস্ব অমিশ্র দেব-পরিমণ্ডলে। তৃতীয়ত ক-ত-০-ঘ— এই সর্বভারতীয় তথা বঙ্গীয়, পৌরাণিক তথা লৌকিক মিশ্র দেব-পরিমণ্ডলে।

আমরা মঙ্গলকাব্যে যে দেবলোকটি পাই ক-খ-গ-ঘ এই চতুষ্কটি তার প্রতীক। এটি বাংলার নিজস্ব দেবলোক। তবে পাশাপাশি একথাও সত্য মঙ্গলকাব্য
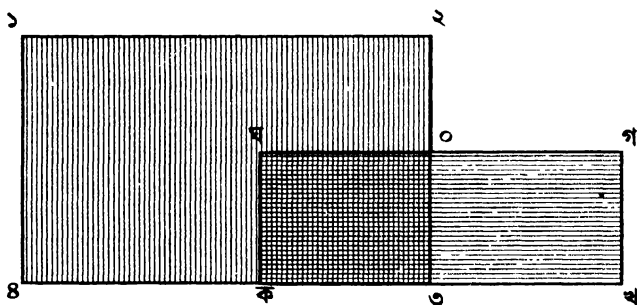
ব্যতিরিক্ত অন্য দেবলোক ও ধর্ম পরিমণ্ডল বাংলায় ছিল এবং তারও বঙ্গীয় ধর্ম জীবনে কিছু কম প্রভাব বিস্তার করে নি। আমরা ক্রমে এইসব প্রসঙ্গ আলোচনার সময়ে এইসব ধর্ম ভাবনার বিচিত্র রূপের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টা করব।

তেরো
ধর্মপ্রচার

মঙ্গলকাব্যগুলিতে আমরা দেব দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন যেমন প্রথাগত ভাবে দেখতে পাই তেমনি দেব দেবীর পূজার বিস্তৃত বিবরণও পেয়ে থাকি। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর শুরুতেই আদি পুরুষ ব্রহ্মার বন্দনা, গণপতির মহিমা কীর্তন, সরস্বতীর মহিমা প্রকাশ, আদ্যাশক্তি, লক্ষ্মী প্রভৃতির সঙ্গে চৈতন্য বন্দনাও স্থান পেয়েছে। বিজয় গুপ্তের মনসা মঙ্গলে দেখি নানা পৌরাণিক দেব দেবী তাঁদের বাহনের উল্লেখ সহ কাব্যের গোড়াতেই কবির প্রণাম লাভ

করেছেন। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে প্রথম গণেশ বন্দনা, তারপরে পর পর শিব, সূর্য, বিষ্ণু, কৌষিকী, লক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা বন্দনা স্থান পেয়েছে। এই সব সূত্রে পুরাণের সুপরিচিত এবং স্বল্প পরিচিত দেবদেবী বাঙালী হিন্দু সমাজের মর্মে প্রবেশ করেছে।

পৌরাণিক ঘটনার উল্লেখ ও বিবরণ বারংবার পাওয়া যাচ্ছে, যে কোন সূত্রে তারা কাব্য মধ্যে স্থান করে নিচ্ছে। বহু কাব্যে 'চৌতিশা' স্তব যুক্ত হয়েছে। তাতে আরাধ্য দেবতার স্তোত্র থাকছে ক থেকে হ পর্যন্ত অক্ষরগুলো মিলিয়ে। নানা সুযোগে কবিরা কাব্য মধ্যে ভক্তিভাব মূলক নানা বর্ণনার সংযোগ ঘটিয়েছেন, যেমন অন্নদামঙ্গলে শিব নামাবলী---

জয় সুরারিনাশন বৃষেশবাহন
ভুজঙ্গভূষণ জটাধর।
জয় ত্রিলোককারক ত্রিলোকপালক
ত্রিলোকনাশক মহেশ্বর।।

আবার পাশাপশি হরি নামাবলীও স্থান পাচ্ছে---

জয় কেশিমর্দ্দন কৈটভার্দ্দন
গোপিকাগণ মোহন।
জয় গোপবালক বৎসপালক
পূতনাবক নাশন।।

মনসামঙ্গলে ধৃত মনসাপূজার একটি বিবরণ থেকে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হচ্ছে— চাঁদের মনসা স্তব---

নমস্তে আস্তিকমাতা তক্ষকের জননী।
নমস্তে ব্রাহ্মণী দেবী জরৎকারু রমণী।।
নমস্তে বিষহরী সর্ব্ব দুঃখনাশিনী।
নমস্তে জগত মাতা ভবভয় নাশিনী।।

এইভাবে মঙ্গলকাব্যগুলি হিন্দু ধর্মীয় সর্বজনগ্রাহ্য একটি বিশ্বাস ও আচারের বাতাবরণ তৈরী করেছে। বাঙালীর সমকালীন জীবনের প্রতিফলন যেমন সেখানে ঘটেছে তেমনি এই বিপুল বিস্তৃত মঙ্গল নামে আখ্যাত সাহিত্য কর্মগুলি বাঙালীর নিজস্ব ধর্মবিশ্বাসকে সুনির্দিষ্ট আকার দিতে সাহায্য করেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের ক্রমবিকাশ এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের বৈচিত্র্য

দ্বিতীয় পর্যায়

চৈতন্য পর্ব

এক

ভূমিকা

বঙ্গদেশে এবং বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে বৈষ্ণবধর্ম, ধর্ম হিসেবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তুর্ক বিজয়ের পূর্ব থেকেই এর সাধারণ প্রভাব আমরা লক্ষ্য করেছি। তুর্ক বিজয় পরবর্তী কালে আমরা দেখেছি বৈষ্ণবধর্ম সম্পৃক্ত কাব্য নিজস্ব বিশিষ্ট রূপ নিয়ে বাংলায় একটা প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। আর চৈতন্য প্রভাব থেকে শুরু করে সপ্তদশ শতাব্দীর সমাপ্তি পর্যন্ত প্রায় দুশো বছর বৈষ্ণবধর্মের একটি বিশিষ্ট বঙ্গীয় রূপ দেশ ব্যাপী বিরাট আন্দোলন হয়ে উঠেছে। ধর্মসাধনা, দর্শন ও তত্ত্বচর্চা বিবিধ শ্রেণীর কাব্যাদি রচনার মধ্য দিয়ে বৈষ্ণবতা বাংলার দিগন্ত আচ্ছন্ন করে রেখেছে। শুধু বৈষ্ণব সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় নয়, অন্যান্য সাহিত্যেও বৈষ্ণব ধর্ম ও সাধনরীতির প্রভাব কার্যকর হয়ে উঠেছে।

চৈতন্য প্রভাব যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হল— এরদ্বারা বোঝা যাবে কত বিচিত্র বিষয় ও রূপ বৈচিত্র্যে বৈষ্ণব সাহিত্য আপনাকে প্রকাশ করেছে।

১. চরিত-সাহিত্য
   - ১.ক. চৈতন্য চরিত
   - ১.খ. অন্যান্য মোহান্ত চরিত

২. পদাবলী
   - ২.ক. গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী
   - ২.খ. রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী

৩. কৃষ্ণলীলা আখ্যান কাব্য

৪. কড়চা-নিবন্ধ

এরমধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে পদাবলী কীর্তন গান রূপে পরিবেশিত

হত। কীর্তনের রূপ ও রীতি নিয়ে বিশেষ চর্চা হয়েছে। পদাবলীর আধ্যাত্মিকতা প্রতিষ্ঠায় কীর্তন গানের ভূমিকাও বিশেষভাবে আলোচ্য। এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় যে সূত্রের আলোচনা কর্তব্য তা হল কৃষ্ণলীলা আখ্যানগুলি প্রায়ই যাত্রাপালা রূপে পরিবেশিত গত। অর্থাৎ পরিবেশনের দিক থেকে দুটি দিক লক্ষ্যণীয়—

১. কীর্তন

২. কৃষ্ণযাত্রা

চৈতন্য যুগের বিশিষ্ট ধর্মভাব অবলম্বনে শুধুই যে সমকালের বৈষ্ণব সাহিত্য গড়ে উঠেছিল তাই নয়, বঙ্গসাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও এর গুরুতর প্রভাব পড়েছিল। যেমন—

১. মঙ্গলকাব্য।

২. অনুবাদ সাহিত্য।

মঙ্গলকাব্য এবং অনুবাদের বিভিন্ন শাখায় চৈতন্য প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে বৈষ্ণব সাহিত্য ব্যতিরিক্ত বঙ্গসাহিত্যের এইসব বিভাগেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ধর্মের— বিশেষভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের এবং সাধারণভাবে ভক্তিভাবের বর্ণসম্পাত ঘটেছে।

সপ্তদশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি বর্তমান থাকলেও অষ্টাদশ শতকেও বঙ্গীয় সমাজে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবের অবশেষ লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে বিশিষ্ট সমালোচক ড. ক্ষেত্র গুপ্তের মন্তব্য উল্লেখ করছি—

> আলোচ্য পর্বে বাংলা বৈষ্ণবসাহিত্যের প্রাণৈশ্বর্য ফুরিয়ে গিয়েছে। ভক্তিরসের সেই গভীরতা ও আন্তরিকতা আর নেই। গতানুগতিক রীতিতে চলেছে প্রচুর পদরচনা—তার মধ্যে না আছে ভাষাশিল্পের কোনো সার্থক অভিব্যক্তি, কল্পনার আর কোনো অভিনবত্বের সুযোগও ছিল না। জীবনী রচনায়ও পূর্বপর্বের সমগ্রদৃষ্টি আর সংহত বোধ আর প্রকাশ পাচ্ছে না। বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তনের জনপ্রিয়তা বেড়েছে। ধর্মভাবনার সঙ্গে সহজিয়া মতবাদের মিশ্রণ ঘটেছে। এই যুগে বাংলা দেশে বৈষ্ণব সমাজ আরও প্রসারিত হয়েছে। সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও এর প্রান্তে স্থান পেয়েছে। ফলে সাধন ভজন, ইতিহাস ও তত্ত্বচর্চা, কীর্তনগান সবেগে চলেছে।
>
> এ পর্বের বৈষ্ণবসাহিত্যের প্রধান লক্ষণ হল—
>
> এক।। সমাজেতিহাস ও তত্ত্বগ্রন্থে কচিৎ মনীষার পরিচয়
>
> দুই।। কীর্তনের সুবিধার জন্য পদ সঙ্কলন গ্রন্থের আবির্ভাব।
>
> তিন।। পদ রচনায় প্রাচুর্য কিন্তু শিল্পগুণে নূন্যতা।
>
> চার।। রাধাকৃষ্ণ প্রণয় বিষয় নিয়ে সম্প্রদায়ের বাইরে একান্ত লৌকিক

কবিগান — 'সখী সম্বাদ' ও 'বিরহ' রচনার সূত্রপাত।

প্রেমদাসের 'বংশীশিক্ষা', অকিঞ্চন দাসের 'বিবর্ত বিলাস', নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর', ও 'নরোত্তম বিলাস' বৈষ্ণব তত্ত্ব, মোহান্ত জীবনী এবং বৈষ্ণব ধর্মান্দলনের ইতিহাস ধরে রেখেছে।

সপ্তদশ শতকের শেষভাগ থেকে অনেকগুলি বৈষ্ণব পদসঙ্কলন গ্রন্থ প্রস্তুত হয়। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সঙ্কলিত 'ক্ষণদাগীত চিন্তামণি', নরহরি চক্রবর্তী সম্পাদিত 'গীত চন্দ্রোদয়' এবং 'গৌর চরিত চিন্তামণি', রাধামোহন ঠাকুর সম্পাদিত 'পদকল্পতরু' বৈষ্ণব সাহিত্যের একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে।

পদাবলী রচনায় প্রাচুর্য থাকলেও ভাব গভীরতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। এঁদের মধ্যে রাধামোহন ঠাকুর যিনি ছিলেন অষ্টাদশ শতকের বৈষ্ণবদের এক প্রধান নেতা তাঁর বহু সংখ্যক পদ পাওয়া গেলেও রসগাঢ়তার স্থানে তাত্ত্বিকতা লক্ষ্য করা যায়। চন্দ্রশেখর এবং শশীশেখরের কবিতায় ব্রজবুলির ঝঙ্কার ও জৌলুসের দ্বারা আন্তরিকতার এবং ভাব গভীরতার অভাব ঢাকা দেবার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে দুটি নতুন কাব্য শাখার উদ্ভব ঘটে এই অষ্টাদশ শতাব্দীতে —

১. কবিগান

২. শ্যামা-উমা সঙ্গীত

কবিগানের একটি অংশ রাধাকৃষ্ণ প্রেম বিষয়ক। অধিকাংশ গানই দুটি পর্যায়ে বিভক্ত, 'রাধা বিরহ' এবং 'সখী সম্বাদ'। কবিগানের এই অংশটি প্রত্যক্ষভাবে বৈষ্ণব পদাবলীর উত্তরসূরী। কিন্তু কবিগানের আর একটি অংশ আছে যেগুলি 'শ্যামা বিষয়ক' নামে সাধারণভাবে পরিচিত। এই গানগুলি রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রবর্ত্তিত শ্যামা-উমা পদাবলীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। এই শ্যামা-উমা পদাবলী এবং কবিগানের অন্তর্ভুক্ত 'ঠাকুরানী' বিষয়ক গানগুলি অষ্টাদশ শতকে বাঙালীর ধর্মভাবনা এবং ভক্তিব্যাকুলতার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। এ বিষয়ে পরে আমরা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করব। কিন্তু এখানে শুধু এটুকু বক্তব্য যে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবে এই শাক্ত সঙ্গীতগুলির উদ্ভব।

দুই

চৈতন্যভাগবত ও নবদ্বীপের আদি চৈতন্য-পন্থা

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থটি শুধু চৈতন্যদেবের জীবনীর পূর্বখণ্ডের

বিবরণ নয়। এই কাব্যটির মধ্য দিয়ে নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবদের ধর্ম বিশ্বাসের একটি স্পষ্ট রূপ প্রকাশ পায়। চৈতন্যদেবকে কেন্দ্রে রেখে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এবং অন্যান্য পরিবার বর্গ যে ধর্মমণ্ডলী সংগঠিত করেন এবং যে ধর্মাদর্শ প্রচার করেতে থাকেন তার মূল ভিত্তি এবং ঐতিহাসিক বিবরণ দুইই এই গ্রন্থে লব্ধ।

চৈতন্য ভাগবতকার চৈতন্য আবির্ভাব কালে দেশব্যাপী ধর্মের বিনষ্টি বিষয়ে একটি ইতিহাস সম্মত বিবরণ দিয়েছিলেন। আদিখণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে আমরা তার অল্প উদ্ধৃত করছি।

ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে।।
কৃষ্ণনাম-ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম-কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার।।
'ধর্ম্ম-কর্ম্ম' লোক সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহুধনে।।
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিবাহে।
এই সবে রত আর কিছু না জানয়ে।।
যেবা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব।
তাহারা-হো না জানয়ে গ্রন্থ অনুভব।।
শাস্ত্র পড়াইয়া সভে এই সর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যম-পাশে বন্দী মরে।।
না বাখানে যুগধর্ম্ম-কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বহি গুণ কারো না করে কথন।।

নবদ্বীপের বিদ্যার খ্যাতি চতুর্দিকে প্রসারিত থাকলেও কৃষ্ণভক্তি নামগান যা যুগ উদ্ধারের মন্ত্র তা থেকে নবদ্বীপ এবং সর্বদেশ বঞ্চিত ছিল। সেই পাপ দূর করার জন্যই ভগবান কৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন শ্রীচৈতন্য রূপে। চৈতন্য আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই অদ্বৈত মহাপ্রভুব নেতৃত্বে শ্রীবাস, চন্দ্রশেখর, জগদীশ, গোপীনাথ, শ্রীনিবাস, মুরারি, গড়ুর গঙ্গাদাস প্রভৃতি ভক্তগণ সমবেত হয়েছিলেন কলির ভগবৎ লীলাকেন্দ্র নবদ্বীপে। অবশেষে চৈতন্য আবির্ভূত হলেন এবং তিনি যে স্বয়ং ভগবান কালরূপ সর্পবিষ থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে এসেছেন অচিরকাল মধ্যে তা প্রকাশ পেল।

নবদ্বীপের আদি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কয়েকজনের নাম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী কালে এসে যোগ দিলেন পরমভক্ত নিত্যানন্দ। চৈতন্যের জীবৎ কালে বঙ্গদেশময় নাম কীর্তন মাহাত্ম্য চৈতন্য অবতার তত্ত্ব, তাঁর সর্বজীবে দয়া

চণ্ডালঅপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণ— জাতিভেদভেদী এই মহামন্ত্র নিত্যানন্দের নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক জনমানুষের মধ্যে প্রসারিত হয়েছিল। চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থটিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রথম পর্যায়ের ধর্মভাবনা যথাযথ ব্যাখ্যাত হয়েছে। চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ লীলার অনেক আচার আচরণকেই একালের যুক্তিপ্রবণ মন বৃন্দাবন দাসের অতিকথন বলে সংশয় প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে বৃন্দাবনী তত্ত্ব প্রচারের পূর্বে আপামর বাঙালী যে দৃষ্টিতে নদীয়ার নিমাইকে অনুভব করত তারই রূপ ধরা পড়েছে। পাঠক যদি বলে ভাগবতের কৃষ্ণের লীলাগুলির সঙ্গে অনেকটা মিলিয়ে নদীয়ার নিমাইয়ের কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, আবাল্য তিনি কৃষ্ণের অনুরূপ কার্য করে গেছেন, এগুলি কবি কল্পনার আরোপ মাত্র। কিন্তু বিষয়টিব মধ্যে কিঞ্চিৎ জটিলতা আছে। বৃন্দাবন দাসের সময়কার একটা বৃহৎ সংখ্যক বঙ্গবাসী নদীয়ার এই ব্রাহ্মণকে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ বলে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করেছিল এবং ধর্ম ও ভক্তির আন্দোলনগুলি মানুষের গভীর বিশ্বাসের উপরই ভর দিয়ে দাঁড়ায়। চৈতন্য ভাগবতে চৈতন্য জীবনীর তথ্যগত বিন্যাসে যতই ফাঁক থাক সমকালীন ভাব পরিমণ্ডলটি রচনা দ্বারা সেই ফাঁক পূর্ণ করা হয়েছে।

চৈতন্যদেবকে কেন্দ্রে রেখে বৈষ্ণব ধর্মের যে নতুন ঐতিহাসিক শক্তির প্রকাশ পেল চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থটির মধ্যে অবতার বিশ্বাসের মধ্য দিয়েও তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

১. ব্যক্তিগত ধর্মাচরণ অর্থাৎ সাধন ভজন পূজার্চনার স্থলে যুথবদ্ধ ধর্মাচরণের প্রবর্তন। দলবদ্ধ হয়ে বৈষ্ণব ভক্তরা তাঁদের ভক্তি-ব্যাকুলতা প্রকাশ করতেন তাতে অধিকারী অনধিকারীর ভেদ ছিল না। সকলেই যোগদান করতে পারতেন।

২. এই যৌথ ধর্মাচরণ মূলত কীর্তনগানের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করত কোনো ভক্তের গৃহ প্রাঙ্গনে নৃতগীত থেকে নিয়মিত নগর সংকীর্তন শুরু হল। নগর সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে ধর্ম প্রচারের একটি অভিনব পদ্ধতি প্রবর্তিত হল। হিন্দু ধর্মাচার্যেরা নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ও উপলব্ধিকে এতকাল আত্মার শক্তি বলে নিভৃত ব্যক্তিক সাধনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেন এবার স্বয়ং ধর্মপ্রধান পথে পথে ঘুরে ধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। বক্তৃতায় প্রচার নয়, ব্যাখ্যা করে বোঝানো নয়, গানের মধ্য দিয়ে এবং সঙ্গীতানুগ স্বাভাবিক নৃত্যভঙ্গীতে যে ধর্মভাব-ব্যাকুলতা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ত তার অমোঘ-শক্তি সর্বসাধারণ অনুভব না করে পারত না।

৩. কোন সংস্কৃত মন্ত্র দিয়ে দেবতার পুজো নয়, বিগ্রহে পুষ্পাঞ্জলিতে নৈবেদ্যে অর্চনা নয়। বাংলা ভাষায় লেখা গান—শুধুই নাম কীর্তন, শুধুই একটি ধ্বনি 'হরিবোল', তাকেই অস্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করে চৈতন্যদেব যুগের পাপ নাশ করলেন।

হিন্দুয়ানি পূজা অর্চনা যে রহিত হল তা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয় কিন্তু সে সবই প্রথাগত গৌণ ব্যাপার। হিন্দু ধর্মের এই নব্যরূপ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম সংকীর্তনকেই সর্ববিধ সাধনার সার বলে চিহ্নিত করল। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন—

এই অবতারে ভাগবত-রূপ ধরি।
কীর্তন করিবা সর্বশক্তি পরচারি।।
সঙ্কীর্ত্তনে পূর্ণ হৈব সকল-সংসার।
ঘরে ঘরে হৈব প্রেম-ভক্তি পরচার।।
কি কহিব পৃথিবীর আনন্দ-প্রকাশ।
তুমি নৃত্য করিবে মিলিয়া সর্ব্বদাস।।

৪. ধর্ম সাধনা যখন নগর সংকীর্তন হয়ে ওঠে তখন তাতে জাতিভেদ বর্ণভেদ থাকে না, এই পূজা-গৃহের দ্বার সকলের জন্য খোলা। তাই চৈতন্য পন্থার মূল মন্ত্র হয়ে উঠেছিল 'যেই জন কৃষ্ণ ভজে, সে মোর ঠাকুর', যিনি ভক্তি পরায়ণ তিনিই আমার দেবতা, তিনি যে কোন জাতি যে কোন ধর্মেরই হোন । যবন হরিদাস তাই চৈতন্য পরিকর হয়ে উঠেছিলেন। বণিক রঘুনাথ দাস তাই বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর অন্যতম বলে গণ্য হয়েছিলেন।

৫. নবদ্বীপের চৈতন্য পন্থীদের মধ্যে ধর্ম রক্ষার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝেই একটি বলিষ্ঠ প্রতিরোধ শক্তি লক্ষ্য করা যায়। বৈষ্ণবীয় কোমলতা এবং বিনয় নম্রতা আচরণের ক্ষেত্রে আদর্শ হলেও যেখানে ধর্মের গ্লানি সেখানে চৈতন্যদেব কৃষ্ণ অবতারের মতই শাস্তিদাতা চক্রধারী ভগবানের মত বলিষ্ঠতা দেখিয়েছিলেন। জগাই মাধাই উদ্ধারের ক্ষেত্রে এবং নবদ্বীপের কাজী দলনের ক্ষেত্রে বৃন্দাবনদাস তাঁর নিদর্শন রেখেছেন। আসলে দুটি ক্ষেত্রে সংগ্রামটি ছিল ধর্মাচরণে স্বাধীনতার গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার। বৈষ্ণবদের নগর সংকীর্তনের অধিকার কাউকে হরণ করতে দেওয়া হবে না। হরণকারী দুর্বৃত্ত ধনাঢ্য জগাই মাধাই হোক অথবা দেশের শাসক-বিচারকই হোক। ধর্মীয় গণতন্ত্র রক্ষায় চৈতন্যের এই পদ্ধতি অনেকটা আধুনিক ভারতের সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্যের সমপর্যায়ের। বৃন্দাবনদাস যদি তাঁর মধ্যে ভাগবতের কৃষ্ণের কংস ও শিশুপাল সংহারের প্রতিরূপ দেখতে পান তাতে আপত্তি করা চলে না।

তিন

গৌর-নাগর বাদ

চৈতন্যদেবের জীবৎকালেই নবদ্বীপে একটি অপ্রধান বিশ্বাসধারা বৈষ্ণবদের

মধ্যে দেখা যায়। বাসুদেব ঘোষের মত গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলীর একজন প্রধান শিল্পী এবং 'চৈতন্য মঙ্গল' রচয়িতা লোচনদাসের মত জনপ্রিয় লেখকের মধ্যে এই ধারাটির নেতৃত্ব দেখি, 'গৌর-নাগরবাদ' নামে এই বিশেষ ভক্তিভাব-ধারাটি পরিচিত। যখন নবদ্বীপে সাধারণভাবে শ্রীচৈতন্যকে মথুরা কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণরূপে অনুভব করতে চাইছে 'গৌর-নাগর' ভাবের ভক্তরা তখন চৈতন্যের মধ্যে বৃন্দাবন লীলার কৃষ্ণকে দেখতে পেয়েছেন, এঁদের মতে শ্রীচৈতন্য পরমপুরুষ লীলাময় কৃষ্ণস্বরূপ এবং নবদ্বীপই কলির বৃন্দাবন। কৃষ্ণ যেমন ছিলেন বৃন্দাবনের গোপীদের প্রণয়ী, তেমনি নদীয়ার পুরুষ-নারী নির্বিশেষে যাবতীয় লোক-স্বভাব স্বরূপে গোপীপ্রাণা নারী। পরমপুরুষ চৈতন্যই তাদের সকলের আরাধ্যা প্রণয়ী। বাসুদেব ঘোষ, মাধব ঘোষ, নরহরি সরকার প্রভৃতির অনেক গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদে এই ভাবটির প্রকাশ আছে। নরহরি সরকারের 'গৌর-নাগর' ভাবের একটি পদের অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল—

বেলি অবসানে ননদিনী সনে
জল আনিবারে গেনু।
গৌরাঙ্গ চাঁদের রূপ নিরখিয়া
কলসী ভাঙ্গিয়া এনু।।
কাঁপে কলেবর, গায়ে আসে জ্বর,
চলিতে ন চলে পা।
গৌরাঙ্গ চাঁদের রূপের পাথার
সাঁতারে না পাই থা।।
দীঘল দীঘল নয়ান যুগল
বিষম কুসুম শরে।
রমণী কেমনে ধৈরজ ধরিবে
মদন কাঁপয়ে ভরে।।

'নদীয়া-নাগর' ভাবটি সমকালে কি পরিমাণ ব্যাপকতা লাভ করেছিল তা ঠিক ভাবে বলা যায় না। নবদ্বীপের মূল বিশ্বাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষত বিরোধিতায় না গিয়েও অনেক ভক্ত এই ভাবের রসবিহ্বলতায় হয়তো নিমজ্জিত হতে চাইতেন। তাই এই দুই মতবাদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সীমারেখাটিও সর্বদা আঁকা যায় না। কিন্তু ধর্মীয় ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয়—

১. 'নদীয়া নাগর' ভাবের মধ্যে সহজিয়া বোধের কিঞ্চিৎ পূর্বানুসরণ থাকা অসম্ভব নয়। ভগবান শ্রীচৈতন্য প্রেমিক পুরুষ এবং নরনারী নির্বিশেষে তাবৎ মানুষ প্রেমিকা এই উপলব্ধি-ভিত্তিক যে সাধনা তার ঐতিহ্য সুফীবাদী বিশ্বাস ও প্রাক চৈতন্য বৈষ্ণব সহজিয়া মতের প্রতিধ্বনি স্বরূপ।

২. গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বৃন্দাবনে বিধিবদ্ধ হয় আরো কিছু কাল পরে। সেখানে সাধ্য-সাধন তত্ত্বের মধ্যে ভক্ত-সাধকের যে সখী 'মঞ্জরী' বৃত্তি তার উৎস কি এই নদীয়া-নাগর ভাবের মধ্যে?

চার

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ঃ বৃন্দাবনের তত্ত্ব

এইবারে আমরা চৈতন্য-পন্থী বৈষ্ণব ধর্ম দর্শনের পববর্তী স্তরে প্রবেশ করব। স্বরূপ দামোদরের কড়চায় সূত্রাকারে নীলাচলবাসী চৈতন্যেব জীবন-ভাষ্য প্রসঙ্গে এর সূত্রপাত লক্ষ্য কবি। প্রায় সমকাল এবং কিছু দিন পরে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা তাঁদের অত্যুচ্চ দার্শনিক ও তাত্ত্বিক মনীষায় একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন-ধর্ম-সাধনার স্বরূপ প্রকটিত করেন তাঁদের অনন্যসাধারণ বচনাবলীতে 'উজ্জ্বলনীলমণি', ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'পদ্যাবলী', ষড় গোস্বামীর 'ষট-সন্দর্ভ' প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচবিতামৃতে' এই ধর্মীয় ভাব-পরিমণ্ডলটি গড়ে ওঠে। সপ্তদশ শতকে বঙ্গদেশে চৈতন্য ভক্ত বৈষ্ণবদের মধ্যে চৈতন্য পন্থার এই দ্বিতীয় তত্ত্বভূয়িষ্ঠ রূপটি একেশ্বর হয়।

বাঙালীর বৈষ্ণব সাহিত্যের বিপুল প্রয়াসের পটভূমি হিসেবে উক্ত মতবাদের প্রধান কয়েকটি দিক নিয়ে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। এই আলোচনায় আমাদের ঋণ আচার্য রাধাগোবিন্দ নাথ, পণ্ডিত হবেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক ড. শশিভূষণ দাশগুপ্তের কাছে। আমরা আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন, ড. বিমানবিহারী মজুমদার, ড. সুশীলকুমার দে-এর রচনার নিকটও অনেকটা ঋণী।

আমরা যে সমস্ত তত্ত্ব নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব তা হল—

১. গৌর-অবতার তত্ত্ব।

২. গৌড়ীয় দর্শনের মূল প্রত্যয়-অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব, কৃষ্ণ তত্ত্ব ও রাধা তত্ত্ব।

৩. সাধ্য-সাধন তত্ত্ব।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে উক্ত তত্ত্বসমূহ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রায় সব প্রাসঙ্গিক তাত্ত্বিক দিক ছন্দোবদ্ধ ভাষায় অতি প্রাঞ্জল ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রন্থটি মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে একটি অনন্য সাধারণ স্থান অধিকার করেছে। শুধুই আবেগ-প্রধান কবিতা এবং ঘটনা-প্রধান আখ্যান গ্রন্থ বর্ণনার মধ্যে এটি যুক্তি-তর্ক-বিচার-বিশ্লেষণের আধার স্বরূপ একটি মহান কীর্তি রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বৈষ্ণব সাহিত্যের এই বিশেষ দানটির কথা বৈষ্ণব ধর্ম দর্শন ও তত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে অবশ্যই স্মরণ করা উচিত।

(১). গৌর অবতার তত্ত্ব

চৈতন্য ভাগবতের সঙ্গে এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সম্পূর্ণ অমিল। যদিও বৃন্দাবনের গোঁসাইরা 'নদীয়া নাগর' ভাব থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তবুও তাঁরা চৈতন্যের মধ্যে খুঁজেছেন বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে, কুরুক্ষেত্র মথুরার নয়। তাঁদের মতে, পৃথিবীতে যখন ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের প্রাধান্য ঘটে, ভগবান বিভিন্ন অবতারে অবতীর্ণ হয়ে পাপের অবসান ও পুণ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এই পাপের বিনাশ ও পুণ্যের প্রতিষ্ঠার কাজটি ভগবানের কাছে ছোট কাজ। বারবার তিনি নৃসিংহ, কূর্ম প্রভৃতি অংশাবতারের দ্বারা এই কাজটি সম্পন্ন করেছেন। যেহেতু স্বয়ং ভগবান প্রেমময়, সেইহেতু প্রেম আস্বাদনের বৈচিত্র্যই মাত্র তাঁর পূর্ণ অবতারের কারণ হতে পারে, যুগধর্ম প্রবর্তন নয়। কৃষ্ণ পূর্ণ অবতার। কিন্তু কংস, শিশুপাল বধে বা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি অংশাবতারের দায়িত্ব পালন করেছেন। একাজ তিনি করেছেন প্রসঙ্গক্রমে, তাঁর আসল উদ্দেশ্য বৃন্দাবনে বিচিত্র প্রেমলীলার রসাস্বাদন— দাস্য থেকে মধুর পর্যন্ত। নিত্য-বৃন্দাবনে কৃষ্ণ চিরতরুণ বলে বাল্য, কৈশোরের লীলারস আস্বাদন করতে পারেন না, এবং রাধা তাঁর স্বকীয়া বলেই পরকীয়ার উল্লাস অনুভব সম্ভব হয় না। দ্বাপরে বৃন্দাবন লীলায় এই অচরিতার্থ রসাস্বাদন তিনি পূর্ণ করার সুযোগ পান, তাই তাঁর কৃষ্ণরূপে মর্তে অবতরণ। তখন কিছু যুগ-প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, তাই স্বয়ং অংশাবতারের দায়িত্ব নিয়ে কুরুক্ষেত্রাদিতে পুণ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়ে গেছেন।

শ্রীচৈতন্য পূর্ণ ব্রহ্ম, অংশাবতার নন। কীর্তনাদি প্রচারের দ্বারা যুগ-ধর্ম সংস্থাপন তাঁর লক্ষ্য নয়, তিনি গৌণ কার্য হিসেবে তা করে গেছেন। চৈতন্যরূপ পূর্ণ অবতারের লক্ষ্য কি? স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি বলেছেন লক্ষ্য তিনটি—

ক. রাধা প্রেম অনুভূতির স্বরূপ উপলব্ধি। কৃষ্ণরূপে এই উপলব্ধি সম্ভব ছিল না। কারণ তিনি প্রেমের বিষয়, রাধা আশ্রয়।

খ. রাধার প্রেমময় দৃষ্টি ও অনুভূতিতে কৃষ্ণের যে স্বরূপ উপলব্ধ হয়, তার আস্বাদন।

গ. কৃষ্ণকে ভালবেসে রাধার যে সুখ তার অনুভব।

এই তিন অপূর্ণ তৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্য স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ চৈতন্য রূপ ধারণ করেন, তিনি রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে কলিযুগে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন।

শ্রীচৈতন্যের এই স্বরূপ উপলব্ধি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে সম্পূর্ণভাবে প্রেমধর্মে রূপান্তরিত করেছে। প্রথম পর্যায়ে চৈতন্যপন্থীদের কাছে যে নাম সংকীর্তন ছিল মুখ্য কৃত্য, তা এক্ষণে গৌণ হয়ে পড়েছে, বলা হয়েছে—

অন্তরঙ্গ সনে করে রস আস্বাদন।

বহিরঙ্গ সনে করে নাম সংকীর্তন।।

এরই ফলে আমরা দেখতে পাই চৈতন্য-প্রভাব যুগে রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কবিতার অধিকাংশ কবি এই দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রেম-ভক্তি-রস আস্বাদনের পটভূমিতে কাব্য রচনা করেছেন। বাংলা গীতিকবিতায় বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতাদের যে বিপুল দান, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসকে বাদ দিলে তার প্রায় সবটাই দ্বিতীয় পর্যায়ের চৈতন্য অবতার তত্ত্বকে পটভূমিতে রেখে সৃষ্ট।

গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ এবং চৈতন্য জীবনীসাহিত্য এই দুটি বৈষ্ণব সাহিত্য শাখার অন্তর্ভুক্ত উপশাখা প্রত্যক্ষত চৈতন্য অবতাব-তত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট। চৈতন্য চরিতকার যে এই অবতার তত্ত্ব ব্যাখ্যানে বাংলা ভাষার অগ্রগণ্য লেখক সে কথা আমরা আগেই বলেছি। পরবর্তী বৈষ্ণব-জীবনী গ্রন্থগুলি, যার মধ্যে চৈতন্যদেব ছাড়াও অন্যান্য বৈষ্ণব মোহান্তদের জীবনকথা বিবৃত হয়েছে, সেইসব গ্রন্থগুলিরই ধর্মীয় দার্শনিক ভিত্তি পূর্বোক্ত অবতাব-তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে। এইসব গ্রন্থের মধ্যে 'অদ্বৈত মঙ্গল', 'প্রেম-বিলাস', 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী', 'ভক্তিরত্নাকর', 'বিবর্ত বিলাস' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

(১.ক). গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ

চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করে রচিত পদের সংখ্যা বড় কম নয়। তাঁর জীবৎকালেই এরূপ পদ রচনার সূত্রপাত। পরবর্তী কালে এই শ্রেণীর পদাবলীর ভাব ও রূপের ক্ষেত্রে বিবিধ পরিবর্তন দেখা গিয়েছে।

চৈতন্য সমকালীন গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদে লেখকদের মধ্যে পূর্বে উল্লিখিত বাসুদেব ঘোষ, মাধব ঘোষ, নরহরি সরকার ছাড়াও ছিলেন মুরারি গুপ্ত, গোবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি কবি। এঁদের কবিতার মধ্যে দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। যদিও সকলে শ্রীচৈতন্যকে ভগবান বলে মানতেন, তবু চৈতন্যের মানবিক অস্তিত্ব এঁদের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের বিষয় বলেই নানাসূত্রে সেই মানবরূপের চিত্র কবিতায় ফুটে উঠেছে। যেমন চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণকে উপলক্ষ্য করে বিষ্ণুপ্রিয়া এবং শচীমাতার শোক মানবিক বেদনা হিসেবেই পাঠকের চিত্ত দ্রব করে। দ্বিতীয়ত এই কবিদের কেউ কেউ 'নদীয়া নাগর' ভাবের উপাসক। তাঁদের কবিতার বৈশিষ্ট্য উদ্ধৃতিসহ আগেই উল্লেখ করেছি।

বৃন্দাবনের তত্ত্বভাবনা বৈষ্ণব সমাজের উপরে প্রভাব বিস্তার করার পরে প্রায় সব বৈষ্ণব পদকর্তাই শ্রীচৈতন্যদেবকে অবলম্বন করে কম বেশী পদ রচনা করেছেন। এইসব পদে গৌরাঙ্গকে রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। যেমন গোবিন্দদাস যখন গৌরাঙ্গের ভাব-ব্যাকুল মূর্তিটি অঙ্কন করে

লেখেন—

লহু লহু হাসনি গদ গদ ভাসনি
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে।

তখন প্রেম-বিহ্বলা রাধার মূর্তিটি যেন বর্ণনার মধ্য দিয়ে ব্যঞ্জিত হয়। আবার জ্ঞানদাসের নিম্ন-উদ্ধৃত পদে বৃন্দাবন-ব্যাখ্যাত গৌরতত্ত্বটি পরিপূর্ণ ভাবে প্রকটিত।

পূরবে আছিলা প্রিয়া রাধা গুণবতী।
এবে গদাধর সঙ্গে অধিক পিরীতি।।
অন্তরেতে শ্যাম হেম-বরণ উপরে।
অধিক উজর ভেল পুলক-নিকরে।।
বড় অপরূপ গোরাচান্দ অবতার।
জগতে উদিত কিয়ে করুণা আকার।।
রায় রামানন্দ শ্রী নরহরি দাস।
গোপীর স্বভাব ভাব সবে পরকাশ।।

এই দ্বিতীয় পর্বের গৌর-পদাবলীর মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের মানবমূর্ত্তির তুলনায় ভাবরূপ ও তত্ত্বরূপ প্রাধান্য পেয়েছে। এক. তিনিই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, লীলারস আস্বাদনের জন্য নবদ্বীপে অবতীর্ণ। দুই. তিনি রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণ অর্থাৎ একই দেহে রাধাকৃষ্ণের যুগ্মরূপ। তিন. তিনি হরিনাম রূপ মন্ত্রে এবং সংকীর্তনে কালব্যাধি দূর করেন। চার. তিনি শুধু ভগবানই নন-- ভক্তশ্রেষ্ঠ , ভক্তিমার্গে জীবকে প্রবর্তিত করেন।

কিছু পরবর্তীকালে লীলা-কীর্তন প্রবর্তিত হবার পরে এই দ্বিতীয় পর্যায়ের পদগুলি পালাকীর্তনের মুখবন্ধ রূপে 'গৌরচন্দ্রিকা' নামে বিশেষ ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে থাকে। গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদের সেই ধর্মীয় লক্ষ্যাভিমুখী ব্যবহারের বিষয়েক আলোচনা পরে করব।

(২). গৌড়ীয় দর্শনের মূল প্রত্যয়-- অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব

চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণবেরা ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে একটি নতুন চিন্তার প্রবর্তন করেন, 'অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব' নামে তার পরিচয়। কথাটির অর্থ হল স্বয়ং ভগবান এবং বিশ্ব—জড় জগৎ এবং জীব জগৎ— এরা কি এক ও অচ্ছেদ্য অথবা একাধিক? ভারতীয় দর্শনে সর্বদাই এটি একটি মূল প্রশ্নরূপে দেখা দিয়েছে। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, তিনি নিরাকার নির্গুণ এবং নিঃশক্তিক। জড় এবং জীব অস্তিত্বহীন— মায়াচ্ছন্ন অবস্থায় মাত্র তাদের প্রতীতি হয়। মায়ার আবরণ উন্মোচিত হলে বোঝা যায় ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। যাকে এতকাল জড় পদার্থ বলে মনে হচ্ছিল তা

আসলে ভ্রান্তিদর্শন, তা আসলে ব্রহ্মই। জীব যখন অনুভব করে এই সত্য, তখন সে বোঝে 'সো অহম্', তখনই জীবের মোক্ষ-মুক্তি, চরম পুরুষার্থ লাভ। ভক্তিবাদীরা এই তত্ত্বের বিরোধী। তাঁরা চিরকালই বলে আসছেন, 'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হত যে মিছে'। অদ্বৈতবাদ বিরোধী বিভিন্ন ভক্তিবাদী দ্বৈতবাদী দার্শনিক মতামতের মধ্যে চৈতন্য-পন্থীদের একটি নির্দিষ্ট অবস্থান আছে। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'সার্বভৌম-সংবাদে' তার প্রাঞ্জল পরিচয় দিয়েছেন।

প্রাচীন শাস্ত্র-বচনে-ব্রাহ্মণ-উপনিষদ প্রভৃতি ঋষিমুখ নিঃসৃত ভগবৎ-বাণীতে কখনো বলা হয়েছে ঈশ্বর অবয়বহীন-আকারহীন, নিঃর্গুন এবং নিঃস্ক্রিয়। আবার পাশাপাশি এমন কথাও বলা হয়েছে যে তিনি গ্রহণ করেন, তিনি চলেন। অচক্ষু হলেও তিনি দেখতে পান, অপানি হলেও ধরেন এবং অপাদ হলেও চলেন। চৈতন্যপন্থায় এর ব্যাখ্যা হল— জাগতিক প্রাকৃতিক মানদণ্ডে ভগবান রূপগুণহীন অবয়বহীন। কিন্তু সে তো পার্থিব রূপের বোধ, গুণের ধারণা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে ভগবানের হস্তপদাদি অলৌকিক-অপ্রাকৃত। তাঁর কার্যাদি গুণাদি অপ্রাকৃত-অলৌকিক। তিনি প্রেমস্বরূপ এবং লীলাময়। ঐশ্বর্যে তাঁর খণ্ডিত পরিচয় পাওয়া যায়, প্রেমেই তাঁর পূর্ণ পরিচয়। প্রেমময় ভগবানের কার সঙ্গে প্রেম? বিশ্বের সঙ্গে, বিশ্বের প্রাণীকুলের সঙ্গে, বিশ্বের নরনারীর সঙ্গে। এই প্রেমলীলার জন্য এক ব্রহ্ম বহু হয়ে যান, জড় জগৎ এবং জীব জগৎ রূপে। জড় এবং জীব যেমন ব্রহ্ম ছাড়া নয়, তেমনি জড় এবং জীব আবার ব্রহ্ম ছাড়াও। জড় এবং জীবের এই স্বাতন্ত্র্য ভগবানের সঙ্গে প্রণয়লীলার উদ্দেশ্যই।

ভারতীয় দার্শনিকেরা ঈশ্বর, জড় জগৎ এবং মানব জগৎ এই তিন অংশে বিভক্ত সৃষ্টিকে তাদের স্বরূপে এবং পারস্পরিক সম্পর্কে বুঝতে চান। মানব-জগৎ জীব বলেই সচরাচর আখ্যাত। অমানব প্রাণীদের জড়ের মধ্যেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে গণ্য করা হয়ে থাকে।

বাস্তববাদীরা জড়ের (অপ্রাণী) আদিমতা এবং প্রাধান্য স্বীকার করে। তাদের মতে আদিতে জড়ই ছিল। তা থেকে সমগ্র জীবকুলের উদ্ভব। ব্রহ্ম আসলে জীবের কল্পনা, এবং অস্তিত্বহীন।

দ্বৈতবাদী বলেন, ব্রহ্মই আদিতে, জড় এবং জীব ব্রহ্মের সৃষ্টি। জীবশ্রেষ্ঠ মানব-জীবনের চরিতার্থতা ব্রহ্মের ভজন-পূজনে। এই ভাবটিকে দ্বৈতবাদীদের বিভিন্ন মতাবলম্বী ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় গ্রহণ করেন। কিন্তু এঁরা সবাই আস্তিক্যবাদী, জড়বাদী নন, আবার অদ্বৈতবাদীদের মত মায়াবাদীও নন।

শ্রীচৈতন্য বলেন, পূর্ণ ব্রহ্ম হলেন ষড়্গুণান্বিত কৃষ্ণ— সর্ববিধ গুণ, শক্তি, এবং রূপের চরম কৃষ্ণে। কৃষ্ণের শক্তিকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করে তাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন—
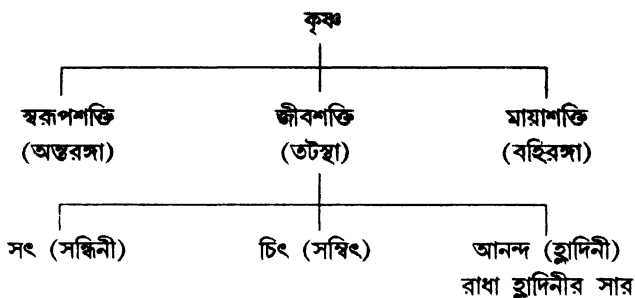
গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে কৃষ্ণের অনন্ত শক্তির যে অংশটি প্রত্যক্ষত তাঁর নিজস্ব তাকে অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি বলা হয়েছে। কৃষ্ণের যে শক্তি জীবরূপে প্রকট তাকে তটস্থা বলা হয়েছে। জড় জগৎকে বলা হয়েছে বহিরঙ্গা মায়াশক্তি। তাদের মতে মায়াও কৃষ্ণের শক্তি বিশেষ, যদিও বহিঃরঙ্গা। জীবের অবস্থান অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা এই দুই শক্তির সীমানায়। বহিরঙ্গা মায়ার প্রভাবে জীব কৃষ্ণ থেকে দূরবর্তী হতে চায়। অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তির আকর্ষণে জীব আবার কৃষ্ণাভিমুখী হয়, তার অবস্থা অনেকটা রবীন্দ্র-কবিতার মত, 'ঘরেও নহে পারেও নহে যে জন আছে মাঝখানে'। কৃষ্ণ থেকে দূরে এবং কৃষ্ণের অভিমুখে আকর্ষণ-বিকর্ষণের লীলাই জীবজগতের নিয়তি। আবার এই সমগ্র লীলাই ভগবানের লীলা, শক্তির বিচিত্র প্রকাশ।

বিষয়টিকে আরো সরল করে বুঝতে গেলে তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতা কিছুটা বিনষ্ট হবে, কিন্তু মোটা ধরণের একটা অর্থ পাওয়া যাবে, এই ভরসায় একটা সরল ব্যাখ্যা দিচ্ছি। ধরা যাক কোন ধনী ব্যক্তি তার অর্থ ভাণ্ডারের বড় অংশটা নিজের এবং স্বজনবর্গের জন্য ব্যয় করেন, আরো কিছুটা পরিচিত আশ্রিত ব্যক্তিবর্গের কাজে লাগে। ধনীর দান তৃতীযত সর্ব সাধাবণেব মধ্যেও কিঞ্চিৎ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তারা কোথায় কিভাবে তা কাজে লাগায় ধনী হয়তো তার খবর রাখেন না। এই যে তিন স্তরে ধনীর ধনের ব্যবহার— তার সবটাই তো ধনীর ধন—তিনি ইচ্ছা করেছেন বলেই সবটাই বন্টিত ও ব্যবহৃত। আমরা উক্ত ধনের প্রথমাংশকে 'স্বরূপ শক্তি', দ্বিতীয় অংশকে 'জীব শক্তি' এবং তৃতীয় অংশকে 'মায়া শক্তি' বলে কল্পনা করতে পারি। সবই কৃষ্ণের শক্তি। কিন্তু তাঁরই ইচ্ছায় কোনটা সরাসরি নিজের কাজে লাগে, কোনটা দূরের। কৃষ্ণের শক্তির বাইরে কেউ নেই কিছু নেই, সেই অর্থে চূড়ান্ত অভেদ। কিন্তু অভেদের মধ্যে ভেদ, সবই অন্তরঙ্গা স্বরূপ নয়, কিছু আছে তটস্থা জীব কোটিতে, কিছু আছে বহিরঙ্গা মায়া কোটিতে। একেই বলে অভেদের মধ্যে ভেদ এবং ভেদে অভেদ। ভেদ ও অভেদের এই বোধ চিন্তায় ধরা

যায় না, তাই বলা হয়েছে, অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব।

ভেদাভেদ যাই হোক না কেন স্বরূপ কোটি, জীব কোটি, এবং জড় কোটির অবস্থান অপরিবর্তনীয়। জড় ও জীবে, জীব ও জড়ে, অথবা জীব স্বরূপে, স্বরূপ জীবে রূপান্তরিত হয় না। প্রতিটি কোটির নিজস্ব অবস্থান একটি চির সত্য।

অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তির তিনটি অংশ কল্পনা করা হয়েছে। ভগবান কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ। তাঁর অনন্ত গুণরাশিকে সৎ চিৎ এবং আনন্দ এই তিন স্তরে ভাগ করে দেখা হয়েছে। কৃষ্ণের সৎ অংশে সন্ধিনী শক্তি, চিৎ অংশে সম্বিৎ শক্তি, এবং আনন্দ অংশে হ্লাদিনী শক্তি। সন্ধিনী শক্তিতে কৃষ্ণের অনন্তত্ব, সম্বিতে পরম চৈতন্য স্বরূপ দ্যোতিত হয়। এই দুটিকেই বৈষ্ণবেরা বলেন আনন্দের বিশেষণ। কারণ কৃষ্ণ আনন্দময়— এটিই তাঁর মূল পরিচয়, তিনি মধুব, 'মধুর তোমার শেষ যে না পাই'। চৈতন্যচরিতকার বলেছেন—'ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীতি'। ঐশ্বর্যে প্রেম শিথিল হয়ে পড়ে। এই মাধুর্যময় ভগবান কৃষ্ণ তাঁর অনন্ত স্বরূপে, তাঁর পরম চেতন স্বরূপে শুধুই আনন্দময়। আবার এই আনন্দের চরম প্রকাশ রাধায়। রাধাকে বলা হয়েছে হ্লাদিনী, শক্তির সারভূতা বিগ্রহ। তাহলে রাধা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে কৃষ্ণের মূল শক্তির নির্যাস।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বিশ্বাস অনুযায়ী, প্রেমময়। তিনি ঐশ্বর্যবান হলেও, শক্তির দ্বারা পাপের বিনাশ ও পুণ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটালেও, সেগুলি যে তাঁর গৌণ পরিচয় আগেই সে কথা বলা হয়েছে। মথুরা, দ্বরকা, কুরুক্ষেত্রে তাঁর যে লীলা— যা মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য বিষ্ণুপুরাণগুলিতে বলা হয়েছে, তাতে কৃষ্ণের গৌণ পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর মুখ্য পরিচয় বৃন্দাবনে। এই কারণে বাংলার ভক্ত বৈষ্ণব বলে ব্রজ বা বৃন্দাবনের রজঃ অর্থাৎ ধূলিকণাও তার কাছে পরম পবিত্র। কৃষ্ণের এই মধুর রসের লীলা বৈষ্ণব ভক্তের সাধনার ভিত্তি এবং বৈষ্ণব কাব্যের মূল প্রেরণা স্বরূপ। এই বিষয়ে প্রবেশের জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের একটি বিশেষ তত্ত্ববোধের আলোচনা করা প্রয়োজন। সেই তত্ত্বটি সাধ্য-সাধন তত্ত্ব নামে পরিচিত।

(৩). সাধ্য-সাধন তত্ত্ব

সাধ্য শব্দটির একটি ধর্মীয় তাৎপর্য আছে। ভক্ত বা সাধক তার সাধনার দ্বারা কি পেতে চায়? কোন লক্ষ্যে সে পৌঁছতে চায়? যেমন অদ্বৈতপন্থী জ্ঞানমার্গী সাধ্য হল মোক্ষ লাভ, তিনি এই বোধে পৌঁছতে চান যে তিনিই ব্রহ্ম। তাঁর সাধ্য বস্তু হল মোক্ষ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা কি লক্ষ্যে সাধন ভজন করেন, তার স্বরূপ জানা যাবে 'সাধ্য' বস্তুটির বিচার-বিশ্লেষণে। আবার সাধন হল সাধ্যবস্তু প্রাপ্তির

উপায়। কি ধরণের ভজন-পূজন-যোগ-ধ্যান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সাধক তাঁর সাধ্যে গিয়ে পৌঁছবেন সে বিষয়ে ব্যাখ্যাই হল 'সাধন তত্ত্ব'। যেমন একজন সহজিয়া বৌদ্ধ কায়া সাধন এবং কায়া সাধনের মধ্য দিয়ে বোধিসত্ত্বকে সব দ্বৈতবোধ এড়িয়ে অবধূতিকা মার্গে পরিচালিত করেই সাধ্য বস্তু (সহজিয়া বৌদ্ধদের মতে মহাসুখ) লাভ করতে চায়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সাধ্য বস্তুর স্বরূপ এবং সাধ্য বস্তু প্রাপ্তির জন্য সাধনার স্বরূপ নানা তত্ত্বগ্রন্থে নানাভাবে ব্যাখ্যাত হলেও মনোরম এবং সাবলীল ভঙ্গীতে বিশ্লেষিত হয়েছে 'চৈতনচরিতামৃতে' রায় রামানন্দ সংবাদে।

রামানন্দ পট্টনায়ক ছিলেন বৈষ্ণব তত্ত্বের এক প্রধান পুরুষ। নীলাচলের চৈতন্য-পরিকরদের মধ্যে তাঁর স্থান ছিল অত্যন্ত উচ্চে। পুরীর রাজা প্রতাপ রুদ্রের তিনি এক প্রধান অমাত্য ছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব ভরতের এক বিরাট ভূখণ্ডের তিনি ছিলেন রাজ্যপাল। চৈতন্যদেবের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে প্রশ্ন- উত্তরের মধ্য দিয়ে এই সাধ্য সাধন তত্ত্বটি ব্যাখ্যাত হয়।

বৈষ্ণবদের মতে সাধ্যবস্তু বা মানুষের পুরুষার্থ হল প্রেম বা প্রেম ভক্তি। প্রথমেই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ধর্ম-অর্থ-কাম এগুলি মানব জীবনের সাধ্য নয়। এমন কি মোক্ষও মানুষের পুরুর্ষার্থ নয়। তাঁদের মতে মোক্ষ-বাসনা জীবনকে ধর্ম-অর্থ-কামের তুলনায় আরো বেশী সত্য বিমুখ করে।

অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষবাঞ্ছা আদিসব।।
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান।।

বৈষ্ণব ভক্ত মনে করে যে জীবের পক্ষে মোক্ষের সাধনাও অজ্ঞতার চরম অন্ধকার। কারণ জীব কখনো ব্রহ্ম অর্থাৎ কৃষ্ণ হতে পারে না। জীব স্বরূপত কৃষ্ণের নিত্যদাস, স্বরূপ শক্তির অংশও সে নয়। সুতরাং কৃষ্ণের সঙ্গে তার এক হবার প্রশ্নই ওঠে না।

তাহলে ভক্ত বৈষ্ণবদের পক্ষে সাধনার লক্ষ্য কি হতে পারে? ভক্ত বৈষ্ণব চায়'প্রেমভক্তি' সে যে ভগবান কৃষ্ণের থেকে স্বতন্ত্র, এই স্বাতন্ত্র্যে থেকে সে কৃষ্ণের প্রতি প্রেমভক্তি অনুভব করতে চায়।

এখানে সহজিয়া আরোপ সাধনের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার মূলেই রয়েছে পার্থক্য। আরোপ সাধক প্রতিটি পুরুষে কৃষ্ণ এবং প্রতিটি নারীতে রাধার অস্তিত্ব কল্পনা করে। তাদের মধ্যে প্রণয়-লীলাকে ভক্তি-মুক্তির পথ বলে সহজিয়া বৈষ্ণবেরা মনে করে। ইসলামী সূফীপন্থী ভক্ত ভগবানের মধ্যে আশিক ও মাশুক অর্থাৎ প্রণয়ী-প্রণয়িনীর সম্পর্ক কল্পনা করে। খ্রীষ্টান মিষ্টিকেরাও তাই। এদের সকলের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পার্থক্যটি স্পষ্ট। সেই পার্থক্য বুঝে নেবার

আগে আমরা কৃষ্ণ-রাধার প্রণয়লীলা সম্পর্কে আরো দু একটি কথা বলে নেব।

আগেই উল্লেখ করেছি যে রাধাই কৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির শ্রেষ্ঠ অংশ। যে হ্লাদিনী— তারই সারভূতা বিগ্রহ। তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণের কোনরূপ পার্থক্যও করা যায় না। চন্দ্র ও জ্যোৎস্না যেমন, অগ্নি ও দাহিকা যেমন, তেমনি কৃষ্ণ ও রাধা। তাত্ত্বিক তাই বলেন—

রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাই শাস্ত্রের প্রমাণ।।

একের মধ্যে দুয়ের যে অনুভব সে শুধু লীলারস আস্বাদনের জন্য। এখানেই অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের নিগূঢ় তাৎপর্য। রাধা কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি এবং স্বকীয়া, স্বরূপ শক্তি স্বকীয়া ছাড়া হতে পারে না। অপ্রকট বৃন্দাবনে স্বকীয়া রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের নিত্য লীলা চিরকাল চলছে। কিন্তু পরকীয়া না হলে, মিলনের পথে বাধা না ঘটলে লীলার পুষ্টি হয় না। তাই প্রকট বৃন্দাবনে দ্বাপরে রাধা কৃষ্ণের পরকীয়া। প্রণয়লীলার পুষ্টির জন্য সখীদের প্রয়োজন। সখীরাও রাধার কান্তির বিচ্ছুরণ— রাধারই অংশ। গৌড়ীয় পরিভাষায় 'রাধার কায়া ব্যূহ'। দ্বাপরে প্রকট বৃন্দাবনে সখীদেরও পরকীয়া অভিমান। তাঁরা অপরাপর গোপের স্ত্রী, তাই কৃষ্ণের সঙ্গে রাধা-প্রেমের মত গোপীদের প্রেমও পরকীয়া। সখীতত্ত্ব এবং গোপীতত্ত্বের আলোচনায় জীব গোস্বামী এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই বিষয়টি খুবই ভালভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

নিত্য বৃন্দাবনে কৃষ্ণের প্রেমলীলা যদি অবাধ হয় তা হলে কেন দ্বাপরে বৃন্দাবনে তিনি প্রকট হলেন? এই কথার উত্তর দিতে গিয়ে বৈষ্ণবেরা প্রধান যে কারণটি দেখান তাহল, নিত্য বৃন্দাবনে পরকীয়া রসের আস্বাদ তিনি পান না, তার জন্য প্রয়োজন লৌকিক বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ এবং রাধার পরকীয়াত্ব। অন্য কারণ বাল্য ও কৈশোরের বাৎসল্য ও সখ্য রসের আস্বাদন। নিত্য বৃন্দাবনে তিনি চিরতরুণ বলে শৈশব ও কৈশোরোচিত রসাস্বাদন থেকে বঞ্চিত। এই অপূর্ণতা দূর করবার জন্য পার্থিব বৃন্দাবনে তাঁর আবির্ভাব। তৃতীয় কারণ হল, রাধা কৃষ্ণের প্রণয়ের প্রত্যক্ষ রূপটি লোক সমক্ষে উপস্থাপন, যাতে প্রেমময় কৃষ্ণের স্বরূপ এবং রাধা-প্রেমের গভীরতা ও তাৎপর্য মর্তের মানুষ অনুভব করতে পারে।

রাধা ছাড়া বৈষ্ণব ধর্ম সাধনা বন্ধ্যা। রাধাই তটস্থা জীবকে কৃষ্ণ অভিমুখী হবার পথ দেখায়। জীব স্বভাবতই জড় অভিমুখী। তার মধ্যে থাকে ধর্ম-অর্থ-কামের বাঞ্ছা। এগুলি সব জড় বাসনা। একদিকে জড়ের আকর্ষণ অন্যদিকে ভ্রান্ত লক্ষ্য মোক্ষের আহ্বান। এই দুই কৈতব থেকে রাধা জীবকে কৃষ্ণপ্রেমের দিকে নিয়ে যান। এখানে রাধার একটি অনন্যসাধারণ শক্তির ইঙ্গিত আছে। রাধা স্বরূপ শক্তি হলেও জীবকোটিতে তাঁর প্রবেশ আছে। কাজেই বৈষ্ণবের গুরু শিরোমণি হলেন রাধা। কিন্তু রাধা কি জীবকে স্বরূপ শক্তিতে রূপান্তরিত করেন? তা করেন না।

কারণ জীব স্বরূপত কৃষ্ণের নিত্য-দাস, কৃষ্ণের সঙ্গে তার সরাসরি প্রেম হতে পারে না, যেমন প্রেম কৃষ্ণে রাধায় এবং গোপীতে, তাকে বলে রাগাত্মিকা। রাগই অর্থাৎ প্রেমই তাঁদের সম্পর্কের আত্মা অর্থাৎ প্রাণ স্বরূপ। জীবের কৃষ্ণ প্রেম রাগানুগা অর্থাৎ রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের আনুগত্যময়ী সেবা। এখানেই বৈষ্ণব ভক্তের সাধ্য বস্তুর পরিচয় পাওয়া যাবে। ভক্ত বৈষ্ণব সাধনার মধ্য দিয়ে গোপী হতে চায়। ললিতা বিশাখার মতো গোপী নয়, তারা রাধার কায়া ব্যুহ— কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির অংশ। তাঁদের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ প্রণয়লীলা। বৈষ্ণবেরা আর এক শ্রেণীর গোপীর কল্পনা করে থাকে, যাঁদের বলা হয় মঞ্জরী। ভক্ত বৈষ্ণব সাধনায় সিদ্ধি লাভ করলে মঞ্জরীত্ব প্রাপ্ত হয় এবং নিত্য বৃন্দাবনে স্থান লাভ করে। ভক্ত বৈষ্ণবের বাসনা কবে সে মঞ্জরী হবে—

কবে বা এমন হব
ছাড়িয়া পুরুষ দেহ কবে বা রমণী হব
দুজনে নূপুর পরাইব।

মঞ্জরীর সঙ্গে কৃষ্ণের সরাসরি প্রেম হয় না। মঞ্জরী রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের দর্শক এবং সেবাপরায়ণা দাসী। স্বরূপ শক্তির অন্তর্গত গোপীরা—ললিতা, বিশাখাদি কিন্তু কৃষ্ণের প্রণয়-লীলার সঙ্গিনী।

তাহলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে সাধ্যবস্তু হল মঞ্জরীত্ব প্রাপ্তি এবং সাধনা হল কীর্তন ভজন পূজন রসানুভব রসালোচনা ইত্যাদি।

এবারে আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও কয়েকটি বিষয়ের দিকে দৃকপাত করব। যেমন

(ক). রস-পর্যায়

চূড়ান্ত সাধনা মধুর রসের সাধনা। কিন্তু বৈষ্ণবেরা সাধনার আরো চারটি তুলনামূলকভাবে নিম্ন স্তরের কথা বলে থাকেন। তা হল— শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য। এর মধ্যে শান্তরসের যে সাধনা তা অনেকটা জ্ঞানমিশ্র ভক্তি সাধনার কাছাকাছি। সেখানে হৃদয়াবেগ উদ্বেল হয়ে ওঠে না। প্রশান্ত সে মানসিকতায় ভক্তির উন্মেষ মাত্র হতে পারে, বিকাশ নয়। এ কারণে বৈষ্ণবেরা এই মার্গকে নিম্ন মার্গের সাধন মনে করে।

দাস্য রসের সাধনায় ভক্ত নিজেকে দাস বলে অনুভব করে। ভারতীয় পরিবারতন্ত্রে প্রভু ভৃত্যের মধ্যে শুধুই প্রয়োজন ও কর্তব্যের নয়, হৃদয়ের সম্পর্কও স্থাপিত হতে দেখা যায়। মথুরা বৃন্দাবনে, অক্রূর প্রভৃতির মধ্যে এই দাস্য ভক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। শান্ত ভক্তের তুলনায় এখানে হৃদয়াবেগ কিছুটা বিকশিত। কিন্তু সর্বদাই প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের দ্বারাই সীমাবদ্ধ।

সখ্য ভক্ত হৃদয়াবেগের দিক থেকে আরো উন্নত স্তরের। সে ঈশ্বরকে সমান জ্ঞান করে। কাজেই ভালবাসা এখানে বাধাহীন হয়ে ওঠে।

বাৎসল্য ভক্তি আরো উন্নত স্তরের। ভক্ত ঈশ্বরকে শিশু বলে মনে করে, তাঁকে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ভেবে মাতাসুলভ যে প্রীতি ও পালক পালিতের ভাব, তাকে ভক্তিমার্গের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্তর বলে বৈষ্ণবেরা মনে করে।

কিন্তু মধুর রসের সাধনা অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক অনুভব, রাগানুগা প্রণয় সম্পর্ক বৈষ্ণব ভক্তের সর্বোত্তম সাধন পন্থা।

(খ). পরিবেশন রীতি

কীর্তনগান ও কৃষ্ণ যাত্রা

বৈষ্ণবেরা নাম সংকীর্তন করে নগর ও পল্লীর পথে পথে ভ্রমণ করে বৈষ্ণবী ধর্মভাবনা প্রচার করত। চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণবদের আশ্রম ও আখড়া বঙ্গদেশের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমস্ত বৈষ্ণব কেন্দ্রে পদাবলী অবলম্বনে লীলা সঙ্গীত ধর্ম-সাধনার অঙ্গরূপে প্রচারিত হয়। আশ্রমের বৈরাগীরা গৃহস্থ বাড়িতে গান গেয়ে ভিক্ষা করে। এই গানগুলির মধ্যে নামগান, প্রার্থনা সঙ্গীত, বাৎসল্য-সখ্য রসের গান, গৌরাঙ্গ-বন্দনা প্রভৃতির প্রাধান্য। তবে রস পর্যায়ের প্রণয়মূলক পদও যে কখনো গান করা হত না এমন নয়। অন্তরঙ্গ সনে রস আস্বাদন এবং বহিরঙ্গ সনে নাম সংকীর্তন, এই কঠোর নীতি পদাবলী কীর্তন প্রবর্তিত হবার পরে সম্ভবত আর রক্ষিত হয়নি। রাধা কৃষ্ণের প্রণয়লীলার রস আস্বাদনের অধিকার শুধু সাধক বৈষ্ণবের নয়, সর্বসাধারণের অধিকার এবং এই প্রেমগীতি তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলবে ভক্তিভাব। সর্বসাধারণের ভক্তিভাব প্রচার বৈষ্ণব ধর্ম-প্রধানদের অন্যতম কৃত্যরূপে দেখা দিয়েছিল। শুধু নিজে সাধন ভজন করে সাধ্যবস্তুর প্রাপ্তি নয়, সাধ্যবস্তুর প্রতি অন্যকেও প্রবণ করে তোলা বৈষ্ণব সাধকদের কাছে কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়েছিল।

গরাণহাটি, মনোহরশাহী, রেনেটি প্রভৃতি কীর্তন-রীতির উদ্ভাবন ও বিস্তার বৈষ্ণব পদ সাহিত্যকে এবং বৈষ্ণব ধর্ম সাধনাকে পরস্পর সম্পৃক্ত করে তোলে। পালা কীর্তনে এমন দুটি কৌশল সংযোজিত হয় ধর্ম-সাধনার দিক থেকে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(গ). গৌরচন্দ্রিকা

পালার মূল রস অনুযায়ী রাধাভাবে ভাবিত গৌরাঙ্গের লীলামূলক পদ প্রথম গান করে মুখবন্ধ করা হত। তাতে রাধার প্রণয়-বিরহ গৌরাঙ্গের কৃষ্ণ

বিরহের ভূমিকায় আধ্যাত্মিক ধর্ম ব্যাকুলতার তাৎপর্য লাভ করত। রাধার মানভঞ্জন পালাকীর্তনের সূচনায় এমন কতকগুলি গৌর বিষয়ক পদ গান করা হত যাতে রাধাভাবে ভাবিত গৌরাঙ্গের ভক্তি ব্যাকুল চিত্তের মান অভিমানের সুরটি প্রাধান্য পেয়েছে। এই গৌরচন্দ্রিকা গানের দ্বারা কীর্তনীয়া শ্রোতাদের মনের তারকে একটা বিশেষ ভক্তিভাবের সুরে বেঁধে দিত। ভগবানের জন্য প্রেমিক ভক্তের চিত্তে যে মান-অভিমান তারই প্রসারিত অভিব্যক্তি রূপে রাধাকৃষ্ণের মান অভিমান মূলক, আপাত মানবিক ভাব রসের পদগুলি একটা ধর্মবোধের স্তরে উঠে যেত।

(ঘ). আখর

কীর্তনগানে আখর সংযোজনের রীতিটি ধর্মভাবনার প্রতিক্রিয়ায় দেখা দেয়। লীলা কীর্তন গাইতে গাইতে মূল গায়েন মাঝে মাঝে গান থামিয়ে তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যোগ করে, এই সংযোজনকে আখর বলে। গদ্যে বা সুরে দু' রকমেই আখর দেবার রীতি ছিল। কখনো কখনো দু'চার চরণ নতুন গান আখর হিসেবে সংযোজিত হত। সাধারণভাবে দেখলে পদাবলীর অনেক কবিতাই মানব প্রেমের কবিতা রূপে গ্রাহ্য। কিন্তু আখরের সংযোগে তা কীর্তনের আসরে আধ্যাত্মিক আবেদন নিয়ে দেখা। যেমন গোবিন্দদাসের বর্ষাভিসারের পদে বৃষ্টিধোয়া পিচ্ছিল পথে রাধার অভিসার যাত্রার প্রসঙ্গটি গাইতে গাইতে কীর্তনীয়া আখর যোগ করল, যুগে যুগান্তরে কত মুনি ঋষি 'ক্ষুরস্য ধারা' পথে সেই পরমকে পাবার জন্য চলেছেন। এইরূপ আখর কবিতায় বা গানে একটি অতিরিক্ত ধর্ম ব্যাখ্যান নিয়ে আসে।

(ঙ). কৃষ্ণযাত্রা

বৈষ্ণব আখ্যান এবং পদাবলী অবলম্বন করে মধ্যযুগে কৃষ্ণযাত্রার ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। কৃষ্ণ, রাধা এবং সখীদের বেশভূষা ধারণ করে এই কৃষ্ণযাত্রা পালাগুলি পরিবেশিত হত, গানই বেশী থাকত। কিছু কিছু কথা যাত্রাকারেরা যোগ করত। গোবিন্দ অধিকারী থেকে কৃষ্ণকমল গোস্বামী পর্যন্ত কেউ কেউ ধর্মবেত্তা ছিলেন, কেউ সাধারণ স্তরের পারফর্মার। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের মূল কথা সব অধিকারীই জানতেন এবং প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিক ভাবে পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়ে স্তব স্তোত্র ব্যাখ্যা ইত্যাদির আকারে বৈষ্ণব ভাবনাটি প্রচারের চেষ্টা করতেন। শুধুই মানবিক প্রণয় আখ্যানের উপরে নির্ভর করতেন না।

পাঁচ
বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে ধর্মভাবের প্রতিফলন

বাংলা বৈষ্ণব কবিতার কালানুক্রমিক তিনটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। প্রথম স্তর শ্রীচৈতন্য আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত। তার পরিচয় আমরা পূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে দিয়েছি। দ্বিতীয় স্তরটি চৈতন্য সমসাময়িক। সেখানে গৌর বিষয়ক পদাবলীর প্রাধান্য। কিছু সরাসরি গৌরাঙ্গ জীবনী আশ্রয়ী ভক্তিমূলক এবং কিছু 'নদীয়া-নাগর' ভাবের। এদের কথাও এই অধ্যায়ের প্রথম দিকে আলোচনা করেছি। বৈষ্ণব পদ সাহিত্যের তৃতীয় স্তরটি হল বৃন্দাবনী তত্ত্বভাবনা, যার বিশ্লেষণ আমরা অনেকটা জায়গা জুড়ে সদ্য করলাম তার প্রভাবে রচিত। বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের যে সমৃদ্ধি এবং প্রাচুর্য তার অনেকটাই এই তৃতীয় স্তরে রচিত। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসকে বাদ দিলে উচ্চ এবং মধ্য শক্তির অনেক কবি প্রচুর কবিতা লিখেছেন এবং এই বিপুল কাব্য সম্ভারটি বৈষ্ণব ধর্মভাবনা এবং বৈষ্ণব ধর্মসাধনার সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত।

এই পর্যায়ের কবিদের মধ্যে জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, প্রেম দাস, কবিবল্লভ, রাধা বল্লভ, ঘনশ্যামদাস, নরহরি চক্রবর্তী, বসন্ত রায়, জগদানন্দ, রাধামোহন ঠাকুর, শেখর প্রভৃতি অনেক কবির নাম করা যায়, যাঁরা কেউই কবি হিসেবে তুচ্ছ নন। অনেকে তো বেশ বড় মাপের।

এঁরা সকলেই দীক্ষিত বৈষ্ণব। কেউ গৃহস্থ, কেউ আশ্রমিক। কিন্তু সকলেই বৈষ্ণব ভক্তি সাধনার অঙ্গ হিসেবে কবিতা লিখেছেন। বৈষ্ণব ধর্মকেন্দ্রগুলির সঙ্গে গৃহীদেরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সকলেই শিক্ষিত এবং ধর্ম ও তত্ত্ব ভাবনায় সকলেরই প্রবেশ ছিল।

সেকালে বৈষ্ণব কবিতা, মঙ্গলকাব্য, রামায়ণাদির অনুবাদ যাই হোক লিখবার কালে কবিরা শুদ্ধ সাহিত্যিক প্রেরণার বশবর্তী হয়ে লিখতেন না। প্রত্যক্ষ প্রেরণা প্রায় সর্বদাই ছিল, ধর্ম, ভক্তি ও পূজার। কিন্তু একটি দুটি প্রশ্ন করা যেতে পারে। সব ভক্তই কি কবি ছিলেন? অনেক বড় বড় বৈষ্ণব ধর্মসাধক বা মোহান্ত কাব্য রচনা করেননি। কাজেই দেখা যায় সব ভক্তই কবি নন। যদিও সব কবি ছিলেন ভক্ত। অর্থাৎ কাব্য রচনার একটি স্বতন্ত্র প্রেরণা যে সব ভক্তের মধ্যে ছিল তাঁরাই কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই কাব্যিক প্রেরণাটি বিশুদ্ধ ছিল না, কারণ তাঁদের অন্তরের ভক্তিভাবের সঙ্গে এই প্রেরণার একটি রাসায়নিক মিশ্রণ ঘটে যেত। তাই এই যুগের বৈষ্ণব পদাবলীর প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তীর মত কাব্যরসিক লোক যখন বলেন যে, বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য বৈষ্ণব তত্ত্বের রসভাষ্য, তখন তা অস্বীকার করা যায় না।

ধর্মবোধ ও ভক্তিভাব গভীরভাবে প্রকাশ পেলেই রচনাটি ভাল কাব্য হয়ে

ওঠে একথা আমরা মনে করি না। কিন্তু ধর্মবোধ ও ভক্তিভাব কোন রচনায় প্রকাশ পেলেই তার কাব্যগুণ খর্ব হয় এরূপ সিদ্ধান্ত আমরা মানতে পারি না। ধর্ম সম্পৃক্ত হলেও রচনা উঁচু স্তরের হতে পারে। আবার ধর্মভাবের দিক থেকে যথার্থ আন্তরিক ও উচ্চ স্তরের রচনাও কাব্যগুণে ন্যূন হতে পারে। ধর্ম ও কাব্যত্ব এই দুটি বিষয়কে আমরা গুলিয়ে ফেলার পক্ষপাতী নই। তবে মধ্যযুগের বাংলা কাব্য, বিশেষত বৈষ্ণব কবিতার অধ্যয়ন ধর্মবোধ নিরপেক্ষ হতে পারে না।

আগেই বলেছি বৈষ্ণব কবিরা সকলেই ধর্ম সাধনার অঙ্গ হিসেবে পদ রচনা করেছেন। যাঁরা পদ রচয়িতা নন তাঁরাও পদকীর্তনের রসাস্বাদের মধ্য দিয়ে সাধন মার্গে অগ্রসর হতে চেয়েছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় এই রসানুভব যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সে কথা আমরা আগেই বলেছি। কবিরা, কীর্তন গাইয়েরা এবং শ্রোতারা সকলেই কাব্য সাধনার মধ্য থেকে তাঁদের বিশ্বাস অনুযায়ী ঈশ্বর সাধনাই করতেন। তাঁরা রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার দ্রষ্টা, সাক্ষী হিসেবে সেবার মনোভাব নিয়ে যেন পদগুলি লিখতেন বা গাইতেন বা শুনতেন। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-পদাবলীর প্রাচুর্য এই সময়ের বৈষ্ণব পদাবলীর একটি বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার আগে বৈষ্ণব পদাবলীতে ধর্ম বিশ্বাসের প্রতিফলন নিয়ে কয়েকটি কথা সূত্রাকারে বলতে চাই।—

১. গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচনা বৈষ্ণব কবিদের অবশ্য কৃত্য ছিল। গৌরাঙ্গ বিষয়ক সব কবিতায়ই চৈতন্য আবির্ভাব সংক্রান্ত বৃন্দাবনের অবতার তত্ত্বটি প্রকাশ পেত।

২. দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এই তিন ভাবের এবং রসের সাধনার গুরুত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা মানতেন এই সব রসাশ্রয়ী কবিতাও বৈষ্ণব পদাবলীর পরিধি বাড়িয়ে তুলেছে।

৩. প্রার্থনামূলক কিছু কবিতা রচিত হত। বিদ্যাপতির প্রার্থনা বিষয়ক পদাবলীর সঙ্গে নরোত্তম দাস ঠাকুরের পদের তুলনা করলেই বোঝা যাবে পার্থক্যটি কোথায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবি বৃন্দাবন-ব্যাখ্যাত সাধ্য-সাধন তত্ত্ব অনুযায়ী 'মঞ্জরী' শ্রেণীর সখীভাবে ভাবিত হয়ে প্রার্থনা সঙ্গীত লিখতেন। মঞ্জরী সখী রূপে রাধাকৃষ্ণ প্রণয়ের আনুগত্যময়ী সেবা তাঁদের সাধক-জীবনের চরম কাম্য ছিল। এই ভাবটি বারংবার তাঁদের লেখা পদে প্রকাশ পেয়েছে।

৪. এই পর্যায়ের বৈষ্ণব কবিরা রাধা কৃষ্ণের মধুর রসের কবিতা রচনা করতে গিয়ে সর্বদাই বৈষ্ণবীয় রস-পর্যায় বিভাগগুলি অনুসরণ করে চলেছেন। সাধারণ ভাবে পূর্বরাগ অনুরাগ আক্ষেপানুরাগ অভিসার সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ রসোদ্গার, মাথুর বিরহ ভাবসম্মেলন প্রভৃতি পর্যায় অনুযায়ী পদ রচনা করেছেন। প্রত্যেকটি পর্যায়ের মধ্যে বিবিধ উপপর্যায়ের পরিকল্পনাও বৈষ্ণব রসতাত্ত্বিকেরা করেছিলেন। যেমন অভিসারের মধ্যে দিবাভিসার, জ্যোৎস্নাভিসার,

বর্ষাভিসার প্রভৃতি। প্রতিটি রসপর্যায় এবং উপপর্যায়ের ধর্মসাধনগত তাৎপর্যের কথাও তাত্ত্বিকেরা বলেছেন। বৈষ্ণব পদকর্তারা সেই পর্যায় বিভাগ ও তত্ত্ব ব্যাখ্যান অনেকেই মনে রেখে কবিতা লিখেছেন।

জ্ঞানদাসের রচিত পদ—

শিশু কাল হৈতে বন্ধুর সহিতে
পরাণে পরাণে নেহা।
না জানি কি লাগি কো বিহি গঢ়ল
ভিন ভিন করি দেহা।।

সরল অর্থে রাধা প্রেমের গভীর ব্যাকুলতা এর মধ্যে দ্যোতিত হলেও একটু অন্তর্মুখী দৃষ্টি প্রয়োগ করলে এর সঙ্গে জড়িত তত্ত্ববোধটি চোখে পড়বে। রাধা এবং কৃষ্ণ যে একই, তাঁদের মধ্যে যে কোন ভেদ নেই, মধুর লীলার জন্য এক হয়েছেন দুই, এই ভাবটি মনে না পড়ে পারবে না।

গোবিন্দদাসের অভিসারের পদ—

কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।।

রাধাকে কৃষ্ণের অভিসারে যেতে হবে, তাই সে নানাভাবে নিজেকে প্রস্তুত করছে। অন্ধকার রাত্রে পথের কাঁটা মাড়িয়ে যেতে হবে যাতে পুরজন টের না পায়, পায়ের নূপুর শব্দহীন করতে হবে, বৃষ্টিতে পিছল পথে আঙুল চেপে চলতে হবে, তাই রাধা আগে থেকে মাটিতে কাঁটা পুঁতে কলসির জল উঠানে ঢেলে দিয়ে দুরূহ অভিসার-যাত্রা অভ্যাস করছে। এই অভ্যাস আসলে রাধার সাধনা। ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে এই দুরূহ পথে চলার শিক্ষাই এই কবিতার মুখ্য আবেদন।

আর গোবিন্দদাস যখন লেখেন—

মন্দির বাহির কঠিন কবাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।।
তঁহি অতি বাদর দরদর রোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল।।
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস সুরধুনী পার।।
ঘনঘন ঝনঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণ মরম জরি যাত।।
দশদিশ দামিনি দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন তার।।

ইথে যব সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ।।
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কি য়ে যতনে নিবার।।

আমরা পদটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করলাম একটি কারণে। এটির মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ভাব সাধনা অতি চমৎকার ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ভক্তের ঈশ্বর সাধনা প্রেমের সাধনা হলেও কি কঠিন ব্রতে তাকে সেই প্রণয় প্রতিমাকে লাভ করতে হয়, প্রতিদিনের সংসারের ভোগসুখ কঠিন কবাটে বন্ধ করে প্রচলিত প্রথানুগ ধর্মের শৃঙ্খল, সেখানে শুদ্ধ প্রেমা কত প্রবল হয়ে উঠলে সব প্রতিবন্ধকতা দূর করে সর্বাতিশয়ী হয়ে উঠতে পারে তার নিদর্শন রাধার পরকীয়া প্রেমে। প্রায় সব কবির লেখাতেই এই বাধা ও বাধা উত্তরণের প্রসঙ্গ নানা ইঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে। বৈষ্ণব ভক্তের কাছে পরকীয়া রাধা প্রেমের শিক্ষাটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সংসারের ভোগ প্রতিষ্ঠা স্বীকৃতি এ সবই বন্ধন। সেই বন্ধনকে অতিক্রম করে যাবার শিক্ষা, প্রথার বাইরে প্রেমের মুক্তি। গার্হস্থ্য নীতি নিয়মের ঊর্ধ্বে হৃদয়কে স্থাপন করা। এই ভাবটি পরকীয়া প্রেমের রূপায়ণে বৈষ্ণব কবিরা বারংবার দেখিয়ে দিয়েছেন।

বৈষ্ণব পদকর্তাদের ভণিতাটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার। এগুলি মামুলি ভণিতা মাত্র নয়। রাধার দুঃখে কবির দুঃখ, সুখে সুখ, আশঙ্কায় আশঙ্কা, উদ্বেগে উদ্বেগ। বৈষ্ণব কবি যেন রাধার এক সখী। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার একজন সাক্ষী। এই ভণিতার মধ্য দিয়েও বৈষ্ণব কবি সাধনার নিগূঢ় রাগানুরাগা তত্ত্বটি বারংবার পরিবেশন করেন।

অনেক বৈষ্ণবপদ সরলভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে নরনারীর প্রেমের কবিতারূপেই পাঠ করা যায়। তাতে বৈষ্ণব পদকর্তার ভক্তি বিশ্বাসে ব্যত্যয় ঘটে না। কারণ রাধাকৃষ্ণের নরলীলায়, মানবিক অভিমানে অর্থাৎ সম্পূর্ণ মানবিক রূপ চিত্রণে তাঁদের ধর্মবোধেও কোন বাধা নেই। সত্যই তো প্রকট বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের লীলা মর্তেই ঘটেছিল। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম সাধনার পটভূমিটি মনে রাখলে, কবি সাধকের অভিপ্রায়ের দিকে মনোযোগ দিলে মানবিক রূপের ব্যঞ্জনায় প্রেমভক্তির অন্যতর জগৎ অবশ্য ধরা দেবে।

বৈষ্ণব পদাবলীর একটি কামভাব রঞ্জিত পদের উল্লেখ করছি। শ্রীচৈতন্যোত্তর বিখ্যাত কবি শেখর 'সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ' পর্যায়ের একটি বিপরীত বিহারের পদে লিখেছেন—

চান্দের উপর চান্দ পেখলেলু
ইন্দুর উপরে শশী।

প্রেমের আবেশে পিয়া রসসুধা
খঞ্জন যুগল পশি।।

কবি উপমার সাহায্যে রাধাকৃষ্ণেবর এই কাম ক্রীড়াকে ঢেকে দিয়ে দেহোত্তীর্ণ একটি আত্মিকতার ভাব এনেছেন। কিন্তু এরূপ শত শত পদের সবত্রই উক্ত কামভাব আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে এমন কথা বলা যায় না। যেমন রাধাকৃষ্ণের জলক্রীড়ার এই বর্ণনা সরাসরি কামক্রীড়ারই ছবি—

দুহু রসরাশি। সমাপল হাসি।।
রতিরণ রঙ্গে। শ্রম ভেল সঙ্গে।।

কানু করে বেড়ি। ধরল কিশোরী।।
সলিল অগাধা। লেই চলু রাধা।।
হরিক অঙ্গে। ধনি রহু রঙ্গে।।
পাতল চীরে। বেকত শরীরে।।
নিরখিতে কান। হানে পাঁচ বাণ।।
ধনি কুচ জোড়া।। হাসি দেই মোড়া।।

এইরূপ শত শত পদ বৈষ্ণব কবিরা লিখেছেন। পাঠক একে নরনারীর প্রাকৃত প্রেমের সংরাগ তপ্ত বর্ণনা হিসেবে গ্রহণ করতেই পারে। কিন্তু বৈষ্ণব তাত্ত্বিকেরা শুধু আখরে ব্যাখ্যায় এর চারপাশে ধর্ম ভাবনার বাতাবরণ তৈরি করেন নি, পাঠকের দৃষ্টিকোণটি বদলে দিতে চেয়েছেন। রাধা কৃষ্ণের এই প্রেম প্রাকৃত প্রেম নয়। যেমন রাধাকৃষ্ণের পরকীয়াত্ব পার্থিব পরকীয়াত্ব নয়। তাঁদের দেহ প্রাকৃত মানব দেহ নয়। অপ্রাকৃত দেহের সঙ্গে দেহের যে বন্ধন সহজ মানবিক অভিজ্ঞতায় তার বিচার চলে না। স্থূল দেহের সঙ্গে স্থূল দেহের মিলন কামময়। জ্যোতির্ময় দেহের সঙ্গে জ্যোতির্ময় দেহের এই মিলন। আবার আগুনের সঙ্গে তার দাহিকা শক্তির, চন্দ্রের সঙ্গে তার জ্যোৎস্নার, হিম ঋতুর সঙ্গে শৈত্যের যে অচ্ছেদ্যতা রাধা ও কৃষ্ণের তো সেই নিত্য মিলন। এই বোধে বৈষ্ণবের চিত্ত পূর্ণ। পদাবলীর পাঠকের চিত্তকেও পূর্ণ করতে চান তাঁরা, দীক্ষিত করতে চান। তাই তাঁদের কল্পিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমে এমন কি দেহ মিলনেও কামগন্ধ কোথাও নেই। লৌহ এবং হৈমে স্বরূপগত পার্থক্য। কামের সঙ্গে রাধা-কৃষ্ণ প্রেমরও সেইরূপ পার্থক্য। ফলে বৈষ্ণব কবির পদে যেখানে দেহ মিলনের চূড়ান্ত রূপ সেখানেও আধ্যাত্মিক ভাব ব্যাঞ্জনাই চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত।

এবার আমরা পদাবলী সম্ভার থেকে অন্য একধরনের পদের প্রসঙ্গ তুলছি।

১. রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে।। — জ্ঞানদাস

২. নিশিদিশি অনুখণ নিমিখ নয়ন
থাকিলুঁ ও চাঁদ মুখ চাঞা।
এই দড়াইলুঁ মনে প্রবেশ করিব বনে
কানুধন গলায় গাঁথিয়া।। — বলরাম দাস

৩. শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে
পরাণে পরাণে নেহা।
না জানি কি লাগি কো বিহি গঢ়ল
ভিন ভিন করি দেহা।।
সই কিবা সে পিরীতি তার
জাগিতে ঘুমাতে নারি পাসরিতে
কি দিয়া শোধিব ধার।।
আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া
পীত বাস পরে শ্যাম।।
প্রাণের অধিক করের মুরলী
লইতে আমার নাম।।
আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ
যখন যে দিগে পায়।
বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া
তখন সে দিকে ধায়।।

এরূপ অজস্র বৈষ্ণব পদে আমরা নরনারীর প্রেমের এমন একটি রূপ দেখতে পাই যার সমতুল্য কিছু চণ্ডীদাস ছাড়া সেকালের বাংলা সাহিত্যে আর দেখা যায় না। সেকালের বাংলা সাহিত্যে নরনারীর সম্পর্ক সর্বদাই দেহাশ্রয়ী, হয় প্রাত্যহিক দাম্পত্যের ভূমিকায় স্থাপিত অথবা দেহগত কাম তৃষ্ণায় প্রধূমিত। কিন্তু উদ্ধৃত পদগুলির মত অসংখ্য বৈষ্ণব পদে দেহভাব-মুক্ত বা দেহভাব-নিরপেক্ষ কিংবা দেহভাবোত্তীর্ণ প্রণয় অনুভবের এক বিস্ময়কর ব্যাকুল রূপ প্রকাশ পায়। এই পদগুলি পড়তে পড়তে পাঠক ভাবার অবকাশ পায় না, এতে সম্ভোগের ভাবনা আছে কি না। আধুনিক কালের ভাবুক সমালোচক একে রোমান্টিকতা বলে অভিহিত করে থাকেন। কিন্তু সেকালে যখন রোমান্টিকতার কোন ধারণার জন্মই হয়নি তখন কবিরা এ জাতীয় উপলব্ধিতে পৌঁছলেন কি করে? নিঃসন্দেহে বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব ভাবনা তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছিল। রাধাকৃষ্ণের ঐশী প্রেমের প্রকাশ বস্তুলোকের

ঊর্ধ্বচারী করে তুলতে হবে এই বাসনা থেকেই উক্ত কবিতাগুলির উদ্ভব ঘটেছিল। আর চৈতন্য-পূর্ব চণ্ডীদাসের কবিতায় ইন্দ্রিয়োর্দ্ধ উপলব্ধির যে প্রকাশ তার হেতু আমরা আগেই নির্দেশ করেছি— চণ্ডীদাসের সহজিয়া বিশ্বাস।

কবি যদুনাথদাসের একটি পদ থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হল—

রাধা রাধা বলি নাগর পড়ে ভূমিতলে।
বাহু পসারিয়া সুবল শ্যাম নিল কোলে।।
হায় আমি চাঁপার মালা কেন গলে দিলাম।
চম্পক বরণী রাধা মনে পড়াইলাম।।
ধীরে ধীরে রাধা নাম জপে কৃষ্ণ কানে।
রাধা নাম শ্রবণেতে পাইল চেতনে।।

রাধা-প্রেম ব্যাকুল, রাধা-মিলন কামনায় অধীর কৃষ্ণের এই রূপ চিত্রণ সেকালের কাব্য সঙ্গীত শ্রোতাদের কাছ একটি বাস্তব ছবি তুলে ধরত, তা হল ভক্ত শ্রীচৈতন্যের প্রেম-বিধুর, ধূলি-ধুসর মৃত্তিকালগ্ন কান্তি। একালেও বৈষ্ণবী সংস্কার যাদের আছে, যে সংস্কার ছাড়া বৈষ্ণব পদাবলীর পাঠ অনেকটা বিফল হতে বাধ্য, সেই পাঠকেরা এই কৃষ্ণের মধ্যে শ্রীচৈতন্যকে দেখতে পাবেন। বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে শ্রীচৈতন্য কখনো রাধা-প্রেম-বিহ্বল কৃষ্ণ, কখনো কৃষ্ণ-প্রেমাতুর রাধা, কখনো একই দেহে রাধাকৃষ্ণ— রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণ। পদকর্তারা এই তত্ত্ব ভাবনায় আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই তাঁদের চিত্রিত প্রেমাতুর কৃষ্ণে এইভাবে কখনো কখনো চৈতন্যের প্রতিচ্ছবি এসে পড়েছে। কখনো আবার রাধার কৃষ্ণ-ব্যাকুলতা চৈতন্যের— 'হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ'-কে মনে রেখেই কবিরা চিত্রিত করেছেন।

এইভাবে বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধা কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ এই তিন তত্ত্ব অথবা এক অভেদ তত্ত্ব অধ্যাত্ম উপলব্ধির তিন ধরণের বৈশিষ্ট্য সূচিত করেছে।

১. কৃষ্ণের রূপে গৌরাঙ্গের রূপ ও ভাবের আরোপ।
২. রাধার রূপে গৌরাঙ্গের রূপ ও ভাবের আরোপ।
৩. গৌরাঙ্গের রূপ চিত্রণে রাধাকৃষ্ণের যুগ্মরূপ ও ভাবের আরোপ।

একালের পাঠক বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে মানবী প্রেমের রূপ দেখে উপভোগ করতে পারেন, কিন্তু কবিরা মানবী রূপের প্রত্যক্ষতায় ঈশ্বর-বাসনার গূঢ়তা সঞ্চারিত করতে সর্বদা তৎপর ছিলেন এবং বৈষ্ণবদের সেই তত্ত্বাদর্শকে বাদ দিয়ে সেই সব পদের উপভোগে কোথাও কোথাও যে ফাঁক থেকে যাবে তাতে সংশয় নেই।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বৈষ্ণব প্রভাব ঃ সাহিত্যের বিবিধ শাখা

এক
ভূমিকা

বৈষ্ণব সাহিত্যের বিবিধ শাখা ছাড়াও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বর্গে চৈতন্য-প্রভাবিত ধর্মান্দোলনের প্রভাব নানাভাবে পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে সহজিয়া সাধনের গুহ্য এবং ব্যাপ্ত প্রভাবের কথা বাদ দিলে চৈতন্য ধর্মান্দোলনের মত এত ব্যাপক ধর্মীয় ভাব-প্লাবন ঘটাতে আর কেউ সমর্থ হয়নি। শাক্ত সাধনা বাঙালীর চিত্তে যত গভীর ভাবেই প্রতিষ্ঠিত থাক তার উপরেও বৈষ্ণবী ভক্তি ভাবের একটা কমনীয় ছায়া বিস্তৃত হয়েছে। একমাত্র ধর্মমঙ্গল জাতীয় কতকগুলি সাহিত্যে এবং সংশ্লিষ্ট ধর্ম সাধনায় চৈতন্য পন্থার প্রবেশ দেখি না। কিন্তু ছাগ মহিষ বলিদানে মঙ্গলকাব্যের যে সব দেবীর (নিঃসন্দেহে তাঁরা শাক্ত দেবীরই বিচিত্র রূপ) পূজা প্রচলিত তাঁদের উপরও বৈষ্ণবতার ভক্তিভাব-ব্যাকুলতা প্রভাব বিস্তার করেছে। চৈতন্য-প্রভাব-কাল থেকে শুরু করে মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত কতকগুলি প্রধান মঙ্গলকাব্যে এমন কি অনুবাদাশ্রয়ী রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভাব সঞ্চারিত হয়েছে। তাছাড়া এই পর্যায়ে বৈষ্ণব পদাবলী ও পদকীর্তনের রূপান্তর কবিগানের বিষয়ও চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে।

আমরা এই অধ্যায়ে বৈষ্ণব প্রভাবের কথা মনে রেখে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নিম্নলিখিত শ্রেণীগুলির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করব—

১. মঙ্গলকাব্য

২. অনুবাদ

৩. কবিগান

দুই
মঙ্গলকাব্য

মঙ্গলকাব্যের দুটি প্রধান শাখা মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলই এই ধারায় আলোচ্য। মনসামঙ্গলের মনসা একটি শাক্ত দেবী। ভক্তি এখানে শক্তির অনুগামী। মনসাকে

অবলম্বন করে লেখা চৈতন্য যুগের কাব্যে এই দেবীর মূল পরিচয় অক্ষত রেখেও একটি বৈষ্ণবসুলভ ভক্তিরস আদ্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্বিজ বংশীর মনসামঙ্গল কাব্যটি ভক্তিরস-প্রধান। ভক্তিরস প্রধান তো বটেই বিদ্বেষহীন ধর্ম বিশ্বাসের একটি বৈষ্ণব-সুলভ আদর্শও তাঁর রচনায় প্রকট। যেমন হরি হরের অভেদ রূপ চিত্রণে। শিব কন্যা মনসার পূজক কবি কৃষ্ণে শিবে পার্থক্য নেই এই কথাটি প্রচারে অবতীর্ণ। এটি একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য —

দক্ষিণ শরীরে হরি বাম অঙ্গে ত্রিপুরারি
আধ আধ একই সংযোগে।
ধন্য লোকে দেখে হেন গঙ্গা যমুনা যেন
মিলিয়াছে সঙ্গম প্রয়াগে।।
দক্ষিণাঙ্গ অনুপম সুন্দর জলদ-শ্যাম
রামতনু নিরমল শশী।
দেখি মুনি-মন ভোলে দুই পর্ব এক কালে
অমাবস্যা আর পৌর্ণমাসী।।

শুধু ভাবের দিক থেকে নয়, কবিতার ভাষার এবং উজ্জ্বল মার্জিত রূপেও পদাবলীর প্রভাব অনুভব করা যায়।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলি প্রত্যক্ষত শাক্ত কাব্য। কিন্তু এখানেও আমরা একটি ধর্ম বিদ্বেষহীন হিন্দু পরিমণ্ডল লক্ষ্য করি যেখানে অন্যান্য দেবদেবীর বন্দনার সঙ্গে অনেক কাব্যেই গৌর বন্দনাও স্থান পেয়েছে। চণ্ডীমঙ্গল গীতে দ্বিজ মাধব অনেকগুলো পালার মুখবন্ধে একটি করে 'বিষ্ণুপদ' সংযোজন করেছেন। যেমন কালকেতু পালাতে রচিত 'বিষ্ণুপদ'টি —

কার ঘরের কালিয়া চান্দ হের দেখা যায়।
সুগন্ধি কুসুম তেজি অলি পাছে ধায়।।
নয়ান চন্দ্রিমা ভুরুর ভঙ্গিমা
শরের সহিতে এক ধায়ে।
একি পরমাদ ভুবন ভোলায়ে
রহি রহি মুরলী বাজায়ে।।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি এ জাতীয় বৈষ্ণব পদ রচনা করেছেন এবং তাকে কাব্যের অঙ্গরূপে বিন্যস্ত করেছেন।

মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধর্মভাবনাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এ বিষয়ে বিদগ্ধ সমালোচক অধ্যাপক ড. ক্ষেত্র গুপ্তের মন্তব্য উল্লেখ করা হচ্ছে। মুকুন্দের কাব্য চৈতন্য-প্রভাব যুগে লেখা। কবি দীক্ষিত বৈষ্ণব ছিলেন না, লিখেছেন শাক্তকাব্য। ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়ে তিনি পঞ্চোপাসক হিন্দু ছিলেন—স্মার্ত আচার-

আচরণে বিশ্বাসী। কিন্তু যুগ প্রভাবে হরিভক্তিরসে তাঁর চিত্ত কিরূপ দ্রবীভূত হয়েছিল তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে কাব্যের সর্বত্র। কাব্যশেষে স্বয়ং চণ্ডীর মুখ দিয়ে কবি বলিয়েছেন—

কলির চরিত্র যত বিষম গণন।
ইহাতে ঔষধ কিছু আছয়ে কারণ।।
কলিকাল গরলে ঔষধ নারায়ণ।
বদনে করিলে পান না দেখে শমন।।
ঘোর কলিকালে যে বা হরিনাম লয়।
জরা রোগ মৃত্যু শোক যমে নাহি ভয়।।

তিনি ভক্তি বিগলিত চিত্তে হরির বন্দনা করেছেন। তাঁর কাব্যে চণ্ডী যখন গঙ্গাকে কলিঙ্গ প্লাবিত করতে প্ররোচিত করেছে, গঙ্গা উত্তরে বলেছে বৈষ্ণবোচিত অহিংস আদর্শের কথা। বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শে মুকুন্দ খুল্লনার বিরহকে গীতি কবিতার পদলালিত্যে উচ্ছ্বসিত করে তুলেছেন। মুকুন্দের শাক্তকাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব অন্তরঙ্গ-প্রেরণা রূপে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে।

তিন
অনুবাদ কাব্য

আমরা চৈতন্যপূর্ব বৈষ্ণব ধর্ম-ভাবনার বিচিত্র কাব্যিক প্রয়াস আলোচনা প্রসঙ্গে কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত রামায়ণের কথা বলেছি। বৈষ্ণবোচিত ভক্তিধর্মের প্রভাব সেই কাব্যের উপর খুবই গভীর ভাবে পড়েছে। পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে এক-মত যে প্রাক্ চৈতন্য এবং তুর্ক বিজয় পূর্ববর্তী কৃত্তিবাসী রামায়ণের রূপ যাই থাক না কেন তার যে প্রচলিত রূপ অত্যন্ত জনপ্রিয় তা পুরোপুরি চৈতন্য প্রভাবের ফল।

চৈতন্য পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে মাধব কন্দলী ছিলেন কামরূপের লোক। ভক্তিধর্মের সুর তাঁর কাব্যটিতে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু ভক্তিবাদের দিক থেকে আরো গুরুত্বপূর্ণ শঙ্করদেবের অনূদিত মাধব কন্দলীর রামায়ণের উত্তরাংশ। তিনি 'শ্রীরাম বিজয় নাট'নামে একটি যাত্রাপালাও লিখেছিলেন। শঙ্করদেব ছিলেন বৈষ্ণব। তবে চৈতন্য পন্থার সঙ্গে তার ভক্তিবাদের কিছু পার্থক্য ছিল। রামায়ণ অনুবাদ, 'রাম বিজয় নাট' এবং অন্যান্য রচনা তার অনুসৃত ভক্তিধর্মেরই প্রকাশ। এছাড়া অদ্ভুতাচার্য, চন্দ্রাবতী, দ্বিজ মধুকণ্ঠ প্রভৃতি অনেকেই রামায়ণের আংশিক অনুবাদ করেছিলেন। এর মধ্যে অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণে আছে, কবি রামচন্দ্রের কাছে স্বপ্নাদেশ পেয়ে রামায়ণ কাব্য প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। বিষয়টা অনেকটা মঙ্গলকাব্য ধাঁচের। রামচন্দ্র নিজ মহিমা কীর্তনের জন্য মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীর মত অদ্ভুতাচার্য (নিত্যানন্দ

আচার্য) কে স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন।

রাম বলে নিত্যানন্দ কিছু গাও শুনি।
নিত্যানন্দ বোলে কিছু গাহিতে না জানি।।
টোন হইতে অস্ত্র খসাই লৈল হাতে।
এক মহামন্ত্র তার লিখিল জিহ্বাতে।।
হৃদয়েতে সেই মন্ত্র করিল স্মরণ।
পূর্ব অনুক্রমে রচিল রামায়ণ।।

বৈষ্ণব প্রভাবে কীর্তনের ঢঙে রামলীলা পদাবলীর গানও শুরু হয়। এই রচনাবলী সাহিত্যের দিক থেকে খুব মূল্যবান কিছু না হলেও কৃষ্ণলীলার মত রামলীলাও যে ভক্ত শ্রোতার মনে কিছুটা স্থান করে নিয়েছিল তার সাক্ষ্য হিসেবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গদেশে রাম কখনোই এক মুখ্য দেবতা হয়ে ওঠেন নি। রামকে ভগবানরূপে গ্রহণ করা হয়েছে এবং রামায়ণকে ভগবৎলীলার কাব্য বলে মনে করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু রামমন্দির-রামপূজা প্রভৃতির প্রচলন ঘটেনি উত্তর এবং পশ্চিম ভারতে যেমনটি হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন রামায়ণ-অনুবাদকের কথা এই সূত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, তাঁর নাম রামানন্দ ঘোষ। তিনি নিজেকে বুদ্ধের অবতার বলে উল্লেখ করেছেন। কালীর অভিশাপে বুদ্ধদেব রামানন্দ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি ম্লেচ্ছাধিকার দূর করে দেশে দারুব্রহ্ম বা জগন্নাথের শাসন আনবেন। তাঁর মতে জগন্নাথই রামচন্দ্র। সেই কারণে তাঁর রামায়ণ রচনা। বৌদ্ধ ভাবনা, শাক্তভক্তি এবং যুগপৎ জগন্নাথ, রামের উপাসনা রামানন্দ ঘোষকে একটি অসাধারণত্ব দান করেছে।

মহাভারতের অনুবাদ বাঙালীর মনের খুব কাছাকাছি এসে পড়ল চৈতন্য পর্বে কাশীরাম গোষ্ঠীর কাব্যের মধ্য দিয়ে। মহাভারতের অনেক কবিই অবশ্য ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন যেমন রামচন্দ্র খান, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি। আবার পীতাম্বর দাসের মত কোন কোন কবি মার্কেণ্ডেয় চণ্ডী এবং ভাগবতের অংশ বিশেষের অনুবাদ করেছিলেন।

মহাভারত যুদ্ধ প্রধান কাব্য। কিন্তু তাতেও বাঙালী কবিরা কৃষ্ণ ভক্তিরস নানাভাবে সঞ্চারিত করেছেন। মহাভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি কাশীরাম দাস স্বয়ং বৈষ্ণব বংশের সন্তান ছিলেন।

ভাগবতের নাম করে যে সব গ্রন্থ প্রচারিত তার বেশীর ভাগ কৃষ্ণলীলা কাব্য। দানলীলা, নৌকালীলা প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণ গোপীদের লীলামূলক ঘটনায় পল্লবিত।

ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, শিবপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতির অনুবাদ অনেক হয়েছে।

পৌরাণিক ধর্ম পরিমণ্ডলটিকে তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে ইসলাম ধর্মের জোয়ারের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখার এই ক্ষীণ প্রচেষ্টা বিশেষ সফল হয়েছিল বলে মনে হয় না। তবে সাধারণভাবে পৌরাণিক দেবদেবীতে অক্ষুণ্ণ বিশ্বাসে বাঙালী হিন্দু জনমণ্ডলী কখনো প্রশ্ন তোলে নি। দীক্ষিত বৈষ্ণবদের কথা বাদ দিলে বৈষ্ণবী ভাব পরিস্নাত বঙ্গীয় হিন্দু সাধারণের মধ্যে পুবাণ কথিত যাবতীয় দেবদেবীতে ভক্তি অকৃপণ ছিল এবং এতে তাদেব শাক্ত ধর্মে মতিও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়ে পড়েনি।

চার
কবিগান

কবিগানের একটা অংশ প্রত্যক্ষত বৈষ্ণব পদাবলী প্রভাবিত। কবিগানের বিকাশ ঘটেছিল ১৭৬০ থেকে ১৮৩০-এর মধ্যে হরু ঠাকুর, কেষ্টা মুচি , নিতাই বৈরাগী, ভবানী বেনে, গোজলা গুঁই, রাম বসু, ভোলা ময়রা, এন্টনি ফিরিঙ্গি, ঠাকুর সিংহ প্রভৃতি বিখ্যাত কবিয়ালেরা অনেকেই অষ্টাদশ শতকের একেবারে শেষ দিকে গান বেঁধেছেন। এঁদের সখী সম্বাদ এবং বিরহ পর্যায়ের গানগুলি বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবানুসরণ। অবশ্য এঁদের মধ্যে কজন যথার্থ কবি আর কজন শুধুই গায়ক ছিলেন স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না। সে যাই হোক এঁদের কবিতায় বৈষ্ণবী প্রেমভক্তির গভীরতা পাওয়া যায় না এরূপ অভিযোগ অনেকে করেছেন। চটুলতা, খোসমুদি, শ্লীলতার অভাব, বহিরঙ্গ প্রসাধন বাহুল্য অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু আসরে গান যাদের কাছে পরিবেশিত হত সেই আপামর সাধারণ বাঙালী একে শুধুই চটুল চতুর মানবিক প্রণয়লীলা হিসেবে না দেখে যুগপৎ হরিস্মরণে মন সরস করবার এবং বিলাসকলা কৌতুহল মেটাবার গান হিসেবে গ্রহণ করেছিল। জয়দেব গোস্বামী থেকে শুরু করে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে বাঙালী এভাবেই ভগবৎ লীলা ও মানবলীলার যুগ্মবেণী রূপে অনুভব করেছে।

এর মধ্যে মাঝে মাঝে দু চারটি কবিগানে ধর্ম-ভাবুকতার গভীর সুর বেজে উঠে আমাদের সচকিত করে। তার একটিমাত্র নিদর্শন হিসেবে এন্টনি ফিরিঙ্গির নামে প্রচারিত কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করছি—

খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নাই রে ভাই।
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কোথা শুনি নাই।
আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে।
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে,
আমার মানব জনম সফল হবে, যদি রাঙা চরণ পাই।

সপ্তম অধ্যায়
নাথধর্ম ও সাহিত্য

এক
ভূমিকা

নাথপন্থা বাঙালীর ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে একটি বৃহৎ স্থান অধিকার করে নেই। তবে অতীতকালে প্রাচীন ও মধ্যযুগে এর যে যথেষ্ট প্রভাব ছিল তাতে সন্দেহ নেই। সাধারণভাবে একটি শৈবধর্মগোষ্ঠী বলেই নাথপন্থীদের অভিহিত করা হয়ে থাকে। তবে নাথপন্থী সাধনার ঐতিহ্যে যুক্ত রয়েছে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের বাইরের কিছু কিছু প্রভাব-সূত্র। বিখ্যাত নাথগুরু কানুপাদ, হাড়িপা বা জালন্ধরি পাদ বৌদ্ধ সহজিয়া সিদ্ধাচার্য রূপেও স্বীকৃত। বৌদ্ধ তন্ত্রযানীদের মধ্যে কোন কোন গোষ্ঠী নাথদের মত রসায়নবাদী ছিল কি না তা পণ্ডিতদের গবেষণার বিষয়। তবে এরূপ একটি প্রভাবশালী ধর্মগোষ্ঠী যে ছিল একটি চর্যাপদে তার নিদর্শন পাওয়া যায় যেখানে চর্যার কবি রসায়নবাদীদের নিন্দা করেছেন।

মধ্যযুগে নাথপন্থীরা শৈব বিন্দুসাধক রূপেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে অবশ্য একটি সমস্যা রয়েছে। বাংলায় নাথপন্থীদের যে দুটি কাহিনী কাব্য পাওয়া যাচ্ছে তার মধ্যে একটির লেখক মুসলমান, অন্যটিতে হিন্দু এবং মুসলমান দু ধরনের লোকের নাম লেখক হিসেবে পাওয়া গিয়েছে। শৈব যোগীদের কাব্য মুসলমান কবিরা লিখবেন এই ব্যাপারটি সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না। অনেকে বলেন এঁরা লেখক নন পুঁথির নকলকার। যদি তাও হয়, যদিও আমাদের তা মনে হয় না, তাহলেও মুসলমানেরা কেন এই ধর্ম কাব্যের নকল করতে যাবেন। এক্ষেত্রে একটি অনুমান মাত্র করা যায়। লৌকিক ধর্মবিশ্বাস ও আচরণের স্তরে মুসলমানদের মধ্যে এই ধর্মের কোন রূপ প্রচলিত থাকা অসম্ভব ছিল না। বিশেষ করে অমরত্বকামী রসায়নবাদ প্রাচীনকালের আরবদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। অ্যালকেমিষ্ট বা রসায়নবাদীদের প্রাচ্য সংস্করণের মধ্যে আমরা আরব এবং ভারত দুই দেশের সাধকদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। মুসলমানদের কোন অন্ত্যেবাসী গোষ্ঠী যোগপন্থা রসায়নপন্থার অনুযায়ী থাকবে এই প্রত্যয় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। হিন্দু রসায়নবাদীদের চরম লক্ষ্য শিবত্বলাভ আর মুসলমান রসায়নবাদীদের মধ্যে শিবের স্থানে স্বয়ং পয়গম্বর বা কোন প্রধান নবীর ভাবনা কাজ করে থাকবে। তবে এই বিষয়টি নিয়ে আরো গবেষণা না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না।

আমাদের কাছে যেভাবে কাব্য দুটি এসেছে তাতে এদের শৈব বিশ্বাসের অনুবর্তী বিন্দুধারণ ও যোগ সাধনাভিত্তিক রসায়নবাদের একটি বিশেষ শাখারূপে গণ্য করতে হয়।

নাথপন্থী দুটি কাব্যই আখ্যানমূলক; কিছু গান ও আছে।

১. গোর্খ বা গোরক্ষ বিজয়।

২. গোপীচন্দ্র রাজার গান বা ময়নামতীর গান।

প্রথম কাহিনীটির একটি মাত্র কাব্য পাওয়া গিয়েছে। কাব্যটির রচয়িতা ফয়জুল্লা। এই বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যে বিতর্ক ছিল অধ্যাপক ড. আহমদ শরীফের আলোচনায় তার নিরসন ঘটেছে। ভীমসেন কাব্যটির লিপিকার হতে পারেন, লেখক ফয়জুল্লাই। দ্বিতীয় কাহিনীটি অন্তত তিনজন কবির স্বতন্ত্র কাব্যে পাওয়া গিয়েছে—দুর্লভ মল্লিক, ভবানী দাস, সুকুর মামুদ।

৩. নাথযোগীদের গান।

এদের রচিত সাধ্য-সাধন বিষয়ক গানের চারটি সঙ্কলন পাওয়া গিয়েছে ঃ 'যোগীর গান', 'যুগী কাচ', 'গোরক্ষ সংহিতা', 'যোগ চিন্তামণি'।

গানগুলি সোজাসুজি তত্ত্বমূলক ও সাধনা পথের প্রদর্শক। কাহিনী দুটির প্রথমটি অপুষ্ট, শুধুই ধর্মতত্ত্বর আশ্রয়। দ্বিতীয়টি ধর্মতত্ত্ব প্রচারে সরব হলেও গল্পের একটি স্বাভাবিক মানবিক আবেদন আছে

দুই
জীবন্মুক্তি ও পরামুক্তি

নাথপন্থীরা যে রসায়নবাদী এ কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। পশ্চিমের রসায়নবাদ বা অ্যালকেমির লক্ষ্য হল এমন একটি দ্রব আবিষ্কার করা যার সাহায্যে যে কোন ধাতুকে সোনায় রূপান্তরিত করা যায়। প্রাচ্যের রসায়নবাদীরা অত স্থূল বস্তুবাদী নয়। তাঁরা চায় এমন একটি দ্রব আবিষ্কার করতে যার সাহায্যে মানুষ অমর হতে পারে।

নাথযোগীরা এই অমরত্বের সাধনা করে। তাদের সাধ্যবস্তুর দুটি স্তর। প্রথম স্তর জীবন্মুক্তি এবং আরো উর্ধ্বে দ্বিতীয় স্তর পরামুক্তি। যোগীদের এই মুক্তির ধারনাটা অন্যান্য ধর্মসাধনার মোক্ষমুক্তি থেকে পৃথক। এ বিষয়ে ড. শশিভূষণ দাশগুপ্তের ব্যাখ্যাটি ভাষান্তরিত করে উদ্ধৃত করছি—

> এখানে মুক্তির অর্থ হল অমরত্ব—প্রথমে সিদ্ধ দেহে এবং পরবর্তী স্তরে দিব্য দেহে। ...... নাথসিদ্ধারা জীবন্মুক্তির কামনা করেন অর্থাৎ জীবৎকালেই মুক্তি, একেই তারা বলেছেন অমরত্ব .... একটি পরিবর্তিত অবয়বে অথবা বস্তুবন্ধন — অতিক্রান্ত অবয়বে এই মুক্তি ...... এই অবয়বকে তারা বলেছেন সিদ্ধদেহ .... এই সিদ্ধ দেহ সাধককে তার চূড়ান্ত লক্ষ্য দিব্য দেহ অথবা পরামুক্তিতে পৌঁছে দেয়।

এই পরামুক্তি, সাধকের দিব্য দেহ লাভ করা আসলে শিবত্ব প্রাপ্তি। শিবত্ব লাভ অমরত্ব তো বটেই, সর্ববিধ পার্থিব দেহবোধের ঊর্ধ্বচারী এক অবস্থান। পরামুক্তি প্রাপ্তিতে সাধক স্বয়ং শিবে রূপান্তরিত। কাজেই এক অর্থে এই চরম স্তবটি মোক্ষমুক্তির পর্যায়ভুক্ত এবং সাধকের এই দিব্যদেহটি আদৌ প্রাকৃত দেহ নয়।

আমরা নাথপন্থী কাহিনীগুলিতে বারংবার দেখতে পাব মৃত্যুভয় এবং মৃত্যুভীতি থেকে বাঁচবার জন্য সাধকের চূড়ান্ত প্রয়াস। অমরত্ব লাভই ময়নামতীর লক্ষ্য। অমরত্বের জন্য গোপীচন্দ্রকে গুরু হাড়িপার হস্তে প্রদান। গুরু মীননাথকে আসন্ন ক্ষয় এবং মৃত্যুর হাত থেকে অমরত্বের পথে নিয়ে যাওয়াই গোরক্ষনাথের কৃতিত্ব। মানিকচন্দ্র রাজার মৃত্যুবোধ করবার জন্য গোদা যমের সঙ্গে ময়নামতীর যে যুদ্ধ তা আসলে মৃত্যুকে বোধ কের অমরত্ব সাধনার রূপক।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা, জীবন্মুক্তির স্তরে নাথ সিদ্ধাই অষ্টসিদ্ধি লাভ করে। হঠযৌগিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাবা অণিমা (অনুর ন্যায় ক্ষুদ্র হবার শক্তি), মহিমা (বিরাট হবার শক্তি), লঘিমা (ইচ্ছামত লঘু বা হাল্কা হবার শক্তি), প্রকাম্য (ইচ্ছানুযাযী বস্তু পাবার ক্ষমতা), ইশিত্ব (সব কিছুর উপর কর্তৃত্ব লাভের শক্তি), বশিত্ব (জয় করার, আকর্ষণ করার মোহমুগ্ধকারী শক্তি), গরিমা (ইচ্ছামত গুরু বা ভারী হবার শক্তি), প্রাপ্তি (ইচ্ছামত সব কিছু পাবার শক্তি)। নাথপন্থী কাহিনী দুটিতে আদ্যন্ত নাথ সিদ্ধাইরা এই অষ্টসিদ্ধির শক্তি প্রদর্শন করেছে। দুটি কাব্যের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় এর অজস্র উদাহরণ কাব্য দুটিকে অতিলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ করে রেখেছে। একটি উদাহরণ মাত্র উদ্ধৃত করছি—

হাড়িপা নদীতে স্নান কবতে গিয়েছিলেন। বারটি গ্রন্থি দেওয়া এক টুকরো ছেঁড়া কাপড় জলে ফেলে দিলেন। নদীর সব জল মুহূর্তে শুকিয়ে গেল। জলচর প্রাণী এবং মাঝি-মল্লাদের দুঃখে তিনি দয়া করে জলভরা ন্যাকড়াটিতে চাপ দিলেন। মুহূর্ত মধ্যে নদী কানায় কানায় ভরে গেল। তার পরে তিনি নারকেল বাগানে গিয়ে যোগাসনে বসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সব নারকেলগুলি গাছ থেকে পড়ে তাঁর আসনের পাশে জড় হয়েছে। নখে ভেঙে সব নারকেলগুলির জল শাঁস খাবার পরে নারকেলগুলি আবার পূর্ণ দেহে গাছের ডগায় গিয়ে ঝুলতে শুরু করল। (গোপীচন্দ্র রাজার গান)।

এরূপ উদাহরণ আরো অজস্র সঙ্কলন করা যেতে পারে। পরামুক্তির স্তরে গিয়ে কিন্তু সাধক এরূপ একটি অবস্থায় প্রবিষ্ট যেখানে অষ্টসিদ্ধি প্রদর্শনের প্রশ্নই ওঠে না। কারণ তখন জাগতিক ব্যাপারের সঙ্গেই তাঁর আর যোগ থাকে না।

তিন
সাধনা ঃ হঠযোগিক উলট রীতি

নাথসিদ্ধাইরা হঠযোগী। কিন্তু তাঁদের সাধনরীতি বৌদ্ধ বা হিন্দু সহজিয়া হঠযোগীদের থেকে মূলত পৃথক। কোথায় এই পার্থক্য? তাঁরা কায়া সাধক অথচ

পূর্বোক্ত কায়া সাধকদের সঙ্গে তাঁদের গোড়ায় স্বাতন্ত্র্য। কোথায় এই স্বাতন্ত্র্য?

নাথ সিদ্ধাইরা স্ত্রী শক্তিকে সম্পূর্ণত অস্বীকার করে— সাধন পথের বাধা বলে মনে করে। অপরাপর কায়া সাধকেরা যৌন মিলনের মধ্য দিয়ে ভোগোত্তীর্ণ হতে চায় নাথপন্থীরা নারী সংসর্গকেই পতন বা মৃত্যুর কারণ বলে মনে করে। তাঁদের কায়া সাধনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিন্দুধারণ। সহজ অর্থে এই বিন্দু হল পুরুষের পুরুষত্ব — তার বীর্য। নারীর যৌন নির্যাসের সঙ্গে এর সংযোগ ঘটার মানেই হল সাধকের প্রাণ শক্তির ক্ষয় এবং ফল মৃত্যু। বিন্দু ধারণ করে ক্ষয় রোধ করতে হবে। এই সাধনা-রুদ্ধ বিন্দুই হল সেই রসায়ন যা ধারনের দ্বারা সাধক অমরত্ব প্রাপ্ত হয়।

হঠযৌগিক কায়া সাধনের এই প্রক্রিয়াটি উলট প্রক্রিয়া। কারণ সোজা প্রক্রিয়া হল জীবদেহের স্বাভাবিক ধর্ম নারী সংসর্গ ও বিন্দুপাত।

'যোগীদের গানে' এবং 'গোর্খবিজয়ে' গোরক্ষ নাথের গানের দ্বারা মীননাথের সচেতন করে তোলবার চেষ্টায় আমরা বারংবার এই সাধন রীতির ব্যাখ্যান দেখতে পেয়েছি। মীননাথ কদলী-রমণীদের সংসর্গে তাঁর প্রাণশক্তি হারিয়ে মৃত্যুর দিকে চলেছেন। অপরপক্ষে গোপীচন্দ্র হীরা নটীর কাম-আবেদন অস্বীকার করে আপনার বিন্দু রক্ষা করেছে। কাম বিজয়ের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গোপীচন্দ্র সিদ্ধিলাভ করেছে। দুটি কাহিনীতে যা নারী বিমুখতার আদর্শ, তত্ত্বগত ভাবে তাই হল কায়া সাধনে বিন্দু রক্ষার কৃতিত্ব। বিন্দু রক্ষার মধ্য দিয়ে দেহ-মধ্যে সেই অমৃতস্বরূপ রসের সঞ্চয়— যাব ফল হল পক্ক দেহে জীবন্মুক্তি এবং যার চূড়ান্ত স্তর হল দিব্য দেহে পরামুক্তি বা শিবত্ব লাভ।

'গোরক্ষ-বিজয়' থেকে কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করছি— যার মধ্যে নাথপন্থীর তত্ত্বাদর্শের কোন কোন দিক প্রকাশ পেয়েছে—

১. কদাচিৎ নিজ চন্দ্র না করিবা ব্যয়।
বার বৎসরেরও আয়ু একদিনে ক্ষয়।।

২. ডুবিল তোম্মার নৌকা কাছি গেল ছিঁড়ি।
তোম্মার সকল ভরা করিলেক চুরি।

....

গুরুরও বচন তোম্মার কিছু নাই ভায়।
যতেক সম্পদ তোমার তুলি দিলা নায়।

....

প্রদীপ নিবিলে বাপু কি করিব তৈলে।
কি কাজ বান্ধিলে আইল জল না থাকিলে।।
শিকড় কাটিলে তবে পড়ে গাছ।
বিনী জলে কথাতে জিয়ে মাছ।।
লড়িবারে শক্তি নাহি গুরুরও থাকিত।
দাঁড়খান মুক্ত করি করিলা বসত।।

মজুমদার পাই চোর হইল সতন্তর।
সর্বধন হরি নিল শূন্য হৈল ঘর।।
৩. নগরে মনুষ্য নাই ঘরে ঘরে চাল।
আন্ধারে দোকান দিয়া খরিদ করে কাল।।
৪. দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি কাল নিদ্রা ঘোর।
ওজনের তৈল মাপি লয়ি যায় চোর।।

এই চারটি অংশ গোরক্ষনাথের গান থেকে উদ্ধৃত। কদলীতে কাম নিমজ্জিত গুরু মীননাথকে এই গানগুলির মধ্য দিয়ে নাথদেব সাধনতত্ত্ব বোঝাবার চেষ্টা করেছেন গোরক্ষনাথ। কামচক্রে নারী সংসর্গে পুরুষ যে সর্বস্ব হারায়, সাধকের দেহ অভ্যন্তরস্থ রসের সঞ্চয় যে নিঃশেষিত হয়ে যায় সেই কথাটি নানা রূপকের মাধ্যমে এখানে বলা হয়েছে। প্রায়ই নৌকা বা গৃহ সাধকের কায়ার রূপক হিসেবে ব্যবহৃত। চোর সর্বদাই কাল বা মৃত্যুর রূপক এবং ধন সম্পদ আসলে প্রাণ-নির্যাস বা সাধকের দেহাভ্যন্তরস্থ বিন্দু সঞ্চয়। একমাত্র উলট সাধনের মধ্য দিয়েই এই অপরিহার্য ধ্বংসের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেন সাধক।

গোপীচন্দ্রের গানে ময়নামতী পুত্র গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্রকে যোগ সাধনার পথ গ্রহণ করবার পরামর্শ দিয়ে বলেছে—

নিষ্ঠুর দারুণ যম কারে নাই দয়া।
কাড়্যা লয় প্রাণের শুয়া পড়্যা রয় কায়া।।
পড়্যা রয় ধন জন অট্টালিকা পুরী।
সভামাঝ দিয়া ডাকা প্রাণ করে চুরি।।
কোন রূপে আইসে যম কোন পথে যায়।
চিনিতে না পারে যমে নিকটে বেড়ায়।।

..

কুয়ারের পানী যেন নরের জীবন।
মাটির পুত্তলি যেন সব অকারণ।।
কাষ্ঠে পোকা বিন্ধে যেন বাদুড়ে লণ্ডেখ কাল।
জ্ঞানের বিনাশ মাগো বলে অবল।।
আঠার বৎসর হৈলে উনিশে মরণ।
শূন্যভরে নিষ্ঠুর যম আসিবে কখন।।
নিদারুণ যম আসি গলে দিবে পা।
কাড়্যা লবে প্রাণের শুয়া কান্দিবেক মা।।

এই সর্বনাশা পরিণতি থেকে মুক্তি পেতে গেলে যোগসিদ্ধা হয়ে সিদ্ধ কলেবর লাভ করতে হবে, অমর হতে হবে। তার জন্য প্রথম প্রয়োজন সম্পূর্ণ কামবন্ধন মুক্তি। নাগিনী স্বরূপা নারীর সংসর্গ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত রাখা।

অষ্টম অধ্যায়
বাঙালীর শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য

এক
ভূমিকা

বাঙালী শক্তিসাধক জাতি। সর্বভারতীয় মাতৃকা দেবীর কল্পনা এবং আরাধনার সঙ্গে বাঙালী শক্তিসাধনার যেমন সম্পর্ক আছে তেমনি কিছু অসাধারণ স্বাতন্ত্র্য আছে তার নিজস্ব বিশ্বাসে ও আরাধনায়। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য' নামক গ্রন্থের সূচনায় এ বিষয়ে যে ভূমিকা করেছেন আমাদের বর্তমান আলোচনার যোগ্য মুখবন্ধ হিসেবে তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলাম।

> ''আমাদের শাক্ত সাহিত্যের মধ্যে উমাকে পাই, তিনিই পার্বতী গিরিজা; আমরা দক্ষকন্যা সতীকে পাই—তিনিই আবার দশমহাবিদ্যারূপে রূপান্তরিতা; একান্ন মহাপীঠে আবার তাঁহার একান্ন দেহাংশ অবলম্বনে একান্ন দেবী; আমরা অসুরনাশিনী চণ্ডীকে পাই, তিনিই দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, অভয়দায়িনী অভয়া, মঙ্গলকারিণী সর্বমঙ্গলা; আর পাই আমরা কালিকা বা কালী দেবীকে — শাক্ত সাধকগণের তিনিই প্রধানভাবে আরাধ্যা। ইহা ব্যতীত পুরাণ-তন্ত্রাদির মধ্যে একই মূল দেবীর সহিত অভিন্নরূপে দেবীর আরো অনেক রূপভেদ আছে, শাক্তধর্ম ও সাহিত্যের মধ্যে তাঁহাদের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহাদের সঙ্গে মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি আঞ্চলিক দেবীগণের কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে, কাবণ সুবিধা মতন ইঁহারাও মূল দেবীর সঙ্গে অভিন্না। বিদ্যারূপিণী সরস্বতী ও শ্রী ও সম্পদরূপিণী লক্ষ্মীর কথাও ভুলিলে চলবে না। জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা বাসন্তী প্রভৃতি দেবী সহজেই মূল দেবীর রূপভেদ বলিয়া গৃহীত।''

অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতে মাতৃকা দেবীর উপাসনা চলে আসছে। শুধু ভারত কেন পৃথিবীর সবগুলি প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে মাতৃকা দেবীর, শক্তিদেবীর উল্লেখযোগ্য অবস্থান আছে। বেদ-উপনিষদের যুগে ভারতীয় আর্যধর্মে পুরুষ দেবতার প্রাধান্য থাকলেও মাতৃকা দেবীর গুরুত্ব কখনো সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হয়নি। তবে

অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের স্থান পুরুষ দেবতার নিচে। আদিম দেবকল্পনায় কোথাও কোথাও আদ্যা প্রকৃতিরূপে নারী-শক্তির কল্পনা স্থান পেলেও ভারতীয় আর্যধর্মে এই জাতীয় কোন বিশ্বাস লক্ষ্য করা যায় না। তবে সংস্কৃত সাহিত্যের নানাস্থানে রক্তলোলুপা ভয়ঙ্করী এক দেবীর উল্লেখ আছে। নানা নামে এই ভয়ঙ্করী দেখা দিলেও অনেক কাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্যধর্মে স্থান লাভ করেন নি। কোন কোন পুরাণে মদ্য মাংস প্রিয় দেবীকে শবর, বর্বর, পুলিন্দদের পূজিতা দেবী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে অনেক পরবর্তীকালে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে ভয়ঙ্করী কালিকা চামুণ্ডাবে পার্বতী ও চণ্ডীর সঙ্গে মিলিয়ে এক দেবী রূপে কল্পনা করা হয়েছে। হিমালয়বাসিনী দেবীর ভ্রুকুটিকুটিল ললাট থেকে কালী বিনিষ্ক্রান্তা হলেন এরূপ বর্ণনা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে রয়েছে।

পরবর্তীকালে নানা পুরাণ উপপুরাণ ও তন্ত্রগ্রন্থে কালীব বিস্তার ও বিবর্তনের বিবিধ পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণভাবে লক্ষ্য করা যায় পূর্ব-ভারতে আসাম বঙ্গদেশ ওড়িশা মিথিলা প্রভৃতি অঞ্চলে কালীভক্তি ও কালীপূজার প্রচলন সবচেয়ে বেশী। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত ভারতের শাক্ত সাহিত্যের বিবরণ দিতে গিয়ে বাংলার বাইরে ওড়িশা, মিথিলা এবং অসমের নাম উল্লেখ করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট হিন্দি সাহিত্যেও শাক্ত ভাবনার কিছু অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করেছেন। এ থেকে অনুমান করা অবিধেয় নয় যে পূর্ব-ভারতে, বিশেষত বঙ্গদেশ শক্তি সাধনার, আরো বিশেষভাবে কালী সাধনার কেন্দ্রস্থলরূপে অভিহিত হবার যোগ্য।

এই অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি বিবিধ বিচিত্ররূপে নামে পরিচয়ে নানা শক্তিদেবীর পূজার্চনা সুপ্রচলিত। তার মধ্যে বেশীর ভাগ দেবী শক্তিরূপিণী হিসেবে রূঢ় ও উগ্র হলেও সমগ্রত একটি প্রশান্ত দৈবী মহিমা, একটি ষড়ৈশ্বর্যময়ী রাজকীয় গৌরব তার সঙ্গে বিজড়িত। শাক্ত দেবদেবীদের মধ্যে কালীর স্থান একেবারে স্বতন্ত্র—উগ্র, ভীমা, ভয়ঙ্করী। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ চৈতন্য সমকালে তাঁর প্রণীত 'তন্ত্রসার' গ্রন্থে কালীর যে রূপ বর্ণনা করেছেন তা শুধু রূপ নয়, কালীতত্ত্ব এবং ষোড়শ শতক থেকে শুরু করে এ তাবৎ বঙ্গদেশে কালী সাধকদের স্বীকৃত ও পূজ্য প্রতিমা। এখানে তার কিঞ্চিৎ বঙ্গানুবাদ দিচ্ছি—

"দেবী করালবদনা, ঘোরা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা, দক্ষিণা, দিব্যা, মুণ্ডমালা বিভূষিতা। বামহস্ত-যুগলের অধোহস্তে সদ্যশ্ছিন্ন শির, আর উর্ধ্ব হস্তে খড়্গ; দক্ষিণের আধোহস্তে অভয়, উর্ধ্বহস্তে বর। দেবী মহামেঘের বর্ণের ন্যায় শ্যামবর্ণা (এই জন্যই কালীদেবী শ্যামা নামে খ্যাতা) এবং দিগম্বরী; তাঁহার কণ্ঠলগ্ন মুণ্ডমালা হইতে ক্ষরিত রুধিরের দ্বারা দেবীর দেহ চর্চিত; আর দুইটি শবশিশু তাঁহার কর্ণভূষণ। তিনি ঘোরদ্রংষ্ট্রা,

করালাস্যা, পীনোন্নতপয়োধরা; শবসমূহের করদ্বারা নির্মিত কাঞ্চী পরিহিতা হইয়া দেবী হসম্মুখী। ওষ্ঠের প্রান্তদ্বয় হইতে গলিত রক্তধারা দ্বারা দেবী বিস্ফুরিতাননা; তিনি ঘোরনাদিনী, মহারৌদ্রী-শ্মশানগৃহবাসিনী। কালসূর্যমণ্ডলের ন্যায় দেবীর ত্রিনেত্র; তিনি উন্নতদন্তা তাঁহার কেশদাম দক্ষিণ ব্যাপী ও আলুলায়িত। তিনি শবরূপ মহাকালের সহিত বিপরীতরতাতুরা সুখ প্রসন্নবদনা এবং 'স্মেরাননসরোরুহা'।

— ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত অনুদিত ঃ 'ভারতীয় শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য'

শাক্ত-দেবী পরিমণ্ডলে কালীর স্থান স্বতন্ত্র ও একক। বঙ্গদেশে পূজিতা সব শাক্তদেবীর মধ্যে দুর্গা এবং কালী শীর্ষস্থান অধিকাব করে আছেন কয়েক শতাব্দী ধরে। দুর্গায় শক্তি ভক্তি ঐশ্বর্য উৎসব আলোক পরিপূর্ণতা, কালীতে শক্তি নগ্না এবং অন্ধকার ভয়ঙ্কর মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত। রক্ত শ্মশান এই দেবীর অচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। শক্তিকে কোনরূপ সজ্জায় অলঙ্কারে আবৃত না করে যথাস্থিত উপলব্ধিই কালিকা উপলব্ধি। সেই কারণে শাক্তধর্মের প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে আমরা বিশেষভাবে কালীর কথাই বলছি।

কালী দেবীর উদ্ভব ও বিকাশের পিছনে যেসব উৎস সক্রিয় ছিল নিচে তা নির্দেশ করা হচ্ছে—

১. আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রজননশক্তির মূলীভূতা কারণরূপে এক আদ্যা নারীশক্তির কল্পনা নানা রূপ ধরে দেখা দিয়েছিল, তার নির্যাস আদ্যাশক্তি কালীর মধ্যে অনুভব করা যায়।

২. সৃষ্টির মূলে যে ভয়ঙ্করী অকল্যাণী শক্তি প্রাকৃতিক দুর্যোগরূপে মৃত্যুরূপে বারংবার প্রকাশিত তারই মূর্ত বিগ্রহ এই ধ্বংসরূপিনী রাত্রিদেবী।

৩. তন্ত্রের উদ্ভবের সুনিশ্চিত ইতিহাস জানা যায় নি। কিন্তু পূর্ব ভারতে অতি প্রাচীনকাল থেকে গুহ্য ধর্ম সাধনারূপে তন্ত্র সাধনার গুরুত্ব ছিল সেকথা সকলেই স্বীকার করেছেন। এই আদিম তন্ত্র বিশ্বাস ও সাধনা ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম বা আদি বৌদ্ধ ধর্ম নিরপেক্ষ একটি লোকায়ত ধর্ম সাধনা ছিল। ক্রমে মহাযানী বৌদ্ধদের একটা সম্প্রদায় তন্ত্রযানী হয়ে ওঠে। পূর্ব ভারতে এবং তিব্বতে তান্ত্রিক বৌদ্ধদের প্রতিপত্তি ছিল অত্যন্ত বেশী। তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনায় মহামযূরী, বজ্র বারাহী, ভীমা কপালিনী, কৌবেরী প্রভৃতি তান্ত্রিক দেবীর সন্ধান পাই। এক কালিকা দেবীর বর্ণনাও সেখানে আছে যিনি ভয়ঙ্করী, নীলবর্ণা, দ্বিভুজ বিশিষ্টা, এক হাতে কঙ্কাল অন্য হাতে অস্ত্র নিয়ে শবের উপরে অবস্থিতা। সমকালে কিংবা পরবর্তীকালে হিন্দু পুরাণ ও তন্ত্রে কালিকা দেবীর অবস্থান দৃঢ়তর হতে থাকে।

তুর্ক বিজয়ের প্রভাবে অব্রাহ্মণ্য-ব্রাহ্মণ্য স্তরের সমন্বয়ে বঙ্গীয় হিন্দুধর্ম যখন

একটা পরিপূর্ণ রূপ পাচ্ছিল তখন অনার্য-সেবিত, লোকায়ত তন্ত্র সাধনায় পূজিত, বৌদ্ধ তন্ত্র কল্পনায় ধৃত কালিকা হিন্দু তন্ত্রের মুখ্য আরাধ্যা দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিতা হন এবং হিন্দু পুরাণগুলির সঙ্গে, পৌরাণিক দেব মণ্ডলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক দৃঢ়তর হতে থাকে।

বঙ্গদেশে শাক্ত বিশ্বাসের গুরুত্ব এত বেশী যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বে ও বঙ্গীয় শক্তি তত্ত্বের গভীর প্রভাব পড়েছে। বাংলার আরাধ্যা শক্তির প্রাধান্য বৈষ্ণবেরাও অস্বীকার করতে পারেন নি। রাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় রাধাই প্রধান। বৈষ্ণবেরা এদেশে প্রচলিত প্রধান শক্তি দেবী কালীর যতই রূপান্তর ঘটান রূপান্তরিত (শক্তি) রাধাকে ধর্মসাধনার কেন্দ্রে স্থাপন করেন। এইভাবে নিগূঢ় প্রতিক্রিয়ায় কালীতত্ত্ব রাধার মধ্যেও সঞ্চারিত। রূপান্তর এত ব্যাপক আপাত পার্থক্য এত দুস্তর যে এই সম্পর্কটি বাইরে থেকে অনুধাবন করা যায় না।

শাক্তভক্ত বিষয়টিকে এই ভাবে দেখেন—

"ব্রহ্মকে মাতৃরূপে উপাসনার ভিতর যে ভাব আছে, তাহা যাঁহারা জানেন না, বাঙালীর সাধন-কাণ্ডের কোন সংবাদ না রাখিয়া যাঁহারা খ্রীষ্টান পণ্ডিতগণের গবেষণানুসারে দুর্গা, কালী, শিব-পূজা প্রভৃতিকে অসভ্য বর্বর অনার্য জাতিদিগের ভূত-পূজার আকারান্তর মাত্র মনে করেন, শক্তি বিষয়ক সঙ্গীতে তাঁহারা কোন রস বা কবিত্ব দেখিতে পাইবেন কি না সন্দেহের বিষয়। তবে ভরসার কথা এই যে, পুরুষানুক্রমে আমরা মা বলিয়া আসিতেছি, সে পৈতামহ সংস্কার (Heredity) আমাদের প্রকৃতির সহিত গাঁথা আছে— তাহা তো ছাড়িবার নহে। মনে পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র একবার লিখিয়াছিলেন—'একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়াছিলাম। প্রদোষকালে— প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষ বীচিবিক্ষেপশালিনী মৃদু পবন হিল্লোলে তরঙ্গ-ভঙ্গ-চঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতে ছিল ও নিবিতেছিল। যে বারাণ্ডায় বসিয়াছিলাম, তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি মৃদু রব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি। কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তি সাধন করি। ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না। ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস, ভবভূতিও অনেক দূরে। মধুসূদন হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র— তাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে সঙ্গীত-ধ্বনি শুনা গেল. জেলে জাল বহিতে বহিতে গাহিতেছে—

'সাধো আছে মা মনে

দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব
জাহ্নবী জীবনে।'

তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুর মিলিল—বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালির মনের আশা শুনিতে পাইলাম—এ জাহ্নবী-জীবনে দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যাজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্যময় জগৎ, সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইতেছিল।'— বাস্তবিক বাংলা ভাষায় বাঙালীর প্রাণের সুর মনের আশা, হৃদয়ের ভাব শুনিতে হইলে শাক্ত-সঙ্গীতের মত আর কিছু আছে কি না জানি না। মা-গঙ্গার পলিমাটি স্তরে স্তরে সাজাইয়া বাংলাদেশ হইয়াছে; যেন মাতৃস্নেহ স্তর-বিন্যস্ত হইয়া এই দেশকে জাগাইয়া তুলিয়াছে।' ''

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'শাক্ত পদাবলী' নামক সঙ্কলন গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক অমরেন্দ্রনাথ রায় এই যে উক্তিটি করেছেন তার মধ্যে একটু ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ পেলেও বাংলার শক্তি সাধনার রুদ্র ভয়ঙ্করতা পেলব মাতৃভাবনার সঙ্গে মিলে গিয়ে এই জাতির অন্তর সামগ্রি হয়ে উঠেছিল কিভাবে তার নিদর্শন মিলবে।

বাংলার শাক্ত সাহিত্য যে অনেক ব্যাপক হতে পারত কিন্তু হয়নি সে কথা আমরা মঙ্গল দেবদেবীর আলোচনায় পূর্বেই বলেছি। বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের বিস্তার ও গভীরতা সত্ত্বেও তন্ত্রসাধনা, কালীসাধনা এবং অন্যান্য শাক্ত দেবতার পূজার্চনায় ভাটা পড়েনি। শাক্ত পূজার্চনার এবং কালীসাধনার ব্যাপকতার তুলনায় মধ্যযুগের সাহিত্যে শাক্ত সাহিত্য— কালী-কেন্দ্রিক সাহিত্য যথেষ্ট কমই লেখা হয়েছে। তার কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ এখানে আমরা নির্দেশ করব।

মঙ্গলকাব্যে বাংলার নিজস্ব একটি দেবপরিমণ্ডল তৈরী হয়েছিল দেখতে পাই। এই দেবদেবীর মধ্যে নারী দেবতার প্রাধান্য। পুরুষ দেবতারূপে একমাত্র ধর্মঠাকুর এবং 'শিবায়নে'র শিব। চণ্ডী মনসা শুধু নয়, শীতলা, ষষ্ঠী, সারদা, সুবচনী প্রভৃতি অজস্র বড় বা ছোট দেবী বাঙালীর ধর্ম-বিশ্বাসকে ধারণ করে আছে। এঁরা এক অর্থে সকলেই শাক্ত দেবী। তবে লক্ষণীয় কালীকে নিয়ে রচিত 'কালিকা-মঙ্গলে' কালীর মহিমা প্রচার বিশেষ গুরুত্ব পায়নি এবং বঙ্গদেশে পূজিত দশভুজা দুর্গাকে নিয়ে কোন মঙ্গলকাব্য লেখা হয়নি। চণ্ডী বা অন্নদা এবং দশভুজা দুর্গা একার্থ এরূপ মনে করার কারণ নেই। পার্বতীর কাহিনী মঙ্গলকাব্যে থাকলেও দুর্গারূপে তাঁর মহিমা প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাহিনী নেই। মধ্যযুগে যে দুটি শাক্তদেবী সর্বাধিক পূজিত এবং জাতীয় দেবীরূপে গণ্য (আঞ্চলিক দেবী নয়) তাঁদের নিয়ে কোন মঙ্গলকাব্য লেখা হল না, একে একেবারে আকস্মিক মনে হয় না, এর পিছনে দুটি কারণ থাকা সম্ভব।

১. এই দুই দেবী বঙ্গদেশের শাক্তভক্তদের মধ্যে এতই সর্বজনীন যে এঁদের পূজা প্রচারের জন্য বিশেষ তাড়না অনুভব করে কোন কবি আবির্ভূত হননি।

২. সংস্কৃতে দুর্গাস্তোত্র কালীস্তোত্র রচিত হয়েছে। ভক্তরা তারই মধ্য দিয়ে তাদের ভক্তি নিবেদন করেছে। অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে পার্বতী দুর্গাভিত্তিক কিছু গান বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করেছে।

মঙ্গলকাব্য রচিত না হলেও দেবীর শক্তি নারীর শক্তি এমন সব কাব্যে আত্মপ্রকাশ করেছে যা পুরুষ-দেবতার বন্দনামূলক। যেমন ধর্মমঙ্গলে ধর্মঠাকুরের পূজার প্রচার করতে গিয়ে কবিরা চণ্ডীকা-লালিত ইছাই ঘোষের গুণগান করেছেন। কানাড়া এবং লক্ষ্মী ডেমনীর শক্তিমত্তার বর্ণনায় চামুণ্ডা কালিকার ছায়াপাত ঘটেছে। তাছাড়া মধ্যযুগের অলিখিত লোকসাহিত্যে শিব পার্বতীর গার্হস্থ্য জীবনের রূপরেখাটি গভীরভাবেই অঙ্কিত হয়েছিল।

প্রসঙ্গত একটি কথাই উল্লেখ্য যে মৃত্যু-রূপিনী, রাত্রি রূপিনী নগ্নিকা কালিকা সাধকের আরাধনার সত্য, সহজে কবির কল্পনা তাঁকে আয়ত্ত করতে সাহস পায় না। কিন্তু এই কালিকা ব্যাপকভাবে তন্ত্র সাধনায় এবং তন্ত্র সাধনা-আশ্রয়ী বিভিন্ন ধর্মাচারে ও সাহিত্যে পরোক্ষভাবে স্থান নিয়েছে। যা ছিল বৌদ্ধ সহজিয়াদের অবধূতিকা তাই হিন্দু তন্ত্রের কুলকুণ্ডলিনী। কালী যদি হন সহস্রারে অধিষ্ঠিতা তবে মূলাধারের কুলকুণ্ডলিনী তারই প্রাগরূপ। বৈষ্ণব সহজিয়াদের সাধনায়, বাউলদের কায়া সাধনে সর্বত্র যে সাধন সঙ্গিনী শক্তির স্থান, যৌনাচারকে যৌনবোধের অতীত স্তরে নিয়ে যাবার অলৌকিক প্রয়াস— তার মধ্যে তন্ত্রের গূঢ় প্রভাব থেকেছে এবং সহজিয়া ও বাউলপন্থীদের কবিতায় ও গানে এইভাবে শাক্তধর্মের তীর্যক প্রভাব বর্তেছে।

আমরা বারংবার শাক্ত সাহিত্যের আলোচনায় মঙ্গলদেবদেবীদের প্রসঙ্গ আর আনব না। এমন কি 'কালিকা মঙ্গলে'র কথাও আর বলব না। কারণ পূর্বেই তা উল্লিখিত হয়েছে। প্রধানত এবং প্রত্যক্ষত বাংলার শক্তি সাহিত্য বলতে আমরা বুঝি—

১. উমা সঙ্গীত

২. শ্যামা সঙ্গীত।

উমা সঙ্গীত হিমালয়-কন্যা পার্বতীর বাল্য কৈশোর অবলম্বনে রচিত গান। শ্যামা সঙ্গীতে কালী প্রসঙ্গে রচিত গান।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কয়েকজন কবি এই দুই শ্রেণীর পদ রচনা করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকের মধ্যে কবিওয়ালারাও এই দুই শ্রেণীর গান লিখেছেন। আমরা মূলত অষ্টাদশ শতককে আমাদের বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য কালসীমা বলে গ্রহণ করেছি। সে কারণে সাধারণভাবে সেই সব

কবি এবং কবিওয়ালাদের আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করব, যাঁরা অষ্টাদশ শতাব্দীতেই কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে রামপ্রসাদ কবিতাসমগ্র ছাড়াও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'শাক্ত পদাবলী' নামক সঙ্কলন গ্রন্থটিকে আমরা ব্যবহার করব। কিন্তু এই গ্রন্থে এমন অনেক কবির লেখা পদ সঙ্কলিত যা ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিদের রচনা। ধর্মীয় ভাব-কল্পনার ধারাবাহিকতা থাকলেও যে সব কবি ইংরেজী শিক্ষার পরিবেশে মানুষ তাঁদের নব্য মনন ধর্মবোধকে কিছুটা রঞ্জিত করবেই। আমরা তাঁদের কবিতার সাহায্য বিশেষ গ্রহণ করব না কারণ তাতে মধ্যযুগের ধর্মীয় বাতাবরণটি কখনো স্খলিত হতে পারে।

দুই
উমা সঙ্গীত

বাংলা শাক্ত কবিতার ভাণ্ডারে এই গানগুলি অতি প্রিয় সংযোজন বলে বাঙালী মাত্রে অনুভব করে। এই ধারার প্রাচীনতম কবি রামপ্রসাদ সেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রথম 'কালীকীর্তন' গ্রন্থে এবং কিছু বিচ্ছিন্ন গানে পার্বতী উমার বাল্যলীলা, কৈশোর লীলা এবং বিবাহ পতিগৃহে গমন, বৎসরান্তে পিতৃগৃহে ফিরে আসা, মাত্র কয়েকদিন অবস্থান করে আবার পতিগৃহে চলে যাওয়া, এইরূপ একটি না বলা কাহিনীর সূত্রে উমার বাল্যলীলা ও কৈশোর লীলা এবং 'আগমনী', 'বিজয়া' গানগুলো রচনা করেন। মধ্যযুগের শেষভাগে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকে রচিত উমা সঙ্গীতের সংখ্যা বেশী নয়। রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত, হরু বসু, রাম বসু, প্রভৃতি কবির কিছু গান সঙ্কলিত হয়েছে। তাও কমলাকান্ত এবং কবিওয়ালা দুজনের গান সবগুলিই যে অষ্টাদশ শতকে রচিত তা বলা যায় না। এ বিষয়ে দুটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রসঙ্গ চোখে পড়ে।

১. রামপ্রসাদ হঠাৎ এই ধারাটির সূত্রপাত করলেন এবং অল্পকাল মধ্যে তা দেশব্যাপী জনপ্রিয়তা লাভ করল এরূপ মনে করা সঙ্গত নয়। মনে হয় লোক সঙ্গীতের আকারে এরূপ গান সমাজে প্রচলিত ছিল। গাজন, নীলপূজা, গম্ভীরা প্রভৃতি শৈব-শাক্ত উৎসবগুলি এবং অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত শিব-পার্বতীর দাম্পত্য জীবন এই গানগুলির সূত্রধারণ করে আছে। গানগুলি মাতা ও কন্যার অনুভূতি প্রকাশ করে কিন্তু গানে গানে সর্বজনবিদিত একটি কাহিনীর দিকে যে অঙ্গুলী নির্দেশ হয় তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক যেকোন পদ যেমন শুধু রাধা বা কৃষ্ণের

ভাবানুভূতি প্রকাশক লিরিক মাত্র নয়, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সর্বজন-বিদিত বৃন্দাবন লীলা কাহিনীর অচ্ছেদ্য অংশ, উমা সঙ্গীতও প্রকৃতপক্ষে তাই। পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত প্রায় চারশ বছর ধরে প্রচারিত বৈষ্ণব কবিতা বাঙালীর ভক্তিপ্লাবিত চিত্তের একটি তাব যেমন মুহূর্তে বাজিয়ে তোলে মাত্র, অষ্টাদশ শতাব্দীর উমা সঙ্গীতের আর একটি তাব তাকে প্রায় সমান গুরুত্বে কিভাবে আন্দোলিত করে তুলল সেই সমস্যাটি বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। পূর্বোক্ত শৈব-শাক্ত উৎসব সংশ্লিষ্ট গানের এবং মঙ্গলকাব্যগুলির আখ্যানের পাশাপাশি 'আগমনী', বিজয়া' জাতীয় গান লোক সঙ্গীতরূপে অবশ্যই প্রচলিত ছিল, এরূপ বিশ্বাসের কারণ আছে। রামপ্রসাদের মত প্রতিভাবান কবির হাতে পড়ে সেই সব গ্রামীণ সঙ্গীত উপযুক্ত সুর সংযোগে মার্জিত সাহিত্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

২.বাংলাদেশে দশভুজা দুর্গার পূজার প্রচলন এবং 'আগমনী' 'বিজয়া'র গানে জনপ্রিয়তা সমকালীন বলে মনে হয়। দুর্গা পূজার আগে পুরোনো দিনে বাংলার গ্রামে গ্রামে এই গান গেয়ে গায়ক ভিক্ষুক শুধু ভিক্ষাই নিত না একটি বিশেষ ভাবরসের প্লাবন আনত। বাংলার প্রধান দেবী যেন তার ঘরেরই মেয়ে। মেয়ে যেমন শ্বশুরবাড়ী থেকে বাপের বাড়ীতে অল্প কয়েকদিনের জন্য আসে তেমনি পুত্রকন্যাসহ দুর্গা তাঁর পিত্রালয় বঙ্গদেশে আসছেন। হিমালয় এই বাংলারই কুলপতি, আমাদের দুর্গাপূজা বাংলার কন্যাপূজা। নবমীর রাত্রি প্রভাত না হতে শুরু হয় দশমীর বিসর্জনের বেদনা। উৎসবের স্থানে আসে বিষন্নতা। বিদায় দিতে হবে দেবী দুর্গাকে, বিদায় নিয়ে চলে যাবে ঘরের কন্যা শ্বশুরালয়ে মাত্র চারদিন অবস্থানের পরে। 'বিজয়া' এই বেদনার গান।

'আগমনী' ও 'বিজয়া' গানে এই যে বাঙালীর ধর্মাচরণের গভীর সহযোগ তাতে মনে হয় রামপ্রসাদের আগেও কোন প্রচীনতর রূপে এই জাতীয় গান গীত হত।

'আগমনী' ও 'বিজয়া' পর্বের গানগুলির আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী তাঁর 'শাক্ত পদাবলী ও শক্তিসাধনা' নামক গ্রন্থে বলেছেন—

"প্রিয় ও ভক্তের ইচ্ছানুযায়ী দেবতা যে কর্ম করেন, তাহাই লীলা। বস্তুতঃ যিনি পরাশক্তি, পরম কারণ—যিনি রূপাতীত ও গুণাতীত। সন্দেহ হইতে পারে, তাঁহার আবার 'লীলা' কি? তাঁহারও লীলা আছে, কারণ তিনি একদিকে যেমন বিশ্বোত্তীর্ণ, অন্যদিকে তেমনই বিশ্বাত্মক। 'অজ' হইলেও তিনি জন্মগ্রহণ করেন, নিজ মায়ার ঐশ্বর্য বিস্তার করিয়া থাকেন।

লীলা দুই প্রকার, অপ্রকট ও প্রকট। নিজের মধ্যে যখন তিনি নিজে লীলা করেন, বাহিরে তাহার প্রকাশ হয় না, তখন লীলা অপ্রকট, কিন্তু বাহিরে যখন তাহার প্রকাশ হয়, যখন তিনি দৈত্য বিনাশের জন্য আবির্ভূত হন অথবা সাধকের প্রার্থনায় তুষ্ট হইয়া গৃহস্থ ঘরে জন্ম লন, তখন প্রকট লীলা হয়। এই প্রকট লীলাও আবার দুই প্রকারের হয়, কোন স্থানে তিনি স্বীয় ঐশ্বর্য বিস্তার করিয়া অলৌকিক কর্ম সম্পাদন করেন, কোন স্থলে মানুষের মতই মানুষী লীলা বিস্তার করিয়া থাকেন............এই মানুষী লীলায় তিনি মানুষের মতই দেহ ধারণ করেন মানুষের মতই স্নেহ প্রেমের অধীন হন, মানুষের মতই ভাব আচরণ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তখন ঐশ্বর্য হইতেও তাহার মধ্যে মাধুর্যেব বিকাশ দেখা যায়। ভগবতীও যুগে যুগে এইরূপ অনেক লীলা করিয়াছেন। তাঁহার অনন্ত মাধুরী জননী বা কন্যা সম্পর্কের মধ্যে প্রকট হইয়াছে। ইহা ভগবতীর মধুরিমাপূর্ণ মানবী লীলা।"

এই ব্যাখ্যাটি সমালোচকের নিজের হলেও সাধারণভাবে ভক্ত বাঙালীর কাছে সদাই গৃহীত। ভক্ত বাঙালী যশোদার পুত্ররূপে ভগবান কৃষ্ণের লীলারস আস্বাদন করে ,নবদ্বীপের চৈতন্যরূপে রাধাকৃষ্ণের যুগ্মরূপকে অনুভব করে এবং ঘরের কন্যার মধ্যে আদ্যাশক্তি মহামায়ার লীলা উপলব্ধি করে ভক্তিসুধা পান করে। দেখা যায় কোন কোন কবি 'আগমনী' 'বিজয়া' গানের সহজ সরল বাৎসল্য রসে তৃপ্ত না হয়ে শক্তি তত্ত্বের কিছু নিগূঢ় কথা এর মধ্য দিয়ে বলতে চান। তত্ত্ববিদ তাই ব্যাখ্যা করেন—

"অ, উ, ম— ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বর—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের এই ত্রিমূর্ত্তি। ভারতীয় জীবনে স-শক্তি এই ত্রিমূর্ত্তিকেই উপাসনা করা হয়। জ্ঞানী সন্ন্যাসীর প্রণব এই অ, উ, ম অর্থাৎ 'ওম্', যোগীরা ইহাকেই বলেন উ-অ-ম-'বম্', গৃহীর পক্ষে ইহাই আবার উ-ম-অ-'উমা'। 'আগমনী' ও বিজয়া গানের কেন্দ্রে রহিয়াছেন এই 'উমা'—সৃষ্টি-সিস্থি-প্রলয়ের অধিকর্ত্রী জগদীশ্বরী।"

— শাক্ত পদাবলী ও শক্তিসাধনা ঃ শ্রী জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী ।

রামপ্রসাদের মত ভাবুক কবিরা উমা সঙ্গীত তত্ত্বের সন্ধান বিশেষ করেননি, সহজ ভক্তি লীলারসে মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু কোন কোন কবি তত্ত্ব কথাটি ভুলতে দেন না। 'আগমনী'র সরল বাৎসল্য রসে তাঁরা নিয়ে আসেন দেবী পূজার ভাব পরিবেশ। যেমন রাম বসুর কবিতায় মেনকা বলে—

করবো চণ্ডীর বোধন বিল্বমূলে।
দণ্ডিগণ পড়বে চণ্ডী পাব চণ্ডীর ফলে।।

ঘটে চণ্ডী পটে চণ্ডী স্থানে স্থানে মঙ্গলচণ্ডী।
চণ্ডীর কল্যাণে।
পাব চণ্ডীর ফলাফল হব না বিফল।
আসবেন মঙ্গলচণ্ডী সুমঙ্গলে।।
কন্যার মায়াদানে ত্রিজগৎ ভোলে।
দেখলে আনন্দ হয় নিরানন্দ যায়।
সদানন্দের মন ভুলালে।।

এ জাতীয় পদে ভক্তিতত্ত্ব পুরোমাত্রায় বিদ্যমান, তবে সহজ বাৎসল্য লীলারস কিছুটা আচ্ছন্ন হয়েছে। পাশাপাশি রামপ্রসাদ সেনের গানে তত্ত্ব কথাটি বলবার চেষ্টাও নেই। যেমন দুর্গার আগমনে—

রানী ভাসে প্রেম-জলে, দ্রুতগতি চলে, খসিল কুন্তল-ভার।
নিকটে দেখে যারে, সুধাইছে তারে— গৌরী
কত দূরে আর গো।।
যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ, নিরখি বদন উমার।
বলে-মা এলে, মা এলে, মা কি মা ভুলে ছিলে;
মা বলে একি কথা মার গো।।

এই ধরনের গানে ভক্তির কিছু অভাব নেই। উমা স্বয়ং দেবী দুর্গা কি না, আদ্যাশক্তি কিনা,এই ভাবনার প্রকাশ এখানে নেই। বৈষ্ণবীয় মাধুর্য রসের প্রভাবে রামপ্রসাদের মেনকা বিশ্বজননীকে সন্তানরূপে পেয়ে সম্পূর্ণ বিস্মৃত যে তিনি বিশ্বজননী। মায়ের বাৎসল্য তাই বাধাহীন এবং বৈষ্ণবদের মতই কবি রামপ্রসাদ এই সব গানে নিজের ভক্ত চিত্তকে মেনকার সঙ্গে একাত্ম করে ফেলেছেন। মেনকা হয়ে এ যেন কবির মাতৃভাবে পূজা 'যারে বলে ভালবাসা, তারে বলে পূজা'।

শাক্ত সঙ্গীতগুলি মধ্যযুগের সঙ্গে নব্যযুগকে যুক্ত করেছে, অষ্টাদশ শতককে ঊনবিংশ শতকে নিয়ে এসেছে। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে মধুসূদনের সাধনায় নব্য কবিতা প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত অনেক কবি রামপ্রসাদের মত একই সুরে একই ভাবে গান রচনা করেছেন। বাঙালীর জাতীয় ঐতিহ্যের অনুক্রমণ 'আগমনী'-'বিজয়া' গানের মধ্য দিয়ে এবং শ্যামা সঙ্গীতেও সবেগে চলেছে।

উমা সঙ্গীতের মধ্যে বাঙালীর সামাজিক-পারিবারিক বাস্তবতার গভীর প্রতিফলন সহজেই লক্ষ্য করা যায়। বালিকা কন্যার বিবাহ, শ্বশুরালয়ে গমন, স্বামীর দারিদ্র্য,

ক্বচিৎ খুব অল্প সময়ের জন্য পিতৃগৃহে আগমন, সেখানে কয়েকদিনের সুখের উচ্ছ্বাস এবং অচিরে সব কিছু দুঃখে মগ্ন করে তাঁর স্বামীগৃহে প্রস্থান। বাঙালীর ঘরে ঘরে কন্যা সন্তানকে কেন্দ্র করে এই জীবন নাট্য প্রত্যহ অভিনীত; এই কন্যা আর কেউ নয় স্বয়ং উমা— দেবী দুর্গা। এই বোধটি 'আগমনী'-'বিজয়া' গানের মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত। বৈষ্ণব বাৎসল্য রস স্বয়ং ভগবানকে ঘরেব মধ্যে এনেছিল, কিন্তু শাক্ত বাৎসল্য ঈশ্বরীকে রূঢ় বাস্তবতায় প্রতি পরিবারের অভিজ্ঞতায় সত্য করে তুলেছে, এ সত্যই 'দেবতাকে প্রিয় করি' তার পূজা।

শাক্ত পদকর্তাবা যখন 'আগমনী' 'বিজয়া' গানে মাধুর্যভাবকে অতিক্রম করে সরাসরি ঐশ্বর্যের বোধ নিয়ে আসেন তখন মানবী কন্যা উমার মধ্যে বিশ্বজননীর প্রতিরূপ প্রকট হয়। যেমন কমলাকান্তের কবিতায়—

তোমার উমার মায়া নির্গুণে সগুণ কায়া,
ছায়ামাত্র জীব-নাম ধরে।
ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী,কালী তারা নাম ধরি,
কৃপা করি পতিতে উদ্ধারে।।
অসংখ্য তপেরি ফলে, প্রকট তনয়া-বলে, ব্রহ্মময়ী
মা বলে তোমারে মেনকারাণি।
কমলাকান্তের বাণী, ধন্য ধন্য গিরিরাণি,
তব পুণ্য কে কহিতে পারে।।

আবার কখনো কখনো কবি সদ্য আগত উমাকে পূজা মণ্ডপের দশভুজারূপে প্রত্যক্ষ করে ধর্মপ্রাণতায়—বলা যায় জ্ঞানমিশ্র ভক্তিতে নিমগ্ন হয়েছেন। যেমন রসিকচন্দ্র লিখিত নিম্নে উদ্ধৃত রচনায়—

গিরি কার কণ্ঠহার আনিলে গিরি-পুরে?
এতো সে উমা নয়—ভয়ঙ্করী হে, দশভূজা মেয়ে।
উমা কোন্ কালে ত্রিশূলে অসুরে সংহারে।
হায়, আমার সেই বিমলা, অতি শান্তশীলা,
রণবেশে কেন আসবে ঘরে।

এই যে বাৎসল্য রসের কবিতায় ধর্মতত্ত্ব ও ঐশ্বর্যভাবের প্রকাশ শাক্ত কবিরা তাতে বৈষ্ণব কবিদের মত সাধারণভাবে কোন অস্বস্তিবোধ করেন নি। বৈষ্ণব কবিরা মাধুর্যে ঐশ্বর্যের মিশ্রণ ঘটানো তত্ত্ববিরোধী মনে করতেন। কারণ তাঁদের ব্রহ্ম অর্থাৎ কৃষ্ণ পরিপূর্ণ মাধুর্য। শাক্তসাধক কবি রামপ্রসাদ উমাসঙ্গীতে মাধুর্যের বাইরে আসতে চান নি। আবার অন্য অনেক কবি কখনো মাধুর্যে কখনো ঐশ্বর্যে তাঁদের ব্রহ্মময়ী মাকে পেয়েছেন। কখনো বাৎসল্যে সরল কোমলতায় তত্ত্বগাম্ভীর্য

সুপ্রতিষ্ঠিত। কারণ শক্তি সাধনার আরাধ্যা ভগবান কৃষ্ণের মত বলেন না—

'ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীতি।'

প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘকাল একটি সচেতন আন্দোলন ও শাস্ত্রীয় নিয়ন্ত্রণের ফলে বৈষ্ণবদের ভক্তিবাদ যেমন সুনিয়মিত হয়ে পড়েছিল, শাক্তদের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। তারা শুদ্ধ ভক্তি ও শুদ্ধ জ্ঞানে তফাৎ করেননি। মধুরের সঙ্গে ঐশ্বর্যের সহজ মিলন ঘটিয়েছেন। কোন কবি বা সাধক যদি বিশেষভাবে মধুরের উপাসক হন তাতেও শাক্তের আপত্তি নেই. কোন সাধক বা কবি ভয়ঙ্করীর উপাসনা করলেও শাক্ত মতে তাতে বাধা নেই। যিনি এই দুই প্রান্তকে মিলিয়ে দেখেন তিনিও শাক্তভাবনায় গ্রাহ্য। বৈষ্ণবদের তুলনায় এখানেই শাক্তদের ভাবনা ও সাধনার মুক্তি।

তিন

উপাস্যতত্ত্ব ও সাধনক্রিয়া

১. উপাস্য তত্ত্ব ও সাধ্যবস্তু

শক্তি তন্ত্রের উপাস্য। এই শক্তির স্বরূপ এবং সাধকের লক্ষ্য নির্ণয় করা শাক্ত পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত শ্যামা সঙ্গীতগুলি পাঠের উপযুক্ত ভূমিকা। শক্তিতত্ত্বে মাতৃকাশক্তি পরম কারণ এবং সার্বভৌম। তিনি আদ্যা অদ্বিতীয়া অক্ষরা পুরাণী, তিনিই সচ্চিদানন্দরূপিনী পরমেশ্বরী ব্রহ্মময়ী। 'মহানির্বাণতন্ত্রে' তাঁকে বলা হয়েছে সর্বশক্তিস্বরূপা সর্বদেবময়ী তনু। 'কালীতন্ত্রে' তাঁকে মহাবিদ্যা মহামায়া মহাযোগেশ্বরী পরা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁকে অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়া বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে A History of Indian Literature গ্রন্থে Winternitz লিখেছেন—

> The Great Sakti, The Great Mother, The Goddess, Who inspite of her countless name (Durga, Kali, Chandi etc) is only one, the one highest queen (Parameswari).

আদ্যামহাশক্তি এক অব্যক্ত পরা অবস্থা থেকে স্থূল বিশ্বে অবতীর্ণ হচ্ছেন, চিৎ ঘন আনন্দ স্বরূপ ক্রমে সঙ্কুচিত হয়ে বহির্বিশ্বে প্রকট হচ্ছেন—তার বিশ্লেষণ তন্ত্রশাস্ত্রে আছে। শক্তি প্রকাশের বিশ্লেষণ করে ছত্রিশটি তত্ত্ব নির্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে পাঁচটি শুদ্ধ তত্ত্ব যেমন শিব, শক্তি, সদাশিব, ঈশ্বর. ও বিদ্যা। সাতটি শুদ্ধাশুদ্ধ তত্ত্ব, যেমন মায়া কাল নিয়তি প্রভৃতি এবং চব্বিশটি অশুদ্ধ তত্ত্ব তার মধ্যে আছে দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূত, প্রকৃতি, অহঙ্কার, মন প্রভৃতি। শাক্ত তান্ত্রিকেরা

এর প্রতিটি তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন।

শাক্ত দর্শন যদিও এক অর্থে অদ্বৈততত্ত্ব কিন্তু এর মধ্যে সর্বদাই দ্বৈতের বোধ কার্যকর। অধ্যাপক জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী লিখেছেন—

> শক্তিতন্ত্রের অদ্বৈতবাদ বেদান্তের অদ্বৈতবাদ হইতে এখানে স্বতন্ত্র। সর্ব্ব অবস্থাতেই 'আত্মারামের আত্মা কালী'। নির্ব্বিকার নিরাকার অবস্থাতেও পরাশক্তি পরমশিবের সহিত সংযুক্ত, অর্থাৎ 'শক্তি-শক্তিমৎ-সামরস্যাত্মা'। এই অবস্থায় ক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ থাকে না, কিন্তু মায়ের 'আগুভাবে গুপ্তলীলা' চলিতে থাকে। পরম শিবেব সহিত পরাশক্তির যুগনদ্ধ মিথুন ভাবেই এই গুপ্ত লীলা।

রামকৃষ্ণদেব তাঁর অননুকরণীয় সহজ ভাষায় জ্ঞানমুখ্য মোক্ষতত্ত্ব সম্পর্কে যা বলেছেন তাতে এই সাধ্যতত্ত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

> "জ্ঞানযোগ বিচারপথ বড় কঠিন। কলিতে জীব অন্নগত প্রাণ। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা কেমন করে বোধ হবে? সে বোধ দেহবুদ্ধি না জেনে হয় না। আমি দেহ নই, আমি মন নই, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব নই, আমি সুখ দুঃখের অতীত, আমার আবার রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু কৈ? এসব কলিতে হওয়া কঠিন।"

(২) সাধন পন্থা

বঙ্গদেশে শাক্তভক্তেরা যে তত্ত্ব প্রচার করেছেন তাতে দার্শনিকতার দিকটিতে কোন নতুন আলোকপাত ঘটেনি, তার তুলনায় অনেক বেশী গুরুত্ব পেয়েছে সাধনার দিকটি। এই অঞ্চলে কুলার্ণব তন্ত্র, মহানির্বাণ তন্ত্র, তন্ত্রসার প্রভৃতি যে তন্ত্র গ্রন্থগুলি প্রচলিত আছে তাতে শক্তিতত্ত্বের পূর্বোক্ত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের বদলে গুরুত্ব পেয়েছে সাধন ক্রিয়া। ধর্মতত্ত্বের ও ধর্ম ইতিহাসের গবেষকেরা অনেকেই মনে করেন যে শাক্ত ধর্মে তন্ত্রাদি ক্রিয়াই ছিল আদিতে। দর্শন ও তত্ত্বের ধ্যান-ধারণা পরবর্তীকালে মননশীলদের সংযোজন।

তন্ত্র সাধনার মূল লক্ষ্যই হল অন্তর্লীন শক্তিকে জাগ্রত করা। কিন্তু সর্বশ্রেণীর সাধকের পক্ষে এই শক্তির জাগরণ ঘটানো সহজ ব্যাপার নয়। নানা পূর্ববর্তী স্তরে ও সহজতর প্রক্রিয়ার কথাও তাই শাক্ত সাধনার মধ্যে স্বীকৃত। ভাবশক্তি মূর্তিপূজা প্রভৃতি সাধনার প্রাথমিক স্তর এবং সকাম ভক্তি অর্থাৎ রূপ অর্থ যশ প্রভৃতির কামনাবাচক পূজা সাংসারিক জীবের পক্ষে অবিহিত নয়। শাক্ত সাধনায় এর স্বীকৃতি রয়েছে। কোন কোন সাধক বলেন এই বহিরঙ্গ ভক্তি ও সকাম পূজা বিশুদ্ধ ঈশ্বর ভক্তিরই রূপভেদ. কারণ এর মধ্য দিয়েও

সাধক ভক্তের চিত্তে একটি আনন্দাবেগ সঞ্চারিত হয়। তার স্নায়ুমণ্ডলে এর সাত্ত্বিক সঙ্কোচন প্রসারণ গিয়ে পৌঁছতে পারে। তবে তান্ত্রিক সাধনার মূল কথা হল কায়া সাধন এবং বামাচারী তন্ত্রসাধনা এই কায়া সাধনের মধ্য দিয়েই সাধ্যবস্তু লাভের চূড়ান্ত পথ নির্দেশ করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে শব সাধনা প্রভৃতি বিচিত্র বীরাচারী প্রক্রিয়া তান্ত্রিক সাধনার অঙ্গরূপে গ্রাহ্য। উত্তর সাধিকা নিয়ে যৌনাচার তন্ত্র সাধনার অন্যতম ভিত্তিরূপে কথিত। এই সব কিছুর মধ্যে সাধনতত্ত্বগতভাবে যে বোধটি প্রকাশ পাচ্ছে তা হল এই যে—

১. ভাণ্ডই ব্রহ্মাণ্ড। এই জড় দেহ মায়া-প্রপঞ্চময় হলেও আবার মহামায়ারই লীলাস্থল। দেহের মধ্য দিয়েই দেহোর্ধ্ব হওয়া। এখানেই অতি প্রাচীন বৌদ্ধ সহজসাধনা থেকে শুরু করে বাঙালীর নিজস্ব সাধন-প্রবণতার মুদ্রণ লক্ষ্য করা যায়।

২. কামকে অস্বীকার করা নয়, কামের ভয়ে ভীত হয়ে নয়, কামের মধ্য দিয়েই কামকে জয় করা। কারণ কাম প্রবণতা দেহধর্ম। দেহধর্মকে মেনে দেহের অতীত হওয়াই তন্ত্রের লক্ষ্য। শ্মশানে শবারোহণে সাধনা প্রভৃতি ভয়ঙ্কর পরিবেশ ও প্রক্রিয়া সংসারাবর্তের স্বাভাবিক গার্হস্থ্য জীবন প্রক্রিয়ার একটি পরম নিষেধ। এরই মধ্য দিয়ে সাধক উল্টা সাধনা করেন। সৃষ্টির মূলে 'অকল্যাণ' এবং 'অন্ধকারে'র যে শক্তি তাও মহামায়ার মায়া প্রপঞ্চ। বীরাচারী তন্ত্রসাধক কাপালিক পন্থায় সেই অকল্যাণ অশুভকে, শবকে শিবে রূপান্তরিত করতে চান।

তন্ত্রে দক্ষিণ আচারেরও স্থান আছে। মন্ত্রাদি সহযোগে পুষ্প পত্র অর্পণ করে শাস্ত্রসম্মতভাবে দেবী মূর্তির অর্চনা দক্ষিণাচারী সাধনা বলে গণ্য হতে পারে। সেইরূপ তন্ত্রে কাপালিক পন্থাও স্বীকৃত এবং 'অধিকারীভেদ' বলে একটি বোধ সাধনা বৈচিত্র্যের পেছনে সক্রিয় থাকে। সর্ববিধ সাধনা সকলের জন্য নয়। কাপালিক পন্থা শুধু সাধকের রুচি ও প্রবণতার ফল নয়। এইরূপ বিভীষণ পন্থা গ্রহণের অধিকার জন্মালেই তা গ্রহণ করা যায়।

শাক্ত তন্ত্রে দেহের মধ্যে ছয়টি চক্রের বা পদ্মের কল্পনা করা হয়েছে। গুহ্য ও প্রজনন অঙ্গের মধ্যে 'মূলাধার', লিঙ্গমূলে 'স্বাধিষ্ঠান পদ্ম', নাভিমূলে 'মণিপুর পদ্ম', হৃদয়দেশে 'অনাহত পদ্ম', কণ্ঠদেশে 'বিশুদ্ধ পদ্ম', এবং ভ্রূ মধ্যে 'আজ্ঞাচক্র বা পদ্ম'। এই সহস্রারেই হল শিবের অধিষ্ঠান। ব্রহ্মস্বরূপ শিব একই সঙ্গে সগুণ ও নির্গুণের। এই শিব কিন্তু শক্তির সংস্পর্শ না ঘটা পর্যন্ত শব। এই ছটি

চক্র বা পদ্ম মূলাধার থেকে সহস্রার পর্যন্ত বিন্যস্ত আর এরই মধ্যে রয়েছে তিনটি নাড়ী ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। মেরুদণ্ডের বামদিকে ঈড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা এবং মধ্যে সুষুম্না। নানা নামে সাধকেরা এদের অভিহিত করে থাকেন, চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী প্রভৃতি। তাছাড়া পূর্বোক্ত চক্র বা পদ্মগুলিকে তারা বিভিন্ন স্বর ও ব্যাঞ্জন ধ্বনি রূপে নির্দেশ করেন। এইসব চক্র বা পদ্মের বিচিত্র রূপ ও বর্ণ তাদের ধ্যানে ও উপলব্ধিতে প্রকট হয়।

মূলাধারে সুষুম্নার শুরুতে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি সুপ্ত থাকেন ইনিই হলেন আদ্যা প্রকৃতি, মানব দেহগত মায়া প্রপঞ্চ। এই সুপ্ত কুলকুণ্ডলিনীকে সাধনার দ্বারা জাগ্রত করে তোলাই সাধন প্রক্রিযা। যৌগিক পদ্ধতিতে দেহের অভ্যন্তরের নিশ্বাস ও প্রশ্বাস বায়ুকে নিয়ন্ত্রিত করে ঈড়া ও পিঙ্গলার দ্বৈতকে অভেদাত্মক সুষুম্নায় নিহিত করতে হয়। কামভাবনা পার্থিব মোহ বন্ধন নিরসনের মধ্য দিয়ে এই প্রক্রিয়া সফল হয়ে ওঠে। তন্ত্রসাধনায় কাম ক্রিযার ভূমিকাটিও এই কুলকুণ্ডলিনী শক্তির সুপ্তির অবস্থা থেকে জাগরণের সূচনাতেই সীমাবদ্ধ। সাধক তখন প্রাণায়ামের সাহায্যে ঈড়া ও পিঙ্গলার বিপরীতমুখী বায়ু স্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করে সুষুম্না পথে তাকে উর্ধ্বমুখী করে তোলেন। তার সঙ্গে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি এক এক করে পাঁচটি চক্র ভেদ করে সহস্রারে গিয়ে শবরূপী শিবের সঙ্গে মিলিত হন। তখন তিনি হন মহামায়া, শিবে শক্তিতে আর পার্থক্য থাকে না, পরামুক্তি সাধকের আয়ত্ত হয়।

অতি সংক্ষেপে এবং সরলভাবে আমরা বিষয়টি ব্যাখ্যা করলাম। প্রাসঙ্গিক নানা দিকের আলোচনায় আমরা প্রবেশ করলাম না। কারণ এই বিষয় নিয়ে পণ্ডিতেরা বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং শুধু এই বিষয়টি নিয়েই একাধিক গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব। আমরা শুধু বাঙালীর মন, বাঙালীর ভক্তির বিশিষ্টতা এবং সাধনার স্বাতন্ত্র্য বুঝে নেবার চেষ্টা করেছি এবং বাংলার শাক্ত সাহিত্যের পটভূমি হিসেবে বিষয়টির উপস্থাপনা করেছি।

চার
শ্যামাসঙ্গীতে শাক্ত বিশ্বাস ও সাধনরীতির প্রতিফলন

শ্যামাসঙ্গীত বা মালসীগান বাংলা সাহিত্যে এবং সঙ্গীত জগতে মধ্যযুগের শেষ ভাগের একটা উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কবিওয়ালাদের গানের একটা বড় অংশ শ্যামাসঙ্গীত। সেগুলির শিল্পরূপ এবং গায়নভঙ্গী প্রচলিত মালসীগান থেকে পৃথক। কবিগানের অন্তর্ভুক্ত শ্যামাসঙ্গীতগুলি 'ঠাকুরানী বিষয়ক' নামেও পরিচিত।

এই রচনাগুলিকে আমরা কবিতা হিসেবেই এখানে বিচার করব। সুর সহযোগে গীত হবার দিকটি আমাদের আলোচ্য নয়।

জগজ্জননী কালীর রূপ-বর্ণনামূলক কবিতাগুলি ভাল কবির হাতে পড়লে একই সঙ্গে ভাষায় দেবী মূর্তি রচনা এবং ভক্তিপূত স্তুতি বচন বলে মনে হয়। উদাহরণ হিসেবে রামপ্রসাদ সেনের একটি বিখ্যাত কবিতার উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

মায়ের মূর্ত্তি গড়াতে চাই, মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে।
মা বেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে ঘাটি মাটি নিয়ে।।
করে অসি মুণ্ডমালা, সে মা-টী কি মাটির বালা,
মাটিতে কি মনের জ্বালা দিতে পারে নিবাইয়ে?
শুনেছি মা'র বরণ কালো, সে কালোতে ভুবণ আলো,
মায়ের মত হয় কি কালো, মাটিতে রং মাখাইয়ে?
মায়ের আছে তিনটি নয়ন, চন্দ্র সূর্য্য আর হুতাশন;
কোন্ কারিগর আছে এমন, দিবে একটি নিরমিয়ে?
অশিবনাশিনী কালী, সে কি মাটি খড় বিচালি?
সে ঘুচাবে মনের কালি, প্রসাদে কালী দেখাইয়ে।।

কালী প্রতিমার কুমরের তৈরী করা মূর্তিটির কাঠামোয় এখানে বিশ্বজননীর অনন্ত ব্যাপ্ত রূপের ছায়া পড়েছে। কবি যখন মায়ের তিনটি নয়নকে চন্দ্র সূর্য হুতাশনের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যেমন মায়ের কালো রঙের মধ্য দিয়ে ভুবন ভরা আলোর বিকিরণ দেখতে পেয়েছেন তখন শাক্ত সাধকের প্রতিমা পূজা সার্থক হয়ে উঠেছে, মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ী ধরা দিয়েছে।

রামপ্রসাদ একটি কবিতায় কালিকার আসবমত্ত রণোন্মত্ত যে চিত্রটি এঁকেছেন তাও ছবির ফ্রেম ভেঙে অনন্ত পর্যন্ত প্রসারিত। শুভ অশুভ আলো অন্ধকার অতিক্রম করে তাঁর চিন্ময়ী প্রকাশ। বস্তু বিশ্বের সব প্রশান্তি বিপর্যস্ত করে সৃষ্টির আদি উৎস থেকে উৎসারিত। আদ্যাশক্তির সেই মহিমাময়ী মূর্তিতে কবি চিত্তের আবেশ বিহ্বলতার রঙ লেগেছে। —

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে, গলিত চিকুর আসব আবেশে,
বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানব-দলে, ধরি করতলে,
গজ গরাসে।।
কে রে কালীয় শরীরে, রুধির শোভিচে, কালিন্দীর জলে
কিংশুক ভাসে।
কে রে নীলকমল, শ্রীমুখমণ্ডল, অর্দ্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে।।
কে রে নীলকান্ত মণি নিতুত, নখর-নিকর তিমির নাশে;

কে রে রূপের ছটায়, তড়িত ঘটায়, ঘন ঘোর রবে,
উঠে আকাশে।
দিতিসুরচয়, সবার হৃদয়, থর থর থর, কাঁপে হুতাশে।

কবি রামপ্রসাদের কবিতায় কোমলতা কমনীয়তার একটি সুর বারংবার বেজে ওঠে। দেবীর রুদ্র রূপের উপরে কবিচিত্তের ভক্তির চন্দন একটি স্নিগ্ধ কোমল মাতৃভাব বিহ্বলতার ছায়াপাত করে। একটু আগে যে ভয়ঙ্করী রুদ্র কপালিনীর বর্ণনা কবি দিয়েছেন, হৃদয়ের ভক্তিতে তাকে কোমল এবং কল্যাণী মাতৃরূপে তিনি অভিষিক্ত করেছেন—

মা বসন পব
বসন পর বসন পর বসন পর তুমি
চন্দনে চর্চিত জবা পদে দিব আমি।

কালীতত্ত্ব সাধকের কাছে ব্রহ্মতত্ত্ব। তিনি বৃন্দাবনে রাধাপ্যারী, কখনো আবার নটবরবেশে রাসবিহারী। কমলাকান্ত একটি কবিতায় বলেছেন—

জান না রে মন পরম কারণ
কালী কেবল মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ
কখনো কখনো পুরুষ হয়।

আসলে তিনি ব্রহ্মময়ী। যেখানে যা কিছু পরাতত্ত্ব রূপে বর্ণিত সবই ব্রহ্মময়ী কালী। অজ্ঞানতা বশে ভেদজ্ঞান না হলে শিব, শিবা, কৃষ্ণ, রাধা সবই সেই পরম তত্ত্ব, তাঁরই মায়ায় ভেদজ্ঞান অথচ তিনি মায়াতীত। সাধকের উপাসনার জন্যই তিনি কায়া ধারণ করেন—প্রতিমায় মূর্ত হন, তিনি তো পরমাত্মারূপিনী। রামপ্রসাদ তাই বলেন—

অজ্ঞানেতে অন্ধ জীব, ভেদ ভাবে শিবা শিব,
উভয়ে অভেদ পরমাত্মারূপিণী।
মায়াতীত নিজে মায়া, উপাসনা-হেতু কায়া,
দয়াময়ী বাঞ্ছাধিক ফলদায়িনী।

মায়া প্রপঞ্চময় এই বিশ্বে দেহের টান, জড়ের টান, ভোগের আকর্ষণ সহস্র বন্ধনের জাল রচনা করে আছে। সাধককে ভুলিয়ে দিচ্ছে যে মানব জন্মগ্রহণ শুধুই মাতৃলীলার সঙ্গী হবার জন্য। মহামায়ার মহালীলায় অংশ নেবার জন্যই তিনি আমাদের নামিয়ে আনেন ভূতলে, কিন্তু মানবচিত্ত এই প্রপঞ্চময় বিশ্বের রূপে মোহে আবদ্ধ হয়ে সত্য ভুলে যায়। সাধক কবির তাই একমাত্র কামনা, আর এই ভব লীলা নয়, মায়ের ছেলেকে মা কোলে তুলে নিন।—

কেবল আসার আশা, ভবে আসা ,আসা মাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে র'লো।।
মা, নিম খাওয়ালে চিনি ব'লে, কথায় করে ছলো।
ও মা, মিঠার লোভে, তিত মুখে সারাদিনটা গেল।।
মা, খেলবি ব'লে, ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতল।
এরপর যে খেলা খেলালে মাগো, আশা না পূরিল।।
রামপ্রসাদ বলে, ভবের খেলায়, যা হবার তাই হলো।
এখন সন্ধ্যাবেলায়, কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো।।

কবি রামপ্রসাদ বলেন 'চিনি হওয়া ভাল নয় মা, চিনি খেতেই ভালবাসি', এই গানটি পূর্বে উল্লিখিত গানের বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত। এই কবিতায় বিশ্বের লীলা প্রাঙ্গণ থেকে কবি ব্রহ্মাময়ী মায়ের কোলে ফিরে গিয়ে একাকার হয়ে যেতে চেয়েছেন অর্থাৎ সাযুজ্য বা সালোক্য মুক্তি চেয়েছেন। কিন্তু শক্তি সাধক শুধুই তো মুক্তি চান না ভক্তিও চান। তাই মায়াপ্রপঞ্চময় জগৎ এবং জীবলীলা তার কাছে মিথ্যা নয় তার মধ্য দিয়ে মাতৃরূপের মাতৃভক্তির আনন্দ সম্ভোগ। তাই কবি রামপ্রসাদ বলেন 'চিনি হওয়া' অর্থাৎ পরামুক্তির তুলনায় 'চিনি খাওয়া' অর্থাৎ লীলারস সম্ভোগ কিছু কম কাম্য নয়। এই চরণটির অন্যবিধ ব্যাখ্যাও সম্ভব 'চিনি হওয়া' বলতে কালীর সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া নির্বিকল্প মোক্ষের অবস্থা এবং 'চিনি খাওয়া' বলতে পূর্ণ ব্রহ্মতত্ত্ব বা কালীতত্ত্বকে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করা, নিজের স্বাতন্ত্র্য পরিপূর্ণভাবে বিসর্জন না দিয়েও।একেই সালোক্য মুক্তি বলেছেন সাধক। বিখ্যাত আর একটি গানে একই ভাব অন্যভাবে ব্যক্ত করেছেন কবি— 'এবার কালী তোমায় খাব'।

রামপ্রসাদ শাক্ত পদের শ্রেষ্ঠ কবি এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সাধনার সত্য, উপাস্য তত্ত্ব, ভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ও ষট্চক্রভেদ তত্ত্ব, কামবাসনা জয়ী বৈরাগ্য তত্ত্ব, তাঁর কবিতায় ভাষায় এবং চিত্রে জীবন্ত হয়ে আছে। তাঁর কবিতার শিল্প চাতুর্য এবং ধর্মভক্তি আশ্রয়ে সমাজবোধের প্রকাশ নিয়ে আমরা এই গ্রন্থে আলোচনা করব না। ধর্মতত্ত্ব ও ভক্তিবাদের দিক থেকে বিচার করেও দেখতে পাব উপলব্ধির গভীরতা তাঁর শব্দচিত্রের জগৎটিকে অনন্যসাধারণ মূল্য দিয়েছে। যদিও এমন কবিতার অভাব নেই যেখানে ধর্মতত্ত্বের বা সাধনার কথাগুলি একেবারে সোজাসুজি রূপক সরিয়ে উপস্থিত। কবিতা হিসেবে সেগুলি হয়তো উতরোয় নি, কিন্তু ধর্ম ব্যাখ্যানের দিক থেকে তার বিশিষ্ট মূল্য আমরা স্বীকার না করে পারি না। নিম্নে উদ্ধৃত কবিতাটি ছন্দোবদ্ধ ভাষায় সাধন তত্ত্বের সুনিপুণ রূপায়ণ—

আমার মনে বাসনা জননি।

ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে, হ,ল, ক্ষ, ব্রহ্মরূপিণী।।
মূলে পৃথ্বি, ব, স, অন্তে , চারি পাত্রে মায়া ডাকিনী।
সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে, শিবে ঘেরে কুণ্ডলিনী।।
স্বাধিষ্ঠানে ব, ল, অন্তরে, ষড়দলোপর বাসিনী।
ত্রিবেণী বরুণ বিষ্ণু , শিব ভৈরবী ডাকিনী।।
ত্রিকোণ মণিপুরে, বহ্নি বীজ ধারিণী।
ড,ফ, অন্তে দিগ দলে, শিব ভৈরবী লাকিনী।।
অনাহতে ষট্‌কোণে, দ্বিষড়দল বাসিনী।
ক, ঠ, অন্তে বায়ু বীজ, শিব ভৈরবী কাকিনী।।
বিশুদ্ধাখ্য স্বরবর্ণ, ষোড়শ দল পদ্মিনী।
নাগোপরি বিষ্ণু আসন, শিব শঙ্করী সাকিনী।।
ভ্রূমধ্যে দ্বিদলে মন, শিব লিঙ্গ চক্র যোনি।
চন্দ্র বীজে সুধা ক্ষরে, হ, ক্ষ বর্ণে হাকিনী।।

এ রকম আরো কবিতা আছে রামপ্রসাদের। যেমন ষটতত্ত্বভেদের তত্ত্ব বুঝিয়ে কবি লিখেছেন—

কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী, তারা আছ গো অন্তরে,
মা আছ গো অন্তরে।।
এক স্থান মূলাধারে, আর স্থান সহস্রারে,
আর স্থান চিন্তামণি পুরে।
শিবশক্তি সব্যে বামে জাহ্নবী যমুনা নামে,
সরস্বতী মধ্যে শোভা করে।।
ভুজঙ্গ রূপা (ভুজঙ্গপা) লোহিতা, স্বয়ম্ভুতে সুনিদ্রিতা,
এই ধ্যান করে ধন্য নরে।
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর নাভিস্থান,
অনাহতে বিশুদ্ধাখ্য বরে।।

রামপ্রসাদের ২৮০ টি শ্যামাসঙ্গীত পাওয়া গিয়েছে। এর সবগুলি বিখ্যাত কবি রামপ্রসাদ সেনের নাও হতে পারে, অন্য অনেক সাধক কবির কবিতাও এই নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রচারিত হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু এগুলি পৃথক করা আজ আর সম্ভব নয়। রামপ্রসাদের এই ২৮০টি পদে শক্তি সাধনা এবং শাক্তভক্তের হৃদয়াকুতির প্রায় সব ক'টি অবস্থা ব্যাখ্যাত হয়েছে। কালীরূপের চিত্রণে তাঁর দক্ষতা আমরা দেখেছি। নিবৃত্তিমার্গ, মোক্ষতত্ত্ব, কায়া সাধন, লীলারসামৃত পান তাঁর কবিতায় শব্দবন্ধে, এবং অবশ্যই প্রসাদীসুরে ধরা দিয়েছে। কবির ধর্মতত্ত্ব ও

দুঃখবাদ বিষয়ে দু একটি কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। রামপ্রসাদের কবিতায় যে দুঃখবাদ প্রকাশিত তা বাইরে থেকে দেখলে কখনো কখনো আধিভৌতিক বলে মনে হয়। যেমন—

কারো দুগ্ধেতে বাতাসা
আমার ক্ষুধার অন্য মেলে কই।

কিন্তু আসলে এ দুঃখ গভীরভাবে আধ্যাত্মিক। তাঁব যে অন্নচিন্তাও মহামায়ার প্রসাদ এই সত্য অন্তরে ধ্রুব। সেই দুঃখের আবর্ত থেকে পরিপূর্ণ মুক্তিব সাধনাই তাঁর দুঃখ তত্ত্ব। কবির ভাষায়—

চিন্তাময়ী তারা তুমি, আমাব চিন্তা কবেছ কি।
নামে জগচ্চিন্তা-হরা মা , ব্যাভাবে কি তেমন দেখি।।
প্রভাতে দাও অর্থ চিন্তা, মধ্যাহ্নে জঠর চিন্তা।
সায়াহ্নে দাও অলস চিন্তা, বল মা তোরে কখন ডাকি।।
দিয়াছ এক মায়া চিন্তে, ওমা সদাই কবি তাই চিন্তে।
না পারিলাম তোমার চিন্তে, মা চিন্তাকূপে ডুবে থাকি।।

রামপ্রসাদের দুঃখবাদও মাতৃলীলারস উপভোগের একটা উপায়।

নবম অধ্যায়
ইসলাম ধর্ম এবং সাহিত্য

এক
ভূমিকা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধর্ম প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য শুধু নয় সর্বস্বতা পাঠকের মনে প্রশ্ন তুলতে পারে। তুর্ক বিজয়ের আগে আমরা বৌদ্ধদের রচিত সাহিত্যের নিদর্শন পেয়েছি, তারপরে সবটাই হিন্দু সাহিত্য। অথচ বঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে মুসলমান সুলতান ও নবাবদের শাসন চলেছে। এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে ইসলাম ধর্মের প্রভাব ক্রমেই বেড়েছে এবং প্রাক্ বৃটিশ যুগেই মুসলমান জনসংখ্যা একটা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে বসেছে। বহিরাগত অবাঙালী মুসলমান উচ্চবর্গের মধ্যে কিছু সংখ্যক থাকলেও বেশীর ভাগ বঙ্গদেশীয় মুসলমান, জাতি হিসেবে বাঙালী, বাংলা তাদের মাতৃভাষা।

মধ্যযুগে পাঁচশত বৎসর জুড়ে বাঙালী মুসলমান নিজেদের জন্য একটি সাহিত্যিক পরিমণ্ডল রচনা করেছিলেন যা হিন্দুদের ধর্মভিত্তিক সাহিত্য পরিধির বাইরে। বাংলাদেশের অভিজাত মুসলমানেরা অনেকেই বাংলা ভাষা তাদের নিজস্ব কি না এ নিয়ে সংশয় বোধ করত, কিন্তু অসংখ্য সাধারণ মুসলমান বাঙালী আরব ইরানের সংস্কৃতিকে নিজেদের ঐতিহ্য বলে স্বীকার করতে পারেনি। অভিজাত বাঙালী মুসলমানের মধ্যেও দ্বন্দ্ব ছিল। এ বিষয়ে অধ্যাপক অহমেদ শরীফের বক্তব্য উদ্ধৃত করছি—

> .... ঐতিহ্য বিরহী দেশজ মুসলিমরা রইল দরবারী সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। আর এদের মধ্যে যারা সাক্ষর মুন্সী-গোমস্তা-মুৎসুদ্দী-উকিল তারাই পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য ও মানস প্রভাবে 'সূফী' নামের দেশী যোগতন্ত্র-ভিত্তিক কায়া সাধনে ও দেহাত্মবাদে আশ্বস্তবোধ করে। এদের মধ্যে সৃজনশীলতা ছিল না কখনো, তাই মুসলিম রচিত বাংলা সাহিত্য ও ধর্মতত্ত্ব অনুবাদ কিংবা অনুকরণ মাত্র। এবং এদের রচনায় লোকায়ত বিশ্বাস ও লোক-সংস্কৃতির প্রভাব গভীর ও ব্যাপক। তাই নিরক্ষর গ্রামবাসীরাই এ সাহিত্যের শ্রোতা.সাক্ষর গ্রামবাসী এর পড়ুয়া ও গাইয়ে।

ঐতিহ্য ঘটিত কারণে অভিজাত মুসলমানদের মধ্যে বাংলা কাব্য রচনা বিলম্বিত হতে থাকে। তবুও মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের যেসব কাব্য আবিষ্কৃত এবং প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় উন্মোচিত হয়। আমরা এইসব কাব্যকে কয়েকটি শাখায় ভাগ করতে পারি।

১. প্রণয়-মূলক আখ্যান।
২. জঙ্গনামা
৩. মুসলিম ধর্ম সাহিত্য
৪. চরিত সাহিত্য
৫. সওয়াল সাহিত্য
৬. পীর সাহিত্য

উল্লিখিত শাখাগুলির বিস্তার বড় কম নয়। এর মধ্যে যেমন ধর্ম সম্পৃক্ত কাব্য রয়েছে তেমনি ধর্ম অসম্পৃক্ত কাব্যও কিছু আছে। এই দিক থেকে আমরা ইসলামী সাহিত্যকে কয়েকটি বর্গে ভাগ করতে পারি। —

ক. প্রত্যক্ষত ধর্ম সংশ্লিষ্ট কাব্য।
খ . ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রকে অবলম্বন করে রচিত ধর্মভাব প্রধান কাব্য।
গ . আখ্যান কাব্যে সূফীভাবের প্রতিফলন।
ঘ . শুদ্ধ প্রণয় আখ্যান—ধর্মভাব অসম্পৃক্ত।
ঙ . ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যামূলক কবিতা।

আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর পরিচয় প্রসঙ্গে এদের ধর্ম-সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করব।

দুই

প্রণয়মূলক আখ্যান

মহম্মদ সগীর রচিত 'ইউসুফ-জুলেখা', মহম্মদ কবীর এবং আরো অনেকের লেখা 'মনোহর-মধুমালতী', শাহ্ বারিদ খান প্রমুখ কয়েকজনের লেখা 'বিদ্যাসুন্দর', বাহরম খান প্রণীত 'লায়লা-মজনু', দৌলত কাজীর 'সতী-ময়না', আলাওলের 'পদ্মাবতী' প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এরূপ কাব্য প্রচুর রচিত হয়েছে। অনেকগুলি এখনো পুঁথির আকারেই রয়ে গেছে। এইসব কাব্য বেশীর ভাগ ফার্সী-হিন্দি কাব্যের ভাবানুবাদ বা স্বাধীন অনুবাদ। বিভিন্ন রচনায় অল্পাধিক মৌলিকতা আছে। মূল কিংবা হিন্দিতে এর অধিকাংশ রচনায়ই সূফী প্রেম তত্ত্বের রূপক অন্তর্লীন রয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে প্রণয় কাব্যের আবেদন বাধাহীন হলেও

কবিরা অনেক সময়েই ভেতরের তত্ত্বটির দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করেছেন। এই প্রেম যে মানবী প্রেম নয় মানুষের ঈশ্বর প্রেমের রূপক, এই তত্ত্বটি বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। তবে মূল ফার্সী বা হিন্দি বইয়েতে সাধক কবিরা সাধন তত্ত্বের কথা যতটা সরাসরি বলেছেন অনুবাদে প্রায়ই তা বর্জিত হয়েছে। মানবিক গল্প কথনের দিকেই কবিদেব আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। সে কারণে আখ্যান কাব্যের ধারাটি অনেকখানি ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে পড়েছে। ক্বচিৎ কোন রচনায় ধর্ম প্রসঙ্গ থাকলেও তার পরিমাণ বেশী নয় এবং অনেক সময়ে তাকে সম্পূর্ণ কাহিনীর সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা হয়নি। তবুও একথা অস্বীকার করা যায় না যে দীর্ঘকাল ধরে সাধারণ হিন্দু মুসলমানেব কাছে, মুসলমানেব কাছে তো বটেই 'লায়লামজনু' ও 'শিরি ফরহাদ' অধ্যাত্ম প্রেমের রূপকাশ্রিত কাহিনী রূপে পরিচিত। 'ইউসুফ জুলেখা' কাহিনীর মূল পাওয়া যাচ্ছে কোরাণ-শরিফে। এ দিক থেকে এদর ধর্ম সম্পৃক্তি আংশিক হলেও স্বীকার্য। মজনুর এই প্রেম সাধনা তো যোগীর সাধনা— যেমন

পঞ্চবৈরী বিনাশিয়া এক মন কাএ
পরম সমাধি হৈয়া রহিল তথাএ।
চিবুক কণ্ঠেত দিয়া যোগাসনে বসি
নিরীক্ষএ লায়লীর রূপ অহর্নিশি।
দোলন বোলন নাহি নীরব নয়ন
উরু ভেদি তরু হৈল নাহিক চেতন।
শরীর নগরে তার লাগিল ফাটক
কাম ক্রোধ প্রবেশিতে হইল আটক।

তিন
জঙ নামা

ইসলামী ধর্মযুদ্ধ অবলম্বন করে অনেকগুলি কাব্য বাংলায় রচিত হয়েছে। এগুলিও প্রধানত অনুবাদ ধর্মী। যুদ্ধ কাব্যগুলি দু ভাগে বিভক্ত। হজরত মহম্মদের বত্রিশটা যুদ্ধ যেমন ধর্মযুদ্ধ, তেমনি পরবর্তী কারবালা যুদ্ধ ও পাপের বিরুদ্ধে ধর্মরক্ষার জন্য আত্মাহুতি—তাই ধর্মপ্রাণ কাব্য। প্রথম শ্রেণীর কাব্য 'মাগাজী' এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্য 'মার্সিয়া' বা শোক কাব্য নামে পরিচিত। এই শ্রেণীর কাব্য রচয়িতাদের মধ্যে আব্দুল নবী, বাহারম খাঁ, মহম্মদ খাঁ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'গোরক্ষ বিজয়'রচয়িতা শেখ ফয়জুল্লাও এই শ্রেণীর একটি কাব্য

রচনা করেছিলেন।

রামায়ণ মহাভারতের যুদ্ধ বিবরণ যেমন হিন্দুদের কাছে ধর্ম ও ভক্তির আকর, তেমনি মুসলমানদের কাছে জঙনামাগুলি ধর্মপ্রাণ রচনা। কারবালা যুদ্ধ আশ্রয়ী 'মার্সিয়া' গান এত বেশী জনপ্রিয় ছিল যে আপামর জনসাধারণের মধ্যে এই যুদ্ধ কাহিনী জারিগান রূপে সুপ্রচলিত হয়েছিল। এখনো সারা বঙ্গদেশে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে জারিগান অত্যন্ত প্রিয়। এবং নতুন নতুন ভাষায় নতুন নতুন রূপে তা আত্মপ্রকাশ করছে। লোক সাহিত্যের প্রকৃতি অনুযায়ী এরূপ ঘটছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে মহম্মদ খাঁন রচিত 'মক্তুল হোসেন' নামক কাব্যের (হাসেনের মৃত্যু) সম্পাদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পুঁথি বিশেষজ্ঞ ড. শাজাহান মিঁয়া বলেন যে, পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন পুঁথিশালায় এই কাব্যের ১১৪টি পুঁথি রক্ষিত আছে। এতেই গ্রন্থটির জনপ্রিয়তার প্রমাণ পওয়া যায়।

চার
মুসলিম ধর্ম-সাহিত্য

ইসলামের ভিত্তি সৃষ্টি ও স্রষ্টার দ্বৈত তত্ত্বে। আল্লাহর সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক তা হল বান্দা ও মনিবের সম্পর্ক। মানুষের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর অনুগত থাকা এবং তার জন্য কোরানের বিধিনিষেধ মেনে চলা। এই মানা অথবা না-মানার উপর নির্ভর করছে মানুষের অন্তিম অবস্থা—হয় পুরস্কার স্বরূপ বেহেস্তে শান্তি প্রাপ্তি, না হয় দোজখ-এর শাস্তি লাভ। এছাড়া আল্লাহর সঙ্গে মানুষের আর কোন সম্পর্ক ইসলাম ধর্মে স্বীকৃত নয়।

বাংলা ভাষায় ইসলামী ধর্ম সাহিত্য যা রচিত হয়েছে তাকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। তার একটি হচ্ছে নামাজ, রোজা, অজু, সুন্নত, জানাজা প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রচার। দ্বিতীয় অংশটি হল শাস্ত্রের মাহাত্ম্য, তাৎপর্য, ইসলামী নীতি কথা ও তত্ত্বকথা, নবী-রসুলের চরিত কথা, পীর দরবেশের জীবন বৃত্তান্ত। এই দুই শ্রেণীর ইসলামী ধর্মসাহিত্য কোরান, হাদিস অনুগামী তো বটেই, তাছাড়াও নানা কিংবদন্তীমূলক নীতি ও কাহিনীকে আশ্রয় করে রচিত। ড. আহমেদ শরীফের এই উক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ —

> ধর্ম সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানও উদাসীন ছিলেন না। তাঁরা জনগণকে ধর্মবুদ্ধি দানের জন্য নানাভাবে চেষ্টা-যত্ন করেছেন। রসুল চরিত, নবী কাহিনী, ইসলামের উদ্ভব যুগের বীর বৃত্তান্ত—শরীয়তশাস্ত্র, মারফত

> তত্ত্ব, পীর পাঁচালী প্রভৃতি রচনা করে তাঁরা ইসলাম প্রচারের গৌরব, স্বধর্মের গর্ব এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ববোধ গণমনে জিইয়ে রাখবার প্রয়াস পেয়েছেন।
> — (বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য)

ইসলামী আচার-আচরণের মহিমা প্রচার মূলক কয়েকজন লেখক এবং কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হচ্ছেঃ শেখ মুত্তালিব—শাস্ত্র গ্রন্থ 'কায়দানী কিতাব', 'নুরনামা'। লেখকের নাম আসরাফ — 'কিফয়েতুন মুসলেমিন', শেখ ইউসুফ গদা — বইয়ের নাম 'তোহাফা'। এরূপ আরো অজস্র পুঁথি রচিত হয়েছে। কাব্য হিসেবে এদের মূল্য নয়, মুসলিম জনসাধারণকে ধর্মীয় শিক্ষা দানেই এঁদের গুরুত্ব।

পাঁচ
চরিত-সাহিত্য

মধ্যযুগে চৈতন্যদেব এবং তাঁর পার্ষদদের জীবন কাহিনী অবলম্বন করে ইতিহাস, তথ্যভিত্তিক জীবন কথা, কিংবদন্তী, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, প্রভৃতির সমন্বয়ে বিরাট চরিত সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, তারই অনুরূপ মুসলমান কবিগণ জীবনী সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি বিস্তৃত এলাকা দখল করে রেখেছেন। স্বভাবতই সত্যে, কল্পনায়, বাস্তবে, অতিলৌকিকত্রয় মিশ্রিত এই চরিত কথা মুসলমান পাঠক ও শ্রোতাদের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস জাগ্রত রাখতে সাহায্য করেছে। এক্ষেত্র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একটি বিষয়ে বাংলা ইসলামী সাহিত্যের গবেষকগণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যে কয়জন বাঙালী মুসলমান কবি রসুল চরিত রচনা করেছেন তাঁরা সকলে কৃষ্ণ-রাম-চৈতন্য চরিতের সঙ্গে রসুলের জীবন কাহিনীর সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন। এর মধ্য দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম সামঞ্জস্যের কোনরূপ আদর্শ প্রচার লক্ষ্য ছিল কি না তা ভেবে দেখার মত।

এই শ্রেণীর কয়েকটি কাব্য 'নবীবংশ', 'মুস্তাফা চরিত', 'রসুল বিজয়', 'শাহানামা', 'নুরনামা' প্রভৃতি এবং কাব্যের রচয়িতা সৈয়দ সুলতান, শেখ চান্দ, মহম্মদ খাতের, নসলে, উসমান প্রভৃতি কবির নাম উল্লেখ করা যায়।

ছয়
সওয়াল-সাহিত্য

প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে ধর্মজ্ঞান শিক্ষা দেওয়াব পদ্ধতি খুবই প্রাচীন।

মধ্যযুগের বাঙালী মুসলমানেরা প্রশ্ন-উত্তর বা সওয়াল-জবাবের আঙ্গিকে অনেকগুলি ধর্মপ্রচারমূলক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে 'মুশার সওয়াল', 'আবদুল্লার সওয়াল', 'মালিকার হাজার সওয়াল', 'তালিব নামা', 'হায়রাতুল ফিকাহ' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এইসব পুঁথির মধ্য দিয়ে কিছু শরীয়তী জ্ঞান যেমন প্রচার করা হয়েছে তার সঙ্গে লৌকিক বিশ্বাস অনেকটা মিশে গিয়েছে। সব কবিই কোরান, রসুল ও আল্লাহর দোহই দিয়েছেন। কিন্তু লেখকদের শিক্ষার স্বল্পতা, দেশজ লৌকিক সংস্কারে অতি আগ্রহ এবং পীর মুর্শিদ নির্ভরতা রচনাগুলিকে সর্বদা ধর্মতত্ত্বের দিক থেকে নির্ভরযোগ্য করে তুলতে পারেনি।এই শ্রেণীর রচনাব কবিদের মধ্যে মহম্মদ আকিল, শেখ সাদী, আলি রজা, আব্দুল করিম, খোন্দকার প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

রচনার নিদর্শন হিসেবে মহম্মদ আকিলের গ্রন্থ 'মুসার সওয়াল' থেকে একটু উদ্ধৃত হল—

মুসা। যেখনে না ছিল পূর্বে স্বরূপ আকার
কেহে রূপে কথাএ আছিলা করতার।
যেখনে না ছিল কিছু দুনিয়া পত্তন
কথায় আছিলা প্রভু কহ নিরঞ্জন।

আল্লাহ। যেখনে আছিলামপূর্বে জান ব্রহ্ম কাএ।
অখনেহ আছি তথা জান সর্বথাএ।
সেই স্থান এড়ি আহ্মি কথাহ না যাই
ত্রিভুবণের লক্ষ্য আহ্মি আহ্মার লক্ষ্য নাই।
সর্বঘটে আছি আহ্মি দুগ্ধ মধ্যে ননী
জল মধ্যে বিন্দু আহ্মি ঢেউমধ্যে পানি।

সাত
পীর-সাহিত্য

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সত্যনারায়ণ বা সত্য পীরের পাঁচালী নামে কতকগুলি ছোট আকারের, হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কবিদের লেখা, বই আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আদিতে সত্যপীর মুসলমানদের আরাধ্য সাধক-দেবতা বা দেবতার পদে উন্নীত মহাপুরুষ, হিন্দু সমাজে গৃহীত হয়ে সত্যনারায়ণের রূপ ধারণ করেছে। প্রাপ্ত পুঁথিগুলির মধ্যে হিন্দু কবির সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করা

যায়। কিন্তু মুসলমান কবিদের রচনায় বিষয় বৈচিত্র্য অনেক বেশী। মুসলমান কবিদের মধ্যে ফয়জুল্লা, গরিবুল্লা, আরিফ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য পীর-মাহাত্ম-জ্ঞাপক পাঁচালীর মধ্যে নামকরা যায় কালু গাজী, বড়খাঁ গাজী, মাণিক পীর, মছলন্দি পীর এই রকম আরো অনেক পীরকে অবলম্বন করে রচিত কাব্য। কোন কোন ঐতিহাসিক ধর্ম প্রচারক বা আঞ্চলিক শাসক বা কিংবদন্তীর নায়ক পীরের স্তরে উন্নীত। অনেক পীর আবার একান্তই কাল্পনিক।

এই শ্রেণীর কাব্য আকারে সংক্ষিপ্ত, আখ্যানধর্মী এবং বিশেষকাব্যগুণ বর্জিত। তবে ষোড়শ শতক থেকেই পীর বন্দনা কাব্য রচিত হচ্ছে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে এদেব সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। কবি হিসেবে ফযজুল্লা, তাহেব মামুদ, আব্দুল গফুব, আব্দুল রহিম, ফকিব মহম্মদ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। অনেক হিন্দু কবির কাব্যেও অষ্টাদশ শতকে পীর ফকিরের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব লক্ষ্য কবা গিয়েছে।

মনে হয় পীর মাহাত্ম্য কাব্য উচ্চ কবি প্রতিভার সংযোগে মঙ্গলকাব্যের সমান্তরাল কাব্যশাখা হয়ে উঠতে পারত।

উপসংহার

সেকালের বাংলা শিষ্ট সাহিত্যে বাঙালীর ধর্মীয় জীবন এবং ধর্মভাবনার প্রতিফলন সন্দেহ নেই। বাঙালীর 'ধর্মীয় জীবন', 'ধর্মভাবনা' না বলে যদি বলা হয় বাঙালীর 'জীবন' ও 'ভাবনা' তাহলেও কিছু কম বলা হয় না। কারণ সেকালের জীবনযাত্রা এবং চিন্তাধারা ছিল ধর্মসম্পৃক্ত। ধর্ম ও জীবনের মধ্যে কোথাও বেড়া বা আগল ছিল না। তার মানে এই নয় যে বাঙালী ছিল অতিমাত্রায় ধর্মমুখী এবং জীবন বিমুখ। আসলে তার ধর্ম জীবন ছিল ওতপ্রোত। এ এক আশ্চর্য ধর্ম— এ এক আশ্চর্য জীবন। 'এক' শব্দটি ব্যবহার করেছি বিশেষ কারণে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালীর বিচিত্র ধর্ম, আপাতদৃষ্টিতে যাদের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রার বিরোধও লক্ষ্য করা যায় ,—তবুও তাদের 'এক' বলেছি। সব পার্থক্যের মধ্যেও কতকগুলি মৌল ও ধাতুগত মিল তাদের এক করে ফেলেছে। শক্তিবাদ-লীলাবাদ-ইন্দ্রিয়ালু ঐহিকতার এমন একটি অন্তর্লীন স্রোত সর্বত্র প্রবাহিত যাতে তত্ত্বগত চূড়ান্ত বৈদান্তিকতাও ভিতরে ভিতরে টলে গিয়েছে, জ্ঞানমার্গ প্রায় সর্বত্র কোমল হয়ে পড়েছে। তান্ত্রিকতার সোজা বা বাঁকা, মিশ্র-অমিশ্র রঙ সব ধর্মকর্মে কিছু না কিছু লেগেছে।। অবশ্য ইসলাম ধর্ম ও সাহিত্যে বাঙালীয়ানার এই রূপ কতটা বর্তেছে, তা নিয়ে এখনও পর্যাপ্ত আলোচনার অবকাশ রয়েছে। তবে হিন্দু মুসলমান নিরপেক্ষভাবে সেকালের বাঙালীর ধর্মে লৌকিক সংস্কার ও আচারের পরিমাণ ছিল অনেকখানি, যা শাস্ত্রীয় আভিজাত্যকে ও বিশুদ্ধিকে প্রায়ই আচ্ছন্ন করেছে।

শিষ্ট সাহিত্যকে সামনে রাখায়, আমাদের এই অভিসন্দর্ভে অনেক লোকায়ত ধর্মগোষ্ঠীর কথা বলা হয় নি। সুফী, বাউল, লালনশাহী, খুশিবিশ্বাসী, সাহেবধনী, কর্তাভজা, বলরামী, রাধাবল্লভী, নেমোবৈষ্ণবী, পঞ্চধুনী এবং আরও বহুসংখ্যক ধর্মগোষ্ঠীর সাধন-সংশ্লিষ্ট অনেক গান মুখে মুখে প্রচলিত—লোকসাহিত্যের স্বাভাবিক নিয়মবশে নিয়ত পরিবর্তিত। তাদের যে সব সংকলন মুদ্রিত হয়েছে, সবই আধুনিক। এদের বিচার-বিশ্লেষণ একটি স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়। তা যে বর্তমান গ্রন্থের আলোচনার বাইরে গোড়াতেই সেকথা বলা হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জী

সাহিত্য- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব
বাঙালীর ইতিহাস- ড. নীহাররঞ্জন রায়
Obscure Religious Cults as background of Bengali literature- Dr.Shasibhusan Das Gupta
Tantric Buddhism- Dr.Shasi Bhusan Das Gupta
শ্রীরাধাব ক্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে- ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত
ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য-ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- ১ম খণ্ড- ড. সুকুমার সেন
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য- ড. দীনেশ চন্দ্র সেন
বাংলা সাহিত্য পরিচয়, ১ম খণ্ড- ড. দীনেশ চন্দ্র সেন
History of Bengali Literature-Dr.Dinesh Ch.Sen.
Bengali Ramayanas- Dr. Dinesh Ch.Sen
বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস-ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ১-৪ খণ্ড- ড. অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়
বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য ১-২খণ্ড- ড. আহমদ শরীফ
ভারতচন্দ্র রচনা সমগ্র-সম্পাদক ড. ক্ষেত্র গুপ্ত
বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস- ড. ক্ষেত্র গুপ্ত
প্রাচীন কাব্য ঃ সৌন্দর্যজিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন- ড. ক্ষেত্র গুপ্ত
কবি মুকুন্দরাম- ড. ক্ষেত্র গুপ্ত
সেকালের শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ কবিতা-সম্পাদক ড. ক্ষেত্র গুপ্ত এবং কুমারেশ ঘোষ
শ্রীচৈতন্য ঃ একালের দৃষ্টিকোণ- সম্পাদক ড. ক্ষেত্র গুপ্ত
চৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা-ড. রাধাগোবিন্দ নাথ
শ্রীচৈতন্যভাগবত- বৃন্দাবন দাস (দেব সাহিত্য কুটির)
শ্রীচৈতন্যচবিতামৃত-কৃষ্ণদাস কবিরাজ (দেব সাহিত্য কুটির)
বৈষ্ণব পদাবলী- সম্পাদক হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
বৈষ্ণব রস প্রকাশ-ড. ক্ষুদিরাম দাস
শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা-জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী

তন্ত্রতত্ত্ব- শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব
বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, ১ম খণ্ড- ড. ভূদেব চৌধুরী
বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, ১ম খণ্ড- গোপাল হালদার
চৈতন্য চরিতের উপাদান- ড. বিমানবিহারী মজুমদার
নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী- ড. কল্যাণী মল্লিক
Early History of Vaisnava Faith and movement in Bengal - Dr S K.De
Vaisnavism, Saivism and other minor religious sects - Dr R.G.Bhanderkar.
বাংলা পীর সাহিত্যের কথা-ড.গিরীন্দ্রনাথ দাস
হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা- ক্ষিতিমোহন সেন
বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী- ড. নরেশচন্দ্র জানা
রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র-ড. মদনমোহন গোস্বামী
বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি- ড. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য
বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ- ড.সত্যবতী গিরি
কবিকঙ্কণ চণ্ডী- সম্পাদক ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ
সাধক কবি রামপ্রসাদ- যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
বৈষ্ণব পদাবলী- সম্পাদক শ্যামাপদ চক্রবর্তী প্রমুখ
শাক্তপদাবলী -সম্পাদক অমরেন্দ্রনাথ রায
মঙ্গলচণ্ডীর গীত(দ্বিজ মাধব)- সম্পাদক সুধীভূষণ ভট্টচার্য
কৃত্তিবাসী রাময়ণ- দেব সাহিত্য কুটির
কাশীদাসী মহাভারত-সাহিত্যসংসদ
রূপরামের ধর্মমঙ্গল- সম্পাদক ড. সুকুমাব সেন
ঘনারামের ধর্মমঙ্গল- সম্পাদক ড. পীযূষকান্তি মহাপাত্র
গোর্খবিজয়- সম্পাদক ড. পঞ্চানন মণ্ডল
বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল- সম্পাদক প্যারীমোহন সেনগুপ্ত
গোপীচন্দ্রের গান- সম্পাদক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য
বাইশ কবির মনসামঙ্গল- সম্পাদক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য
লায়লী মজনু (বইরাম) - সম্পাদক ড. আহমেদ শরীফ
ইউসুফ জোলায়খা(সগীর)- সম্পাদক ড এনামুল হক
জঙ্গনামা(গরীবুল্লাহ)- সম্পাদক ড. আব্দুল জলিল

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ- ড. আব্দুল জলিল
চর্যাগীতি পরিক্রমা- সম্পাদক ড.নির্মল কুমার দাশ
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন- সম্পাদক ড. চিত্তরঞ্জন লাহা
জয়দেব ও গীতগোবিন্দ- হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
বিদ্যাপতি- সম্পাদক- ড. বিমানবিহারী মজুমদার
বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা- ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলার পূজাপার্বণ- ড পল্লব সেনগুপ্ত
ইসলামী বাংলা সাহিত্য- ড সুকুমার সেন
চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী- চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ-ড. শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য
আরাকান রাজসভার বাংলা সাহিত্য- ড. মহম্মদ এনামুল হক এবং আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ
বাংলা সাহিত্যে শিব- ড গুরুদাস ভট্টাচায্য
বাঘ ও সংস্কৃতি- সম্পাদক ড. সনৎ কুমাব মিত্র
বাংলার ব্রত- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত- শ্রীম
সত্যপীরের কথা (শাহ্ গরীবুল্লাহ)- সম্পাদক ড . আব্দুল জলিল
বাংলা কীর্তন ও কীর্তনীয়া- হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
কীর্তন- খগেন্দ্রনাথ মিত্র
কৃষ্ণকথায় মালাধর ও মাধব - ড রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
মানবধর্ম ও মধ্যযুগের কাব্য- ড. অরবিন্দ পোদ্দার
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল- লোচনদাস (গৌড়ীয় মঠ)
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল- জয়ানন্দ (গৌড়ীয় মঠ)
চৈতন্যাবদান- ড. সুকুমাব সেন
Vaisnavism in Bengal- Dr Ramakanta Chakravarty